এখন ডুয়ার্স

বিশেষ সংখ্যা জুলাই ২০১৮। ২০ টাকা

নতুন জেলায় পাঁচে পা

ফোর লেন ফালাকাটা সুদিনের আশায়

রথযাত্রা

ইকো পর্যটন

ঘালেটার মহলদীরাম রাঙারুন

পরিযায়ীদের রেকর্ড ভিড় কুলিকে আঙ্গিনায়

তিনবিঘা কোনটা বাছবে পাচার? না পর্যটন?

শুরু হল ধারাবাহিক

মহারাণী কথা

বড় গল্প

অশরীরী রিং টোন

আলিপুরদুয়ার জেলা শহরের জেল্লা বাড়াল ডুয়ার্সকন্যা

সাহিত্য সংস্কৃতি সৃজনশীলতার সঙ্গে ১৩০ বছর

জলপাইগুড়ি পৌরসভা

জলপাইগুড়ি পৌরসভা শহরের নাগরিকদের প্রত্যয় ও বিশ্বাস নিয়ে ১৩০ বছর অতিক্রম করেছে। এই প্রাচীন পৌরসভার শিকড়টি শহরের গভীর থেকে গভীরের মাটি ছুঁয়ে এখনও সবুজ, এখনও দৃঢ়। শহরের উন্নয়ন, সংস্কার, সৌন্দর্যকরণ-এর সাথে সাথে সভ্যতা, সংস্কৃতি কৃষ্টি ইত্যাদি ক্রমশই নানাভাবে এই শহরটিকে ধনবান করে তুলেছে এবং বাংলায় খ্যাতির শিয়রে পৌঁছে দিচ্ছে। জলপাইগুড়ি শহর থেকে এ যাবৎ নানান পত্র, পত্রিকা স্মারক, কবিতা গ্রন্থ ইত্যাদি প্রকাশিত হচ্ছে। সেই সুবাদে জলপাইগুড়ি পৌরকর্তৃপক্ষের কাছে পত্রিকা প্রকাশক, সম্পাদকের কিছু অনুরোধ উপরোধ থেকেই যায়। বছরভর নানা উৎসব, পার্বণ-বই-মেলা-নাট্যমেলা শহরে অনুষ্ঠিত হয়েই চলে। জলপাইগুড়ি পৌরসভা থেকে ওই সকল ক্ষুদ্র পত্রিকা স্মারক বা স্মরণ সংকলন ইত্যাদিতে কিছু নিয়মমাফিক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। সার্বিক উন্নয়ন— যেমন রাস্তাঘাট, পথবাতি, পরিবেশরক্ষণ, পানীয়জল সহ বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি সর্বতভাবেই জলপাইগুড়ি পৌরসভা থেকে প্রচারিত বিজ্ঞপ্তির স্বাভাবিক বিষয়। তাই নতুন করে বিষয়গুলিকে মনে না করিয়ে শহরের বিভিন্ন কলাকুশলীদের মন ও মননের সৃষ্টিশীল প্রয়াস, সংস্কৃতিবান মানুষের সৃজনশীল চিত্ত পটের অনুরন, গীত-বাদ্য-কলা-অঙ্কন-কবিতা-উপন্যাস-নাটক প্রভৃতিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে উক্ত সকল সংস্কৃতির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জলপাইগুড়ি শহর— এই পৌরসভা আরও প্রগতিশীল ও সম্পন্ন হয়ে উঠুক। ধন্যবাদান্তে

জলপাইগুড়ি পৌরসভা

শ্রীমতী পাপিয়া পাল
উপ-পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

শ্রী মোহন বোস
পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

এখন ডুয়ার্স

পঞ্চম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, জুলাই ২০১৮

সম্পাদনা ও প্রকাশনা
প্রদোষ রঞ্জন সাহা

ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদনা
শ্বেতা সরখেল

অলংকরণ
শান্তনু সরকার

সার্কুলেশন
দেবজ্যোতি কর
দিলীপ বড়ুয়া

মুদ্রণ অ্যালবাট্রস

ইমেল
ekhonduars@yahoo.com

হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৮৩০৪১০৮০৮

শুভ রথযাত্রায় প্রকাশিত হচ্ছে
আমাদের নতুন বই
জয় জল্পেশ

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস। মুক্তা ভবনের দোতলায়। মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি।
ফোন ০৩৫৬১-২২২১১৭

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে। এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

প্রচ্ছদ ছবি: শৌভনিক চক্রবর্তী

এই সংখ্যায় যা আছে

সম্পাদকের কলমে ৫

বইপত্র
কোরাণ তত্ত্ব ৮

প্রচ্ছদ নিবন্ধ
ফোর লেন ফালাকাটা প্রহর গুনছে সুদিনের ১০
কৃষিই ফালাকাটাকে অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র করে তুলেছে ১২

বিশেষ প্রতিবেদন
রথের রশি ১৪

উত্তরপক্ষ
বেত শিল্প পুনরুদ্ধারের কোনও উপায় নেই? ১৬

পাঠকের কলম
জলপাইগুড়ি ফার্মেসি কলেজের ভবিষ্যত কি শপিংমল? ১৭

প্রতিবেশি পিএনপিসি
কুলিকে আঙ্গিনায় ভিড় জমিয়েছে পরিযায়ী অতিথিরা ২৪, কোচবিহারের কড়চা— শুকনো ডালের ভাস্কর ২৬, প্রশ্ন তিনবিঘার পর্যটন নাকি পাচার? ২৮

ডুয়ার্সের হেথা হোথা
অল্প দূর বাহাদুর ৩০

পর্যটন
ঘালেটার মহলদীরাম রাঙারুণ ৩২

শ্রীমতি ডুয়ার্স
ডুয়ার্সের সোনালি দিগন্ত ৩৫, টয়লেটে এক প্রেম কথা নয় ৩৬, অ্যাসিড সন্ত্রাস! শিকার মেয়েরাই ৩৭, রূপ লাবণ্যের চাবিকাঠি রূপার কাছে ৩৮, প্রাচীন ব্রত পালনে মেয়েরা ৩৯, সাপ হাতির চৌহদ্দি থেকে বইয়ের দুনিয়ায় ৪৬, ছন্দবীথি স্মৃতি ৬১

বড় গল্প
অশরীরী রিং টোন ৪৮

পুরাণ অফুরান
একলব্য উৎপীড়িত এক বীর প্রতিনায়ক ৬০

খেলাধুলায় ডুয়ার্স
উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের আউটডোর গেম ৬২

ধারাবাহিক ডুয়ার্স
ডুয়ার্স থেকে শুরু ২১, শালবনে রক্তের দাগ ৪০, মহারাণী কথা ৪৪

নিয়মিত বিভাগ
খুচরো ডুয়ার্স ৬, ডুয়ার্সের চা-বাগান চিনুন ১৮

আড্ডাঘর

মুক্তা ভবন, মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি

আড্ডাঘর নিউজ

মোবাইল ফোন ফোটোগ্রাফি প্রতিযোগিতা ২০১৮

প্রথম বছর অভাবনীয় সাড়া পড়ে গিয়েছিল। এসেছিল হাজার খানেকেরও বেশি ছবি। তার থেকে বাছাই করে ৯২ জনের একটি করে ছবি নিয়ে চলেছিল সপ্তাহব্যাপী ছবি। ১৯ সেপ্টেম্বর মহালয়ার দিন তাদের মধ্যে থেকে সেরা পাঁচজনকে দেওয়া হয়েছিল পুরস্কার। এবছরও বহু ফোন পেয়েছি, অনুরোধ এসেছে যাতে এবারও হয় এই প্রতিযোগিতা। আগামী ১৪ জুলাই রথযাত্রার দিন ঘোষণা করা হবে প্রতিযোগিতার দিনক্ষণ। জলপাইগুড়ি শহরের নামী মোবাইল ফোন বিক্রেতা 'সাগরিকা প্লাস' এগিয়ে এসেছেন তাঁদের আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা নিয়ে এবারের প্রতিযোগিতাকে আরও সফল করবার জন্য। যাঁরা এবারও যোগ দিতে চান প্রস্তুত থাকুন। লক্ষ্য রাখুন আড্ডাঘর ফেসবুকের পাতায়।

ডানপিটেদের ডুয়ার্স

আগামী ১৫ জুলাই থেকে প্রতি রবিবার সকালে সাড়ে দশটা থেকে আড্ডাঘরে বসছে 'ডানপিটেদের ডুয়ার্স'। শিশুকিশোরদের ঘন্টাদুয়েকের ক্লাবঘর। কী হবে সেখানে? যা রোজকার পড়ার বইয়ের সিলেবাসে নেই, অথচ যা আমাদের চৌখস হয়ে উঠতে কাজে লাগবে। গান, ছড়া, ছবি আঁকা, অভিনয়, সায়েন্স, যোগা, হৈচৈ — একে একে সব হবে। আপনার বাড়িতে বা পরিচিত ক্লাস ফোর থেকে এইটেপড়া যে কোনও ডানপিটে থাকলে নিয়ে আসুন ক্লাবে। আড্ডাঘর ক্লাব সদস্যদের উদ্যোগে সদস্যদের প্রথমেই কোনও প্রবেশ মূল্য দিতে হবে না।

ইয়ং ডুয়ার্স ক্যাম্প

প্রত্যন্ত বাংলার কোনে বসে বসে রীতিমত হতাশ তরুণ সমাজ, যাদের বাইরের শহরে চলে যাওয়ার উপায় সামর্থ মার্কস কোনওটাই নেই। সরকারি চাকুরি দূর অস্ত, বেসরকারি সেলসের ভাল চাকুরি পেতে গিয়ে পেরে ওঠে না বড় বড় শহরের স্মার্ট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। ফলে হতাশা আরও বাড়তে থাকে। তাদের জন্য আগামী ১ অগাস্ট থেকে আট সপ্তাহের একটি ক্যাম্প হচ্ছে আড্ডাঘর হলে, কলকাতার প্রশিক্ষকরা আসবেন, রোজ দু-তিন ঘন্টার নিবিড় অনুশীলন করাবেন। ইংরেজিতে কথা বলতে ও বুঝতে পারার, আদব কায়দা শেখার, কম্পিউটার বেসিক মেইন্টেন্যান্স ও অ্যাকাউন্টস সফটওয়্যার চালাবার প্রশিক্ষণে প্রস্তুতি অনেকটা নিয়ে নিতে পারবেন ছেলেমেয়েরা। ন্যূনতম হায়ার সেকেন্ডারি পাশ যে কেউ যোগ দিতে পারবেন নামমাত্র খরচে। আগামী ৯ জুলাই থেকে আবেদনপত্র পাওয়া যাবে আড্ডাঘর কাউন্টারে।

এখন আড্ডাঘর ক্লাব সদস্য হওয়া মানেই 'রংরুট' ও 'এখন ডুয়ার্স' পত্রিকার এক বছরের গ্রাহক হয়ে যাওয়া!

ফর্ম ভরে দু কপি ছবি সহ ৫০০টাকা জমা দিন আড্ডাঘর কাউন্টারে। জেনে নিন বাকি নিয়ম কানুন।

যোগাযোগ করুন গৌতম চক্রবর্তীকে। এখন ডুয়ার্স ফেসবুকেও ইচ্ছের কথা জানাতে পারেন ইনবক্সে।

পত্রিকা প্রকাশ হলেই জানিয়ে দেওয়া হবে। আপাতত জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের শহরের সদস্যরা পত্রিকা পেয়ে যাবেন হাতে হাতেই। বাইরের সদস্যকে পত্রিকা ক্যুরিয়রে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হবে। ইচ্ছুক থাকলে ফোন করুন ০৩৫৬১২২২১১৭, ০৩৫৮২২২৪৭৬৫।

এখন ডুয়ার্স পত্রিকা প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি

হলিডে ইয়ার, হরেন মুখার্জি রোড ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

বিশ্বাস বুক এজেন্সি, বাটা গলি, হিলকার্ট রোড ৯৪৩৪৩২৭৩৪২

শিবমন্দির

অনুপ দাস, শিবমন্দির বাজার ৯৮৩২০২৯৫১৪

জলপাইগুড়ি

ভবতোষ ভৌমিক, কমার্স কলেজের বিপরীতে ৯৭৩৩২৪৬৯১৩

বিজয় ঝা, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ৮৫৩৮৮২২৪০৪

মালবাজার

সম্রাট (হোম ডেলিভারি) ৯৩৩২০০৫৮৬৫

চালসা

দিলীপ সরকার, চালসা মোড় ৯৭৭৫৪১৫১৪৪

বিন্নাগুড়ি

রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল ৯৪৩৪৮০৯৫৯০

বীরপাড়া

বরুন ঘোষ, পোকিসা ৯৫৯৩৩৫৪১৫২

মাদারিহাট

জগৎ চৌধুরী (হোম ডেলিভারি) ৯৭৪৯৭২৫৭৮১

লাটাগুড়ি

সৌমেন (হোম ডেলিভারি) ৯০০২৪০৯৮৯৩

ময়নাগুড়ি

দেবাশিষ বসুভাট ৯৯৩৩১৯০৮৫৮

ফালাকাটা

অমল চন্দ্র পাল ৯৪৩৪৪১২৬৪৯

তুফানগঞ্জ

আনন্দবাজার বুক স্টল ৯৩৩৩৬৮৮৬৭১

দিনহাটা

হরিপদ রায় ৯৯৩২৬৩৯০৬৮

আলিপুরদুয়ার

দীপক কুমার হোড়, কলেজ হল্ট ৭৬৭৯৮৯৫৩০৭

কোচবিহার

সার্থক পণ্ডিত (হোম ডেলিভারি) ৭০০১২৬৩২৮৬

জয়ন্ত দাস, বড় পোস্ট অফিসের বিপরীতে ৯৪৩৪২১৭০৮৪

আরতি ঘোষ, কাচারি মোড় ৯৮৫১২৩৪৮৮৯

মালদা

অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি ৯৯৩২৯৬৭৯৯১

বালুরঘাট

মাধববাবু ৯১২৬২৬০৬৬৩

ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন ৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক বিশাল বুক সেন্টার ৪০৬৪৪০৯৭

সম্পাদকের কলমে

শিক্ষায় আজও পেছনের সারিতে আমরা লজ্জিত নই!

এ যেন বিরাট কোহলির চারের পরেই ছয়! কিংবা মেসির পরপর দুটি গোল! মাধ্যমিকের পর উচ্চমাধ্যমিক— রাজ্যের পরপর দুটি 'প্রথম' তকমা উত্তরের গলায়। আনন্দে আত্মহারা আমরা, তোর্সা থেকে তিস্তা সব্বাই! হবার মতই বিষয় বইকি, অনুপ্রেরণার এর চাইতে বড় সুযোগ বা নিদর্শন উত্তরের মানুষের কাছে আর কীই বা হতে পারে! খুব স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেলিত স্থানীয় নেতৃবৃন্দও, ফুল-মিষ্টি-পারিষদ-প্রেস সহ দ্রুত ছুটে যেতে কেউই অযথা দ্বিধাবিলম্ব করেন নি! উত্তরের মান বলে কথা! মনে পড়ল, বহু বছর আগে এই উত্তরেরই এক জেলাস্তরের কৃতী ছাত্রছাত্রী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হয়ে এসেছিলেন বিখ্যাত হাস্যরসিক কবি ও উচ্চপদস্থ আমলা তারাপদ রায়। উপস্থিত নেতামন্ত্রীদের টন টন প্রশস্তি ও পুরস্কার দেওয়া শেষ হলে মাইকে দাঁড়িয়ে ব্যঙ্গ রচনার জাদুকর নিজস্ব রসভঙ্গীতেই বলেছিলেন, এরকম একটা ভারিক্কি অনুষ্ঠানে আমার মতো লেখাপড়ায় লবডঙ্কা লোককে ডাকা হল কেন কে জানে! কারণ এখানে একেকজন ছাত্র বা ছাত্রী যা মার্কস পেয়েছে, আমি সারাজীবনের সব পরীক্ষার মার্কস যোগ করেও এত পাইনি!

এবার উচ্চ মাধ্যমিকে পাশের হারের তালিকায় শেষের পাঁচে রয়েছে উত্তরের চার জেলা। এককালে পরীক্ষার খাতা গঙ্গার ওপারের পরীক্ষকদের হাতে যেত, বৈষম্য বঞ্চনার আওয়াজ তুলতাম আমরা! বহুবছর হল সেসব উঠে গিয়েছে, এখন নিজেদের মূল্যায়ন করবার অঢেল সুযোগ পাই নিজেরা। তবু আজও কেন আমাদের এই হাল? কেন শিক্ষার প্রগতিতে এযুগেও ডাহা ফেল আমরা?

অভিনন্দনের প্লাবনে আমাদেরও কোনও কার্পণ্য নেই। আমরা স্থির জানি এরাই ডুয়ার্স বাংলার ভবিষ্যত, এদের হাত ধরেই সামনের পংক্তি আলো করে বসবে আগামী দিনের ডুয়ার্স। কিন্তু এসব হাস্যরসের গপ্পো এমন বেমক্কা সময়ে মনে আসাটা সমীচীন নয়, তবু কেন এল কে জানে! যেমন বিশ্বাস করতে মন চায় না তবু যখন এক অসমর্থিত সূত্রে জানতে পারি, এবার উচ্চ মাধ্যমিকে পাশের হারের তালিকায় শেষের পাঁচে রয়েছে উত্তরের চার জেলা (৬৬-৭৪ শতাংশ, যেখানে মেদিনীপুরে ৯৪-৯৬ শতাংশ), তখন এই মন বিষণ্ণ ভারাক্রান্ত হয় তো বটেই! শিক্ষার মৌলিক অধিকার ও সরকারি সৌজন্যে উত্তরেও আজ আর ভাঙা বেড়ার প্রাইমারি স্কুল দেখাই যায় না, পঞ্চায়েত ভবনগুলির মতই হাইস্কুলও সব আজ বহুতলী ইমারত, খালি পায়ের বিদ্যার্থী বা বিদ্যালয়হীন গ্রাম কি আজ আর চোখে পড়ে? মিডডে মিল আর কন্যা-সাইকেল আজ গাঁয়ের কোণে পড়ে পড়ে পচে নষ্ট হতে থাকা সব মেধাকে বিদ্যালয়মুখী করেছে বাকি রাজ্যের মতো এখানেও, কোনও ফারাক নেই। এককালে পরীক্ষার খাতা গঙ্গার ওপারের পরীক্ষকদের হাতে যেত, বৈষম্য বঞ্চনার আওয়াজ তুলতাম আমরা! বহুবছর হল সেসব উঠে গিয়েছে, এখন নিজেদের মূল্যায়ন করবার অঢেল সুযোগ পাই নিজেরা। তবু আজও কেন আমাদের এই হাল? কেন শিক্ষার প্রগতিতে এযুগেও ডাহা ফেল আমরা?

আজকের এই পরিস্থিতির জন্য কাকে দোষারোপ করব আমরা? শিক্ষাঙ্গনে মাস্তানি রাজনীতির উলঙ্গ খবরদারিকে? নাকি শিক্ষকসমাজের চুটিয়ে রাজনীতিতে অংশগ্রহণকে? আজ চল্লিশ বছরের মধ্যে যে সব শিক্ষকদের বা বাবা-মায়ের বয়স, ইংরাজি ভাষার অন্তর্ধানের পরে তাদের বাংলা মাধ্যমে নিরুপায় উচ্চশিক্ষা লাভ কি তাদের অর্জিত শিক্ষার মানে অবনমন ঘটিয়েছে? যার প্রত্যক্ষ গুনাগার দিতে হচ্ছে তাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে বা ছেলেমেয়েদেরকে? শিক্ষকদের বেত্রাঘাতের অধিকার হারিয়ে যাওয়াকেও কি অন্যতম বড় কারণ বলে ধরা যায়? কিন্তু এসব সমস্যা তো মেদিনীপুর বা বীরভূমেও রয়েছে, কই সেখানে শিক্ষার মান তো সেভাবেপড়ে নি! তবে কি চা শিল্পে মন্দা কিংবা শিল্পহীন ডুয়ার্সে জীবিকার তাগিদে শিক্ষার্থীদের আগেভাগেই পড়াশোনার পাট গুটিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়াই কি আজও ডুয়ার্সে শিক্ষায় অগ্রগতির পথকে রুদ্ধ করে রেখেছে? সে ধরনের সমস্যাও তো উত্তরের মতই দক্ষিণেও বিরাজমান, সেখানে এমন ক্রমাগত পিছিয়ে পড়া তো নেই! আজও কিঞ্চিৎ ভালো রেজাল্ট করলেই বাইরে কোথাও একটা ভর্তি করার জন্য উত্তরের অভিভাবকদের আকুলতা কি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় না আমাদের শিক্ষায় গুণগত মানের করুণ হাল? যেখানে পরবর্তীদের অনুকরণ বা অনুসরণ করবার মতো কিছুই পড়ে থাকে না! তবে কি আমরা গালিমন্দ করব নিজেদের অদৃষ্টকেই? নাকি নির্লজ্জতা বহাল রেখে আমরা তাকিয়ে থাকব ভবিষ্যতের পানে?

গত শতাব্দীর শেষ চার-পাঁচ দশক ধরে বাংলা ছাত্রসমাজের যে বিশাল অংশ শাসকবিরোধী মনোভাবে বিশ্বাসী ছিল, তাদের উত্তরসূরীরা পালা বদলের সঙ্গে সঙ্গে ভোগ করতে শুরু করে শাসনক্ষমতার স্বাদ। ছাত্রবাহিনীর প্রতিবাদী চরিত্র বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে সেই ভোগবাদের তত্ত্বে ও মহিমায়। সাধারণ রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ তাদের সুকুমার চেতনাকে আপনাআপনি বেড়ে উঠবার সুযোগ দেয় নি। পার্টি অফিসে যাতায়াতকে বাধ্যবাধকতার বেড়াজালে বেঁধে দিয়ে তাদের আবেগকে পণ্য করা হয়েছে ক্ষমতা দখলের সিঁড়িতে। সেই অভাগারাই আজকের শিক্ষক অভিভাবক, যাঁদের নিজ পুত্রকন্যাদেরকে ভালমন্দ শেখাবার চেতনাবোধটুকু লুপ্ত। তারই ফল হিসেবে আমরা পেয়েছি আজকের আবেগহীন নয়া প্রজন্ম, যারা কিছু দিতে রাজি নয়, সাফ সাফ কেবল কিছু নিতে বা পেতে প্রস্তুত। দার্শনিক বিজ্ঞানীর অমোঘ তত্ত্বই আবার সত্য প্রমাণিত হয়— প্রতিটি ক্রিয়ারই সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকে। শিক্ষার প্রগতিকে কেবল সাইনবোর্ডে ঝুলিয়ে রাখবার তাচ্ছিল্য আজ কঠিন জবাব দেয়— পেছনের সারি থেকে আমরা পৌঁছে গিয়েছি আরও পেছনের সারিতে। লজ্জায় মাথা হেঁট করবার বদলে আজও একে যদি প্রৌঢ়ত্বের বিলাপ ভেবে উড়িয়ে দেন কোনও স্বল্পমেয়াদী 'মানবপ্রেমী' নেতা, তবে তাঁকে একটাই হুঁশিয়ারি— সংহারলগ্ন আসন্ন। পাওয়ার নেশায় বুঁদ নিও-হাংরি-জেনারেশন তোমায় গলিতে রাজপথে জীবন্ত দগ্ধ করবে, ওহে মূর্খ কুশপুতুল!

আমাম

মানে আম প্লাস আম। বাঙলা স্বরসন্ধি। মিনিংটা জানতে চাইছেন কত্তা? আমাম মানে আমজনতার আম। আমের এবার দলে দলে ফলেছে কি না! তাই আমদাম নেমে এসেছে কুড়ি-পঁচিশে। পাব্লিক ফাটিয়ে আমাচ্ছে, মানে আম খাচ্ছে। মাঝখানে অবশ্যি আদুর বাদুর চালতা বাদুরের ভয়ে আমআশা ত্যাগ করেছিল অনেকে— আম-লিচুকে ভাবছিল নিপাভাই-এর দ্বারা নিপাতনে সিদ্ধ। তা কত্তা, গরমে আম পাকলে কদ্দিন ভাইরাসের ভয় কাজ করে বলুন! ফলে চুটিয়ে খাচ্ছে পাব্লিক। তামাম ডুয়ার্স তাই আমাম। আমআদমি আম চুষি আমোদে নাচিছে। শুনছি বেনারসিও মিলছে তিরিশ টাকায়। না কত্তা! শাড়ি নয়। বলছি বেনারসি ল্যাংরা নাকি ওই দামে বিকোচ্ছে ফুটপাতে লুটিয়ে। পঁচিশেও ছাড়ছে। কী বললেন কত্তা! বেনারসি ল্যাংরা বলতে নেই? কী বলব তবে? একদম ঠিক বলেছেন কত্তা! জয় শ্রী আম!

শিক্ষারক

মুনিঋষিরা বলে গেছেন যে, শিক্ষার যেমন রত্ন হয় তেমন ক্ষারকও হয়। ডুয়ার্সে ইদানিং স্থাপত্যোন্নয়ের বান ডেকেছে। ঝপাঝপ দালানবাড়ি স্থাপিত হচ্ছে। যেমন দশতলবিশিষ্ট বৈদ্যবিহীন সুপার হসপিটালহর্ম্য কিংবা ঢালতলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দারভবন। একখানি চালচুলোহীন জেলাও হয়েছে শুনলুম। আরো শুনছি গন্ডা দুয়েক কলেজ পিছু একখানি বিশ্ববিদ্যালয় গজাচ্ছে। বাকিটা বলতে লজ্জা লাগছে, তবু বলি। প্রশংসিত পঞ্চমুখি বিশ্ববিদ্যালয় নাকি দাদাঠাকুরের ডেফিনেশান মেনে শিক্ষারূপ অমৃত, থুড়ি, ক্ষারক বিতরণ করছে। বুঝলেন না? দাদাঠাকুরবাবু একদা নাকি বলেছিলেন যে বিশ্বের বিদ্যা যেখানে আসিয়া লয় প্রাপ্ত হয়, তাহাই (ডট ডট ডট)। সেখানে নাকি নাম্বারের ঝুলি উপুর করে সব বসে আছে গো! আবার শুনলুম বৈকুণ্ঠপুরের এক চা-বাগান আর রেলস্টেশান মাঝে কোন এক পেরাইভেট কলেজ নাকি টাকার বিনিময়ে নকল করার গ্যারান্টি দিচ্ছে! সেটা আবার শিক্ষকশিক্ষা পরীক্ষার সেন্টার! হে গম্মেন্ট! এখনও কি বলবে যে 'শিক্ষারক' উপাধি পাওয়ার মতো কেউ নাই এ ডুয়ার্সে?

রেঞ্জার ইন ডেঞ্জার

সবাই জানে সে অজ গিলতে পারে বলেই অজগর। তা বেলাকোবার সাহেববাড়ি গাঁয়ের পাব্লিক আচমকা আবিষ্কার করে যে সত্যি সত্যি এক অজকে গ্রেপ্তার করে গিলতে যাচ্ছে এক পেল্লায় অজগর। অমনি হৈ হল্লা, পুলিশ, সাংবাদিক। বনবাবুরাও হাজির। তা ব্যাটা অজগর কি আর হকের ছাগল ছেড়ে দেবে? প্রবল ধস্তাধস্তির শেষে অজগরবাবুকে কাবু করে কব্জা করা হলো। নিয়মমত এবার তার হাসপাতাল হয়ে বনে ফিরে যাওয়ার কথা। কিন্তু

এত স্ট্রাগল করে অজগর পাকড়ানো হলো, একটা সেলফি হবে না কো? তা সাপের সঙ্গে সেলফি তোলা সোজা নয় মোটে। সাপের কাঁধ নেই যে জড়িয়ে ধরবে! পাশে খাড়া হয়ে সেলফির পোজ দেওয়ার ইচ্ছাও নেই তার। মনে হয় অজগরটার ফেবু একাউন্টই নেই। শেষে গলায় জড়িয়ে সেলফি! অজগর তক্কে তক্কেই ছিল। পাব্লিকের ফুর্তি দেখে রেঞ্জারবাবু তাকে গলায় জড়াতেই সে দিল চাপ! রেঞ্জার বলল, বাপ! দম প্রায় বেরিয়ে যায় যায়! আবার শুরু হলো হুলুস্থুল। এর আগে চাপে পড়ে ছাগল ছেড়েছে, রেঞ্জারের গলা ছাড়তে তাই খুব আপত্তি করছিল অজগরদা। বহু কষ্ট তাকে গলাছাড়া করে রেঞ্জারবাবুকে বাঁচান গেছে। তা অজগরের কাজ অজগর করেছে, কিন্তু রেঞ্জার হয়ে এ কি ডেঞ্জার কাজ করলেন স্যার?

টক ফাইট

টক ফাইটিং শোনো নি চাঁদু! তবে আর শুনলে কী? টক ফাইটিং হলো বাকযুদ্ধ। গেরুয়া সূর্যবাবুর সঙ্গে সবুজ সূর্যবাবুর টক ফাইটিং দিয়ে ডুয়ার্সে পঞ্চায়েতোত্তর যুগ শুরু হলো সেদিন শোনো নি? গেসূর্য নাকি বলেছেন সসূর্যকে সাগরদীঘির জলে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স চুবিয়ে রাখবেন— যাতে ওনার মগজ শীতল হয়। তখন অবশ্যি কোচরাজ্যে ফাটাফাটি গরম। সসূর্য নাকি শুনে বলেছেন, এই গরমে স্নান করিয়ে দেবে, সে তো ভালো কতা রে ভাই! তবে বাক্যে অলঙ্কার প্রয়োগ করতে চাইলে রিঅ্যাকশান বদলে যাবে। গুজবে জানা গেছে যে সসূর্যবাবুর ফর্ম দেখে মহাদিদিও নাকি চিন্তিত। আলিনগরের গবেষক ভাইকে দিয়ে কিছু হচ্ছে না। শিলনগরের বুদ্ধভাইও বেফর্মা। রাত্রীহাটার পদ্মসুত তথৈবচ। ভরসা বলতে সূর্যভাই। তাঁর মাথায় অক্সিজেন বেশি ঢুকলে তো সমস্যা গো! কোচরাজ্যে কারা জানি আবার বলছে, টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স সাগরদীঘিতে ডুবিয়ে রাখা মানে দীঘির বারোটা বাজান! যেমন মাথা তেমনই রবে, জল শুকিয়ে বাষ্প হবে। কারা বলে এসব? নিজগোঠের মেম্বাররাই বলে। বাপ রে! কোচরাজ্যে বর্ষা কবে নামবে তা জানো চাঁদু?

ইগোশ্রাদ্ধ

এ কী রে বাপৈ! ভূতুড়ে গপ্পে এমন হয় শুনেছি। বাপ-ব্যাটার শ্রাদ্ধ হচ্ছে। পুরোহিত, চালকলা, ফুল-চন্দন সব ঠিকঠাক। নিমন্ত্রিতরাও হাজির। কিন্তু তাঁদের হাসিমুখে দৈ-চিঁড়ে পরিবেশন করছে কে? ওরে বাপরে! যাদের শ্রাদ্ধ তাঁরাই তো! না গো কাকা! ঘাবড়ানে কা কই বাৎ নেহি! বাপ-ব্যাটা নিজেদের শ্রাদ্ধ নিজেরাই করছে কি না। পরলোকে যাওয়ার আগেই পারলৌকিক কাজ সেরে নিচ্ছে কেন জিগ্যেস করছেন? জবাবটা যে কী ভাবে দিই। বেশ জটিল আর খানিকটা বিচিত্র এবং কিছুটা দুর্বোধ্য। এক

কথায় এ হলো ইগোশ্রাদ্ধ। ওই যে বলে না, আমার মধ্যে এক আমি আছে যা কিনা সব অহঙ্কারের প্রতীক— সেই 'আমিত্ব'-এর শ্রাদ্ধ হলো। এবার থেকে বাপ-ব্যাটা আমিহীন। তাঁদের কোনও 'আমি' নেই। 'এ আমির আবরণ' ছাড়িয়ে তাঁরা এখন মুক্ত। তবে কি তাঁরা আর বলবেন না 'আমি ভাত খাব?' নিশ্চই বলবেন। মানে ভাত খাওয়ার আমি আর আমার আমি, মানে ইয়ে, মানে আমার ইগোর আমি— যাক গে! যা বুঝলেন সেই ব্যাপারটা থেকে মুক্তিলাভের জন্যই এসব করা। এখন তাঁরা ইগোমুক্ত ঈগল পাখির মতো মহানন্দে ঘুরে বেড়াবে রায়গঞ্জে।

ষন্ডগোল

এমনিতেই গোমাতাদের নিয়ে ধূপগুড়ি মাঝে মাঝেই ঝামেলায় পড়ে। মাতারা রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে রোমন্থন করে তাই জ্যামজট লেগে যায়। কারণে অকারণে লেজ তুলে হিসুপটি করে রাস্তার বারোটা বাজায়। কে জানি বলেছিলেন গোমাতার নিঃশ্বাসে ভর্তি অক্সিজেন— সুতরাং ধূপগুড়ি পুর এলাকার মগজে নির্ঘাৎ অক্সিজেন বেশি যাচ্ছে। তা এত এত গোমাতা থাকলে দু-একটা গোপিতা উত্তেজিত হয়ে ঘোরাঘুরি করবে, এতে আর আশ্চর্য কী! তেমনই এক গোবাপ থুড়ি ষন্ড ক'-দিন ধরেই রোমিওগিরি করছিল। সেদিন হঠাৎ ঢালু নর্দমায় সুস্বাদু খাদ্যের গন্ধ পেয়ে যেই একটু ঝুঁকেছে অমনি ধপাস! গোগার্লদের সামনে এমন পতনে প্রেস্টিজ এক্কেবারে দফারফা! তদুপরি তাকে তুলতে দমকলকে ক্রেন আনতে হয়েছে। এতে বাকি প্রেস্টিজও গঙ্গাজলে। তা মানব সন্তানেরা বিস্তর কষ্ট করে পিতাকে তুললেও তিনি নাকি খুশি হন নি। কী আর করা যাবে? গোবান্ধবীর দল তো দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল। তবে নর্দমা থেকে উত্থানের পর অসন্তুষ্ট গোপিতা নাকি ধূপগুড়ি বয়কট করে কোথায় জানি ভ্যানিশ হয়েছেন। তা হতেই পারে। গো বলে কি ইগো নেই?

টুক্রাণু

ডুয়ার্সের অরণ্যে এসি না থাকার কারণে গরমে ঘায়েল চিতাদের আবার লোকালয়ে আগমন। রোগি বহনের জন্য মেডিক্যাল কলেজে স্ট্রেচার না পেলে মাল বহনের ট্রলি পাবেন। বর্ষার আগেই এত বাংলা দারু বাজেয়াপ্ত ডুয়ার্সে তাই মাতালদের বর্ষা ভালো কাটা নিয়ে আশঙ্কা। প্রথম বর্ষাতেই ডুয়ার্সের মেলা জায়গায় রাস্তা মুছে গেছে। সামসিং বাস স্ট্যান্ডে বৃষ্টি নামলেই পুকুর গজায়। মাথাভাঙ্গা লাগোয়া পচাগড়ে বিদ্যুতের তেজ টর্চের ব্যাটারির চাইতেও কম ফলে পথাবরোধ। কিছুদিন শান্ত থাকার পর হাতিদের কেউ কেউ পুনরায় মাওবাদি হচ্ছে। ডুয়ার্সে বোতলের মদে গ্যারান্টি কিন্তু বোতলের জলে নেই। রহস্যময় কারণে চাংরাবান্ধার বাস স্ট্যান্ডে যায় না কোনো বাস। ধান কেনায় ডাহা ফেল কোচবিহার। জামাই ষষ্ঠীর দুপুরে ধূপগুড়িতে গেরস্ত বাড়িতে এক গোখরো এসেছিল। শিকারপুর গ্রামে গেরস্তের বিদ্যুতের বিল এসেছে মাত্র তিন লাখ টাকা।

ছড়রা

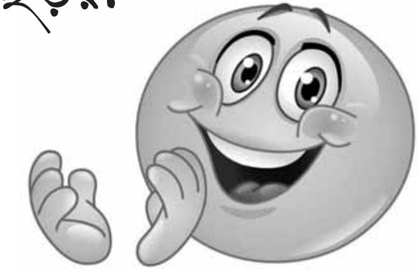

বিশ্বকাপের রাত দিন লিমেরিক খান তিন

১

টলমলে পানু নাকি দলবলে রাশিয়া
গিয়াছিল ফুটবল খেলা ভালোবাসিয়া
বরফেতে গ্লাস ভরে ঠাসিয়া
ভোদকায় রাতদিন ভাসিয়া
ঠাণ্ডায় গলা ভেঙ্গে মরিল যে কাশিয়া

২

রাতদুকুরে চড়াও হল ওয়ার্ল কাপের ভূত
রাস্তা জুড়ে খিল্লি জোড়ে একেকটা যমদূত
হাল্কা একটা হাই তুলে
ভগবান তার উর্দি খুলে
ঘুমিয়ে পড়েন ডাকলে বলেন ভাল্লাগে না ধ্যুত

৩

খেলা দেখে দুনিয়া খেলে গুটিকয় দল
রাত জেগে বাজি হারে দিনভর কোন্দল
কোটি দামে বেচে দিয়ে ঠ্যাং গুলো
ক্লাব আগে বাছারা বাঁচিয়ে খেলো
ফুটে যায় দেশপ্রীতি পড়ে থাকে শুধু বল

সনাতন চন্দ

বইপত্র সাহিত্য

কোরাণ তত্ত্ব সহিষ্ণুতার পাঠ

জলপাইগুড়ি জেলার অনেক ঐতিহ্যের অন্যতম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। দীর্ঘদিন ধরে এ জেলায় হিন্দু মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মবলম্বী মানুষেরা শান্তি ও সৌহার্দ্য পূর্ণ পরিবেশে বাস করে আসছেন। জলপাইগুড়ির একটি পুরনো পত্রিকা থেকে এ সম্পর্কে একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করি— 'আমাদের জলপাইগুড়ি জেলা বঙ্গদেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় বহু বিষয়ে পশ্চাদ্‌পদ ইহা সত্য। কিন্তু একটি বিষয়ে আমরা শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে পারি। আজও এ জেলায় কোন তীব্র সাম্প্রদায়িক বিরোধ দেখা দেয় নাই। জলপাইগুড়ির পল্লীতে হিন্দু ও মুসলমান পাশাপাশি বাস করিয়াছে, সুখে দুঃখে দুই সম্প্রদায় এক হইয়া গিয়াছে। পরস্পরের মাথা ফাটাইয়া ধর্মের পবিত্রতা রক্ষা করিতে হইবে এ শিক্ষা আজও তাহাদের হয় নাই।' (দেশবন্ধু/সম্পাদক ঃ প্রীতিনিধান রায়। জলপাইগুড়ি, ১লা কার্ত্তিক ১৩৪৫) সম্প্রতি যে দুর্যোগ আমাদের দীর্ঘদিন লালিত বহুত্ববাদের ঐতিহ্যকে বিনষ্ট করবার বাতাবরণ গড়ে তুলছে, তার সংক্রমণ ঠেকাতে, জলপাইগুড়ি থেকে প্রকাশিত এই পুরানো বইয়ের প্রসঙ্গ মনে এল, যার সাথে জলপাইগুড়িবাসীর সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। কিছু কিছু এমন পুরানো বই আছে, যা সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে আবার নতুন ও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে পারে, এমনই একটি বই ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী লিখিত 'কোরাণ তত্ত্ব'।

আমার বাবার পুরনো কাগজপত্রের আলমারি ঘেঁটে এই ছোট বইটি পেয়েছিলাম আজ থেকে অনেক বছর আগে, সযত্নে রেখে দিয়েছিলাম। বইটি জলপাইগুড়ি থেকে লেখক নিজেই প্রকাশ করেছিলেন বাংলা ১৩২৬ সনে। বইটি ছাপা হয়েছিল কলকাতার ২৫ নং রায়বাগান স্ট্রিট, ভারত মিহির যন্ত্রে। ১৮৬৯ সনের ১ লা জানুয়ারি জলপাইগুড়ি জেলার পত্তন হয়েছিল। এই সময় আসেন সরকারি কর্মচারী আইনজীবি ও চিকিৎসক ব্যবসায়ী, বণিক, সেই সঙ্গে অনেক বেসরকারি লোক। চারুচন্দ্র সান্যাল জলপাইগুড়ি শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থে— 'জলপাইগুড়ি সহরের একশো বছর ১৮৬৯-১৯৬৯' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, এতে জলপাইগুড়িতে আগত পুরনো মানুষদের কথা বিস্তারিত লিখেছেন তিন দফায়। এর মধ্যে দ্বিতীয় দফায় যারা এসেছিলেন— '১৮৭০ সন থেকে ১৮৭৮ সনে রেলগাড়ি এদিকে আসবার পূর্বে এলেন পাবনার জয়চন্দ্র সান্যাল, উকিল হয়ে (পুত্র চারুচন্দ্র সান্যাল, উকিল পাড়া), পাবনার হৃদয়নাথ বাগ্‌চি উকিল হয়ে (পৌত্র, নৃপেন্দ্র নাথ ও নীরেন্দ্র নাথ বাগ্‌চি উকিল পাড়া) পাবনার যাদব চন্দ্র চক্রবর্তী উকিল হয়ে (পৌত্র প্রভাত চক্রবর্তী, উকিল পাড়া) পাবনার কেশব চন্দ্র ঘটক উকিল হয়ে (পৌত্র দেবব্রত ঘটক, উকিল পাড়া)...' এই উকিলদের দলে সম্ভবত ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীও ছিলেন। এই অনুমান করছি ওই জলপাইগুড়ি শত বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থে সম্পাদকমণ্ডলীর দেওয়া একটি তালিকার উপর ভিত্তি করে। ১৮৭০ সন থেকে যে সব ব্যক্তিরা ওকালতি

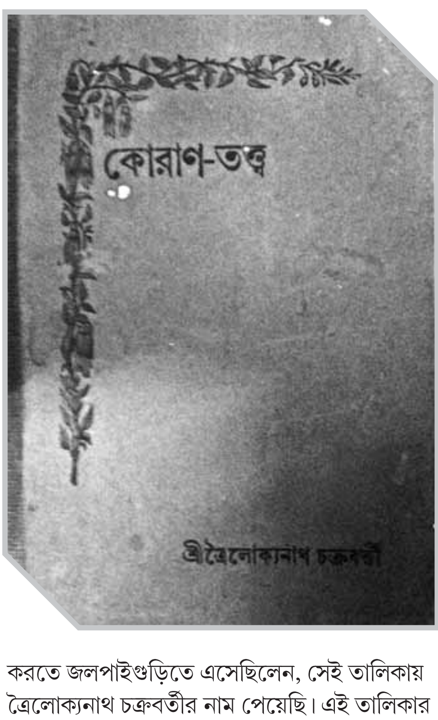

করতে জলপাইগুড়িতে এসেছিলেন, সেই তালিকায় ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর নাম পেয়েছি। এই তালিকার মুখবন্ধে সম্পাদকমণ্ডলী লিখেছিলেন— 'সহরের উকিল, মোক্তার, মোহরার, ডাক্তার কবিরাজ ও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম দেওয়া হইল। ইহারা কেহই আজ জীবিত নাই। গত ১৯৬৮ সনের বন্যায় পুরাতন কাগজপত্র সবই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। নচেৎ আরও বিশদ ও সঠিক বিবরণ দেওয়া সম্ভব হইত, ১৮৭০ সন হইতে ক্রমান্বয়ে নামগুলি দিবার প্রয়াস করা হইল। হয়ত অনেক নাম বিস্মৃতির অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে এতদিনে।'

ত্রৈলোক্যনাথের নাম হয়ত অনেকেই ভুলে গেছেন, কিন্তু তাঁর লেখা 'কোরাণ-তত্ত্ব'র কথা কিন্তু অনেকের মনে আছে। বইটি নিয়ে বিশদ করে কোথাও কিছু লেখা হয়নি। প্রয়াত অধ্যাপক মলয় বসু 'মধুপর্ণী' পত্রিকায় জলপাইগুড়ি সংখ্যায়, তাঁর রচিত এই বইটির কথা শুধু উল্লেখ করেছেন। বাংলায় যারা কোরাণের ভাষান্তর করেছেন তাদের মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী অন্যতম। জলপাইগুড়িতে বসে তিনি এই কাজটি করেছিলেন, বইটি ছাপিয়ে আনিয়েছিলেন কলকাতা থেকে। এপার বাংলা-ওপার বাংলার বিদ্বজ্জন সমাজে বইটির কথা প্রায় শোনা যায় না বললেই চলে। বইটির পুর্নমুদ্রণও হয়নি।

ত্রৈলোক্যনাথ ব্যক্তি মানুষটি কেমন ছিলেন, জানবার অনেক চেষ্টা করেও সফল হইনি। সম্প্রতি উমেশ শর্মার সম্পাদনায় প্রকাশিত 'জলপাইগুড়ি পৌরসভা ঃ ১২৫ বছরের ইতিবৃত্ত (১৮৮৫-২০০৯)' গ্রন্থে ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া গেল...

"উনবিংশ শতাব্দীতে একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের পক্ষে কোরাণের বয়াৎ উদ্ধৃত করে সাবলিল ভাবে বঙ্গানুবাদ করা সহজ কথা নয়। বিশেষতঃ যেখানে জলপাইগুড়ি জেলাই গড়ে উঠেছিল সেই শতাব্দীর

শেষ পাদে ১৮৬৯ সালে, সেই জনপদে বসে কোরাণের বঙ্গানুবাদ করা যে কত কঠিন ছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়। ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী সেই অসাধ্যসাধন করে রচনা করেছিলেন একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থ— 'কোরাণ তত্ত্ব'। এখানেই তাঁর ঔদার্য, মহত্ব এবং সামাজিক চেতনার বিশেষত্ব।"

ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী ১৯০৫ সালে পৌরসভার সদস্য পদ লাভ করেছিলেন ১৯১৫ সাল পর্যন্ত দু'দফায়। তিনি 'কোরাণ তত্ত্ব' গ্রন্থটি ১৯০০ সালের কাছাকাছি কোন সময়ে রচনা করেছিলেন বলে অনুমান করা যায়।

তিনি ছিলেন প্রখর মেধাসম্পন্ন পন্ডিত ব্যাক্তি। বর্তমানে কামার পাড়ার অগ্রসেন ভবনের বিপরীত দিকে তাঁর বাড়ি ছিল বলে জানা যায়। প্রতিবেশি আর এক কমিশনার ও আইনজীবি মাখন লাল চক্রবর্তীর তিনি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন বলে তথ্য পরিবেশন করে মাখনবাবুর পৌত্র প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী জানান যে ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী নিঃসন্তান ছিলেন, পরিণত বয়সে তিনি কালী সাধনায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখতেন। তাঁর বাড়িটি ভগ্ন অবস্থায় দীর্ঘদিন পরেছিল। বাড়ির সামনে টিনের চৌচালায় প্রবেশের মুখে 'ওঁ' লেখা ছিল। বাড়িটি অভিভাবকহীন হিসেবে পরে থাকার কারণ, তিনি শেষ বয়সে সস্ত্রীক গৃহত্যাগ করেছিলেন। কাশীধামে তাঁর মৃত্যু হয়।

বাংলার ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন ছিলেন এক অগ্রণী ব্যক্তিত্ব। তাঁর গ্রন্থাবলী বিদ্বজ্জন সমাজে অত্যন্ত সুপরিচিত। গিরিশচন্দ্র সেনই প্রথম কোরাণের বঙ্গানুবাদ করেন, তাঁর সংস্কার মুক্ত মনীষায় ইসলাম ধর্মের মণিমুক্তোগুলোকে বঙ্গভাষী পাঠকের সামনে হাজির করে মুক্ত মনের এক উদার আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র সেন প্রবর্তিত এই ধারার একজন সার্থক উত্তরসুরী ছিলেন ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী। কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের কোরাণ তত্ত্ব বঙ্গীয় পাঠক সমাজে তেমন পরিচিতি পায়নি। তাই গিরিশচন্দ্র সেনের কোরাণের বঙ্গানুবাদের অসাধারণ কৃতিত্বের পাশে ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর 'কোরাণ তত্ত্বের' কথা প্রায় অনুচ্চারিতই থেকে গিয়েছে। কলকাতা থেকে অনেক দূরে থাকার কারণে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধার কারণে বৃহত্তর পাঠক সমাজের বাইরেই থেকে গেছে 'কোরাণ তত্ত্ব'। কোরাণের বঙ্গানুবাদের যে গ্রন্থপঞ্জী তাতেও ত্রৈলোক্যনাথের বইটির তথ্য সংযোজিত হয়নি।

'কোরাণ তত্ত্ব' প্রকাশের পর একশ বছর অতিক্রান্ত। গিরিশচন্দ্র সেনের বঙ্গানুবাদের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত হয় ত্রৈলোক্যনাথের কোরাণ তত্ত্ব ১৯১৯। বই দুটির প্রকাশ কালের ব্যবধান প্রায় কুড়ি বৎসরের। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন নববিধান ব্রাহ্মসমাজের ধর্মমত প্রচারে উত্তরবঙ্গে এসেছিলেন। গিরিশচন্দ্রের আত্মজীবনীতে দেখা যায় তাঁর উত্তরবঙ্গ ভ্রমণের তালিকায় জলপাইগুড়িও আছে। ত্রৈলোক্যনাথের সাথে গিরিশচন্দ্রের কোন যোগাযোগ হয়েছিল কিনা সে রকম কোন তথ্যের সন্ধান আপাতত আমাদের হাতে নেই। তবে অনুমান করা যায় ত্রৈলোক্যনাথ যেখানে বসবাস করতেন তাঁর অদূরেই ছিল জলপাইগুড়ির ব্রাহ্মসমাজ পাড়া, সেখানে একটি ব্রাহ্ম মন্দিরও ছিল, যেখানে এখন ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের অফিস, ওই পাড়াটি বর্তমানে সমাজ পাড়া নামে পরিচিত। ত্রৈলোক্যনাথ নিজেই হয়ত তাঁর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। গিরিশ চন্দ্রের বক্তৃতা শুনে, তার দ্বারা প্রভাবিত বা অনুপ্রাণিত হওয়াও অস্বাভাবিক কিছু না।

'কোরাণ তত্ত্বের' সূচনা অংশ ছন্দবদ্ধ, পয়ারের ছাঁদে রচিত। এই রচনার সামান্য অংশ নীচে উদ্ধৃত হল—

সূচনা

অনন্ত বারিধি মাঝে বহি অম্বুরাশি
ঋজু, বক্র, দীর্ঘ, হ্রস্ব, স্রোতস্বিনী কত
হইতেছে প্রবাহিত; এক(ই) অম্বুরাশি
বিভিন্ন নামেতে বহে বিভিন্ন প্রদেশে;
অনন্ত শ্রীবগবানে—স্রোতস্বিনী যথা
মোসলেম, হিন্দু, খৃষ্ট, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম আর
পারসিক জৈন আদি নানা ধর্ম্ম যত
রুচিভেদে দেশভেদে প্রকৃতি ভেদেতে
স্থান, পাত্র, দেশ কালে উপযোগী হ'য়ে
হইতেছে প্রবাহিত; —এক ভগবানে
বিভিন্ন নামেতে সেবে বিভিন্ন প্রদেশে;
অম্বু যথা ভিন্ন নামে হয় পরিচিত
ভিন্নদেশে; কিন্তু হায় ভ্রমান্ধ মানব
নিজ ধর্ম্ম জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলি
অলীক, অসার দ্বন্দ্ব করে পরস্পরে।
যেই সত্য হিন্দু-শাস্ত্রে আছে প্রচারিত,
সেই সত্য মহাম্মদ করিলা প্রচার
এক ধর্ম্ম, এক মূল, এক ভগবান

'কোরাণ তত্ত্ব'কে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব আলোচনার গ্রন্থও বলা যেতে পারে। ত্রৈলোক্যনাথ শ্রীমদ্ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারতের সাথে কোরাণের অনুবাদ সহ তুলনামূলক আলোচনা করে সাদৃশ্য বিশ্লেষণ করে ঘোষণা করেছিলেন— 'এক ধর্ম্ম, এক মূল, এক ভগবান'। বইটি রচনা করবার উদ্দেশ্য সম্পর্কে গ্রন্থ শেষে পাঠকদের জন্য তিনি একটি প্রতিবেদন রেখেছেন—

'প্রিয় পাঠক। হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখান এবং উভয় ধর্ম্ম লইয়া পরস্পর বিবাদ নিবারণ এবং উভয় ধর্মের মূল ভিত্তি এক ইহা প্রতিপন্ন জন্য এই কোরাণ তত্ত্ব লিখিত হইল। হিন্দু শাস্ত্র মতে শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধ প্রভৃতির ন্যায় মহম্মদ (আল্লা) ভগবানের অবতার ছিলেন এবং তাহাকে অবতার রূপে গ্রহণ করা সঙ্গত। পবিত্র কোরাণ এবং হদিছ খোদার কালাম বটে। কোরাণ তত্ত্বে পবিত্র কোরাণ হজরত মহম্মদ (আলার) মুখ নিসৃত বলিয়া যদিও তাহার নিজের উক্তি বলা হইয়াছে তবু ঐ উক্তি খোদার কালামরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।'

"উনবিংশ শতাব্দীতে একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের পক্ষে কোরাণের বয়াৎ উদ্ধৃত করে সাবলিল ভাবে বঙ্গানুবাদ করা সহজ কথা নয়। বিশেষতঃ যেখানে জলপাইগুড়ি জেলাই গড়ে উঠেছিল সেই শতাব্দীর শেষ পাদে ১৮৬৯ সালে, সেই জনপদে বসে কোরাণের বঙ্গানুবাদ করা যে কত কঠিন ছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়। ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী সেই অসাধ্যসাধন করে রচনা করেছিলেন একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থ— 'কোরাণ তত্ত্ব'। এখানেই তাঁর ঔদার্য, মহত্ব এবং সামাজিক চেতনার বিশেষত্ব।"

ভাবতে অবাক লাগে এই মুক্ত মনীষার অনুধাবনে। এই হিন্দু ব্রাহ্মণ, যিনি কালীসাধনাও করতেন, তিনি কীভাবে কোরাণ অধ্যয়ন করে, তা বঙ্গানুবাদ করে তার সারাৎসার বাংলা ভাষায় পাঠকদের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। জলপাইগুড়ির মত জনপদ থেকে তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি 'কোরাণ তত্ত্ব' রচনা করে একটি বড় সামাজিক দায়িত্বও পালন করেছেন। সম্প্রতি সারা দেশ জুড়ে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা নিয়ে তর্ক বিতর্ক চলছে তার প্রেক্ষাপটে ত্রৈলোক্যনাথের এই বইটি অসাধারণ সহিষ্ণুতার তাৎপর্য বহন করে। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত দেশভাগের যন্ত্রণা নিয়ে ও এই নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ব্যবহার জীবীর লিখিত সহিষ্ণুতার কথা কি অজ্ঞতাই থেকে যাবে, বইটি কলকাতা থেকে অনেক দূরে জলপাইগুড়িতে বসে লিখতে হয়েছিল বলে? বইটি বৃহত্তর পাঠক সমাজের জন্য পুনঃপ্রকাশের দাবী রাখছেন প্রতিবেদক।

রণজিৎ কুমার মিত্র

(লেখাটি বেশ কয়েক বছর আগে জলপাইগুড়ি বই মেলা স্মরিণাকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

গত জুন ২০১৮ সংখ্যায় 'জলপাইগুড়ির ইতিহাস' বইটির আলোচক ছিলেন রণজিৎ কুমার মিত্র। ভুলক্রমে তাঁর নামটিই বাদ পড়ে গিয়েছিল। এই অপরাধের জন্য আমরা লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী।)

লেখা পাঠান হাতে লিখে নয়, টাইপ করে

ডুয়ার্স সংক্রান্ত আপনার কোনও লেখা থাকলে টাইপ করে পাঠান। আপনার লেখা সম্পাদকমন্ডলীর পছন্দ হলে এই পত্রিকায় তা ছাপা হবে। লেখার বিষয়বস্তুর উপর ছবি থাকলে অবশ্যই পাঠাবেন। লেখা পাঠানোর ঠিকানা 'আড্ডাঘর', মুক্তাভবন, মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি। অথবা মেল করতে পারেন নিচের মেল আইডি-তে
editor.ekhonduars@ yahoo.com

এখন ডুয়ার্স

ফোর লেন ফালাকাটা প্রহর গুনছে সুদিনের

নতুন জেলায় পাঁচ বছরে পা

কোনও পৌরসভা নয়, মহকুমা শহর তো নয়ই, কিন্তু জেলার মূল বাণিজ্যকেন্দ্র এটিই। যোগাযোগে কোচবিহার জেলা তথা উত্তরপূর্বের মুখ্য প্রবেশদ্বার, কিন্তু দূর্ভাগ্য নিজের জেলা শহরের সঙ্গেই যোগাযোগের পথ পুরনো কাঠের সেতুর মতই নড়বড়ে, তুমুল বর্ষায় বন্ধ হয়ে যায় সে পথ। তবু দ্রুত পালটে যাচ্ছে আজও পঞ্চায়েতের আওতায় থাকা ডুয়ার্সের এই শহরের মুখ ও চেহারা। জাতীয় সড়কের পুনর্নির্মাণ প্রকল্পে ফোর লেন যাচ্ছে ফালাকাটার বুকের উপর দিয়ে। বহুদিনের পুরনো দোকানপাট বাড়ি ভেঙ্গেচুরে ইয়া চওড়া হচ্ছে রাস্তা। স্থানীয় মানুষদের গলায় শোনা যাচ্ছে ভীষণ আশাবাদী সুর, ভৌগোলিক অবস্থানের সদব্যবহার হতে চলেছে এতদিনে, যার পুরো ফায়দা তুলতে চায় দীর্ঘ অবহেলিত ফালাকাটা শহরের আমজনতা। যে গতিতে কাজ চলছে তাতে এক বছরের মধ্যেই যোগাযোগ ব্যবস্থায় রীতিমত বিপ্লব ঘটতে চলেছে, কলকাতা বা গৌহাটি আর দূরে নয়, কেবল সময়ের আপেক্ষা। আলিপুরদুয়ার জেলার পঞ্চম জন্মদিনে ফালাকাটা নিয়ে 'এখন ডুয়ার্স'-এর প্রতিবেদন।

২০১৪ সালের ২৫ জুন সাবেক জলপাইগুড়ি জেলা ভাগ হয়ে আলিপুরদুয়ার জেলা তৈরি হয় এবং ফালাকাটাকে আলিপুরদুয়ার জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নতুন জেলায় কেটে গেছে চার বছর। পাঁচ বছরের মাথায় এসে মনে হতেই পারে কেমন আছে ফালাকাটা?

এই কয়েক বছরে ফালাকাটা যেটুকু পেয়েছে তা না বললে অন্যায় হবে।

নতুন জেলায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর ফালাকাটার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি বোধহয় সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল। যদিও চিকিৎসকের অভাব এখনও একইরকম। আজও জটিল কোনও রোগের ক্ষেত্রে ভরসা শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি বা নিদেনপক্ষে কোচবিহার।

একটি কৃষিমান্ডি দীর্ঘদিনের চাওয়া ছিল ফালাকাটার। কৃষিসংক্রান্ত সামান্য খবর যারা রাখেন তারা কমবেশি সকলেই জানেন যে ফালাকাটা ও তার পার্শবর্তী অঞ্চল ফলনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উর্বরা। ফলনও হয় প্রচুর। সেদিক থেকে কৃষিমান্ডি নিঃসন্দেহে বড় পাওনা।

শৌলমারির কাছে বড়ডোবা অঞ্চলে নির্মীয়মাণ ব্রীজটি ফুলবাড়ির সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে নতুন দিক আনবে বলাই বাহুল্য।

আদিবাসী মহিলাদের জন্য তৈরী আবাস, শিশু সদনের সংস্কার, ঐতিহ্যবাহী দশমী ঘাটের সংস্কার ইত্যাদিও প্রশংসার।

জেলা বইমেলা আয়োজন, রাজ্য ভাওয়াইয়া সঙ্গীত প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি প্রমাণ করছে যে ফালাকাটার সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডও পিছিয়ে নেই।

কিন্তু যেসব আজও জোটে নি বলে আক্ষেপ মানুষের তার তালিকাটি একটু বড়ই। আজকের ফালাকাটার মানুষ যে কাউকে জিজ্ঞেস করলে পরপর তালিকা ফেলে দেবে আপনার সামনে। তাঁরাই বলেন, প্রত্যেকটি দাবিই এত পুরনো যে আজ তা প্রায় মুখস্থ হয়ে গিয়েছে।

ডুয়ার্সের সাথেও যোগাযোগের ক্ষেত্রেও ফালাকাটা অপরিহার্য। ফালাকাটার কাছেই আছে দক্ষিণ খয়েরবাড়ি ও কুঞ্জনগরের মতো ইকো-পার্ক ও রেসকু সেন্টার। জলদাপাড়ার দূরত্ব সামান্য। শালকুমার হাট দিয়ে পূর্ব জলদাপাড়া কাছে। আছে পলিটেকনিক কলেজ। এতো গাড়ির যাতায়াত ফালাকাটার ওপর দিয়ে কিন্তু কি এক অদ্ভুত কারণে কোনও বাসস্ট্যান্ড নেই। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের স্ট্যান্ডটি আকারে বড়ই ছোট, বলা যায় নাম কি ওয়াস্তে। আর বেসরকারি বাস দাঁড়াবার জায়গা আজও সেই রাস্তায়। ট্যাক্সি স্ট্যান্ড ও মাল বইবার ছোট গাড়ির দাঁড়াবার ব্যবস্থা ফালাকাটা বেসিক স্কুলের সামনে হওয়ায় জ্যামজট এখানেও।

পৌরসভা নিয়ে দীর্ঘ গড়িমসির কি শেষ হবে?

যেমন প্রথমেই বলতে হয় এত প্রাচীন একটি জনপদ এখনও পৌরসভার মর্যাদা পেল না। অথচ লোকসংখ্যা, পরিকাঠামোর দিক থেকে এই মর্যাদা পাওয়ার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে ফালাকাটার নাম আসবার কথা। কিন্তু শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতিই সার হয়েছে। ফালাকাটাবাসী এবার কিন্তু সত্যিই আশা করছেন বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনটিই পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে শেষ নির্বাচন।

পানীয় জলের অসুবিধা প্রকট

এখনও ফালাকাটার ঘরে ঘরে পৌঁছায় নি পানীয় জল। এখানকার অধিবাসীদের অনেকসময় নির্ভর করতে হয় রাস্তার ধারে থাকা ট্যাপকলের জলের ওপর। গ্রীষ্মকালে জলকষ্ট প্রকট হয় ফি বছর। একটি মাত্র জলাধারের পক্ষে, তাও বহু বছর আগে তৈরী, আর সামাল দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না এত সংখ্যক মানুষকে জল সরবরাহ করতে গিয়ে।

বাস-ট্যাক্সি স্ট্যান্ড নেই, জ্যাম-জট-লোডশেডিং-এ বিপর্যস্ত শহর

কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারের বাস ফালাকাটা ছুঁয়ে চলে। রেলপথেও মেন লাইনে ফালাকাটা স্টেশন থাকবার ফলে কমবেশী প্রতিটি ট্রেন চলেছে ফালাকাটার ওপর দিয়ে। বীরপাড়া, মাথাভাঙা, মাদারীহাট, পলাশবাড়ি, জটেশ্বর সহ একটি বিরাট অংশের যাত্রী নির্ভর করে ফালাকাটার ওপর। ডুয়ার্সের সাথেও যোগাযোগের ক্ষেত্রেও ফালাকাটা অপরিহার্য। ফালাকাটার কাছেই আছে দক্ষিণ খয়েরবাড়ি ও কুঞ্জনগরের মতো ইকো-পার্ক ও রেসকু সেন্টার। জলদাপাড়ার দূরত্ব সামান্য। শালকুমার হাট দিয়ে পূর্ব জলদাপাড়া কাছে। আছে পলিটেকনিক কলেজ। এতো গাড়ির যাতায়াত ফালাকাটার ওপর দিয়ে কিন্তু কি এক অদ্ভুত কারণে কোনও বাসস্ট্যান্ড নেই। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের স্ট্যান্ডটি আকারে বড়ই ছোট, বলা যায় নাম কি ওয়াস্তে। আর বেসরকারি বাস দাঁড়াবার জায়গা আজও সেই রাস্তায়। ট্যাক্সি স্ট্যান্ড ও মাল বইবার ছোট গাড়ির দাঁড়াবার ব্যবস্থা ফালাকাটা বেসিক স্কুলের সামনে হওয়ায় জ্যামজট এখানেও। পাশেই ফালাকাটা হাই স্কুল, পেছনে ফালাকাটা গার্লস হাই স্কুল, সুভাষপল্লির ব্যাঙ্ক রোড। সব মিলে এখানকার ভিড়ে পথ চলাই দায়। নেতাজী রোডের সম্প্রসারণ না হওয়ায় ভিড় সে রাস্তাতেও। অথচ ফালাকাটার বেশির ভাগ দোকানপাট এই রাস্তাতেই। বিশেষ করে লোডশেডিঙের অন্ধকারে সে রাস্তা আরো ভয়াবহ হয়ে উঠছে, কেননা লোডশেডিঙের অভিশাপ আজও ফালাকাটাকে ছাড়ে নি। অনিয়ন্ত্রিত যানবাহন চলাচল সমস্যাকে দ্বিগুণ করেছে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে দুর্ঘটনার সংখ্যাও।

খেলাধুলোয় উৎসাহ দিতে হবে আরও

খেলাধূলার ক্ষেত্রে ফালাকাটা চিরকালই নাম করা। ফালাকাটা টাউন ক্লাবের মাঠ একটি লোভনীয় মাঠ। এই মাঠে একসময় ফুটবল টুর্নামেন্টে রয়াল ভুটান ফুটবল টিম থেকে শুরু করে অনেক নামীদামী দল খেলে গেছে। কিন্তু আজও ফালাকাটায় স্টেডিয়াম হয় নি। নেই খেলোয়াড়দের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের কোন ব্যবস্থা।

সাংস্কৃতিক বিকাশে সহায়তা কই?

একটি কমিউনিটি হল ও একটি ড্রামাটিক হল (যাতে সিনেমাও দেখানো হয়) ফালাকাটার সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে যথেষ্ট নয়। এই শহর রেণেসাঁ-রাণার-যুবশিল্পী-বিদ্রোহী নাট্য সংস্থার মতো এককালে নাট্যমঞ্চ দাপিয়ে বেড়ানোর শহর। এই শহর মুক্তমঞ্চ আন্দোলনের শহর। আজও বহু নাট্যদল, সাংস্কৃতিক কর্মে জড়িত শহরের নানা সংস্থা। তাদের সৃজনশীলতা বিকাশের ক্ষেত্রে দরকার পর্যাপ্ত সহায়তা। সে অভাব প্রকট হয়ে উঠছে দিন কে দিন।

সঙ্কটে পরিবেশ অবহেলার পরিণাম

ফালাকাটাকে চারদিক থেকে বেষ্টন করে থাকা সাপটানা নদী আজ আবর্জনা ফেলবার নালায় পরিণত হয়েছে। ভাবতে কষ্ট হয় এই নদী একদা স্রোতস্বিনী ছিল আর অনেকে মনে করেন সাপটানা এখানকার ভূমিখন্ডকে ফালা ফালা করে কেটেছে বলেই নামটি এসেছে ফালাকাটা। অবস্থা আজ এতটাই বিপজ্জনক যে রীতিমত জনমত তৈরী করে "সাপটানা বাঁচাও" আন্দোলনে নামতে হচ্ছে। প্রশ্ন জাগে কেমন আছে ফালাকাটার আর এক নদী মুজনাই? গতিপথ পরিবর্তিত হলেও মুজনাই এখনও ফালাকাটার পাশ দিয়েই প্রবাহমান।

কিন্তু নাব্যতা হ্রাসের কারণে মাঝেমাঝেই দুকূল ছাপাচ্ছে সে। বিপদ বাড়ছে সাধারণ মানুষের।

অবহেলিত ইকো পর্যটন

ইকো পর্যটন প্রসঙ্গেই বলি খুব তাড়াতাড়ি নজর দেওয়া প্রয়োজন দক্ষিণ খয়েরবাড়ি ও কুঞ্জনগরের দিকে। পর্যটকের ঢল নামতো একসময় এই দুটি জায়গায়। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের গাফিলতিতে এবং পর্যটকদের বিরুদ্ধ মতামতে দ্রুত আকর্ষণ হারাচ্ছে এই পর্যটন কেন্দ্র দুটি। কিছুদিন আগে কুঞ্জনগর রেসকু সেন্টার থেকে বন্যপ্রাণীদের সরিয়ে দেওয়ায় অবস্থা আরও সঙ্গীন হবে একথা অনস্বীকার্য। মার খাচ্ছে এই দুটি জায়গাকে কেন্দ্র করে ফালাকাটা ব্লকের অর্থনীতি।

মহকুমা আদৌ কবে?

১৮৬৯ সালের পয়লা জানুয়ারি জলপাইগুড়ি জেলা স্থাপিত হলে মুজনাই নদীর তীরের মহকুমা হয়েছিল ফালাকাটা। কিন্তু ১৮৭৪ সালে ব্রিটিশরা নিজেদের স্বার্থেই মহকুমা স্থানান্তর করে বক্সায়। মহকুমার মর্যাদা হারালেও গুরুত্ব কমে নি ফালাকাটার। বিংশ শতকের ষাটের দশকে শৌলমারী আশ্রমের জন্য ফালাকাটার সর্বভারতীয় পরিচিতির কথা এই যুগের অনেকে স্মরণে না রাখলেও ফালাকাটা আজও ডুয়ার্স তথা উত্তরবঙ্গে একটি অত্যন্ত পরিচিত নাম।

শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-খেলাধূলা জগতে ফালাকাটার অবদান অনস্বীকার্য সবসময়েই ব্রিটিশ শাসনে মহকুমার মর্যাদা পাওয়া ফালাকাটা আজও কেন নতুন জেলায় মহকুমার তকমা পাবে না সে প্রশ্ন কিন্তু প্রত্যেকের। কিন্তু চার বছরেও এই বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হল না। উপরন্তু অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের অফিসটি জয়গাঁতে তৈরি হওয়ায় একটি আশঙ্কা জাগছে সকলের মনেই।

গত ষাটের দশকে শৌলমারি আশ্রমের জন্য ফালাকাটার সর্বভারতীয় পরিচিতির কথা এই যুগের অনেকে স্মরণে না রাখলেও ফালাকাটা আজও ডুয়ার্স তথা উত্তরবঙ্গে একটি অত্যন্ত পরিচিত নাম।

শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-খেলাধূলা জগতে ফালাকাটার অবদান অনস্বীকার্য সবসময়েই যোগাযোগের ক্ষেত্রে ফালাকাটা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে উত্তরবঙ্গ তথা উত্তরপূর্ব ভারতের অন্যতম জংশন বলা চলে

ফালাকাটাকে ফালাকাটা থানার বয়সও অনেক। আলিপুরদুয়ার থানার চাইতেও বয়সে প্রাচীন। ফালাকাটা টাউন লাইব্রেরী, ড্রামাটিক হল সবই প্রতিষ্ঠিত স্বাধীনতার আগে। সর্বোপরি একসময়ের মহকুমা। তাই ফালাকাটার মান্য আশা করতেই পারে, খোদ মুখ্যমন্ত্রী একবার নজর দিন এদিকে। মানুষের এসব পুরনো চাহিদার আক্ষেপ মিটে যাক দ্রুত।

বছর তিরিশ আগে যখন ফালাকাটা কলেজ স্থাপনের জন্য চেষ্টা ও অনুদান গ্রহণ চলছিল তখন একবাক্যে এগিয়ে এসেছিল এখানকার সর্বস্তরের মান্য সর্বপ্রথম। যে ব্যক্তি প্রথম অনুদান দিয়েছিলেন তিনি ছিলেন "পন্ডিত" নামের একজন সামান্য রিক্সাচালক। নিজেদের সুখদুঃখে ফালাকাটার সবাই সবসময় এক থেকেছেন। তাঁরা মানেন, অ্যালিসের জাদুকাঠির মত সব কিছুর সমস্যা মুহূর্তেই হবে এরকম ভাবার কোনও কারণ নেই। কিন্তু তাঁদের এও বিশ্বাস, মনন, বোধ, রুচি ও প্রচেষ্টা এক থাকলে না পাওয়ার কষ্টে ভুগতে থাকার অসম্ভবকেও সম্ভব করবে একদিন ফালাকাটা।

শৌভিক রায়

কৃষিই ফালাকাটাকে জেলার অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র করে তুলেছে

আপাতভাবে নিতান্তই ছোট জায়গা। এখন তো তবু বেশ কিছু দোকানপাট, কিছু কয়েকটি নামী কোম্পানির শো-রুম ইত্যাদি দেখা যায় কিন্তু একটা সময় দোকানপাটের সংখ্যাও ছিল নগণ্য। কোম্পানির মানচিত্রেও ফালাকাটা বলে কিছু ছিল না। কোচবিহার রাজের অধীনে থাকলেও ভুটানকে উপহার দেওয়া হয়েছিল ফালাকাটা। মেলার মাঠ (বর্তমান টাউন ক্লাবের মাঠ) ও ভুটনীরঘাট (ভোট বা ভুটানী থেকে আগত) সেই ইতিহাসই বহন করছে। সে যাই হোক না কেন, ফালাকাটা নিঃসন্দেহে নবগঠিত আলিপুরদুয়ার জেলার অর্থনীতিতে অত্যন্ত শক্তিশালী একটি জায়গা দখল করেছে। এবং এই অর্থনীতির ভিত্তিটা অবশ্যই কৃষি। কৃষির যে বিকাশ ঘটেছে ফালাকাটা ব্লকে তার তুল্য আলিপুরদুয়ার জেলায় আর কোনও ব্লক আছে বলে মনে হয় না, উপযুক্ত পরিসংখ্যান এই দাবির সত্যতা প্রমাণ করতে পারে।

মনে রাখতে হবে আলিপুরদুয়ার জেলার বৃহত্তর এলাকায় অর্থনৈতিক ভিত্তির বেশিটাই নির্ভর করছে চায়ের ওপর, অথবা বলা যেতে পারে চা বাগানকে কেন্দ্র করে। কিছু এলাকা পাহাড় বা পাহাড়ের পাদদেশ হওয়ার জন্য সেখানকার মৃত্তিকা যে কোনও চাষের পক্ষেই প্রতিকূল। আর এখানেই ফালাকাটার কৃষিতে সাফল্য অনেকটা এগিয়ে। ফালাকাটাকে ঘিরে দুটি চা বাগান কাদম্বিনী ও কোচবিহার চা বাগান থাকলেও বীরপাড়া, কালচিনির মত ফালাকাটার অবস্থান চা বাগানের মাঝে নয়, আবার মাদারিহাট বা রাজাভাতখাওয়ার মত অরণ্য অধ্যুষিত নয়, কিংবা অন্যদিকে টোটোপাড়া, জয়গাঁর মত পাহাড় ঘেঁষাও নয়। ফালাকাটা ও তার আশেপাশের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া মুজনাই, বুড়িতোর্ষা, সাপটানা, দোলন, চরতোর্ষা ইত্যাদি নদীর কল্যাণে যে মাটি পাওয়া যায় তা চাষের ক্ষেত্রকে মজবুত করেছে। পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত, উপযুক্ত বাজার, চাহিদা সবকিছুই অনুকূলে থাকায় ফালাকাটার কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন চোখে পড়বার মতই। গুয়াবরনগর, কুঞ্জনগর, দেঁওগা, রাইচেঙ্গা, শৌলমারী, সিঙ্গীজানি, ভুটনীরঘাট, বাগানবাড়ি, ডালিমপুর ইত্যাদি এবং সেই সঙ্গে প্রতিবেশি শিলবাড়িহাট, শালকুমার, ফুলবাড়ি, শালবাড়ি, জটেশ্বর ইত্যাদি জায়গায় যে বিপুল পরিমাণ ফসল ফলে তা কিন্তু সারা জেলাকে যোগান দিয়েও উদবৃত্ত হয়ে চলে যাচ্ছে জেলার বাইরে। ভারতীয় রেলের মানচিত্রে থাকা ফালাকাটা স্টেশনটি কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে দিন কে দিন।

ধান উৎপাদনে দেঁওগা আজ একটি সুপরিচিত নাম। বিপুল পরিমাণ ধান উৎপন্ন হচ্ছে এখানে। ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন ইত্যাদির মত মরশুমি ফসলের ফলন ফালাকাটাকে ঘিরে উল্লিখিত স্থানগুলির প্রায় সর্বত্র দেখা যায়। সঙ্গে আলু, পটল, ঝিঙে, মূলো, স্কোয়াশ, কুমড়ো সবই রয়েছে। আলুর ফলন এত পরিমাণে হয় যে তৈরি হয়েছে হিমঘর। ফালাকাটা স্টেশনে দাঁড়িয়ে একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যাত্রীবাহী বা পণ্যবাহী ট্রেনে বস্তাবন্দী কাঁচা লঙ্কা পাড়ি দিচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। একই কথা বলা যায় কলা, পেঁপে, টমেটোর ক্ষেত্রেও।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বাজারে ঘুরলে অনেক সময়েই কানে আসে 'ফালাকাটার ফুলকপি' বা 'ফালাকাটার বেগুন' বলে দোকানির হাঁকডাক। অর্থাৎ এটাই প্রমাণিত যে শুধু ফলনের মাত্রাতে নয়, গুণগত মানেও ফালাকাটার সবজি বা ফসল আজ পরিচিত। আর একটি জিনিসের কথা না বললে নয়। সেটি হল সুপুরি। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি জেলার সিংহভাগ সুপুরির যোগানদার ফালাকাটা। এই তিন জেলার বাইরেও সুপুরি যাচ্ছে আরও বেশ কিছু জায়গায়। ভুট্টাও ফলছে বিশেষ করে ডালিমপুর থেকে জটেশ্বর অবধি। পাটের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। সবচেয়ে বড় কথা জমি এখানে এক ফসলি নয়। তাই সারা বছর কিছু না কিছু ফলিয়েই চলেছেন কৃষককুল।

ফালাকাটায় কৃষিমান্ডি তৈরি হওয়াটা কৃষিক্ষেত্রের বিকাশকেই সমর্থন করছে। কৃষির ওপর নির্ভরশীল গ্রামগুলিতে গেলেই টের পাওয়া যায় তাদের জীবননির্বাহ পুরোটাই কৃষিভিত্তিক। পড়াশোনার পাশাপাশি কৃষিকর্ম শেখাটা গ্রামীণ ফালাকাটায় জীবনের অঙ্গ হয়ে গেছে। স্নাতক বা স্নাতকোত্তর কৃষকের দেখাও মিলবে এইসব গ্রামে এবং অত্যন্ত গর্বের সাথে তারা কৃষিকাজে নিযুক্ত হচ্ছেন। চাকরির অনিশ্চয়তা বা অধীনতা, বাধ্যবাধকতাকে দূরে রেখে নব প্রজন্মের কৃষকেরা আনন্দের সাথেই কাজ করছেন। 'এটা ঠিকই, কৃষিকাজে পরিশ্রমের তুলনায় হয়ত বা পয়সা কম, অধিক ফলনেও সমস্যা হয়, সঠিক দাম পাওয়া যায় না, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল নষ্টের ভয়ও থাকছে কিন্তু তবু এই ভাল আছি। চাকরির চেষ্টা যে করছি না তা নয়, পেলে হয়ত করবও, কিন্তু না পেলে বেকার বসে লাভ কী! জমি আছে। বাবা-কাকাকে দেখে শিখেছি চাষের কাজ। এখন নিজে করছি। বাইক কিনেছি চাষ করেই। মালপত্র নিতে সুবিধে হয়। বাইক এখন অনেকেরই আছে যারা আমার মত চাষবাস করছে। ইচ্ছে আছে ট্রাক্টর কেনার। এভাবে চললে হয়ত সেটা কিনতে বেশিদিন লাগবে না', জানালেন ডালিমপুরের স্নাতক হওয়া তরুণ এক কৃষক। অনেকটা একই রকম কথা শোনা গেল দেঁওগা, কুঞ্জনগর থেকে নিয়ে প্রায় সর্বত্রই। তবে পরবর্তী প্রজন্মকে আরও এগিয়ে দেবার, অর্থনৈতিকভাবে শক্ত জায়গা দেওয়ার পক্ষপাতী সবাই। তাই তাদের প্রচেষ্টাই হচ্ছে নিজে শুধু নয়, অন্যকেও ভাল রাখা, এলাকার সমষ্টি উন্নয়ন আর সেই ভাল রাখার চেষ্টায় পরিশ্রম করতে পিছপা নন তারা।

সমস্যা যে নেই তা নয়। সমস্যা ছাড়া সবকিছু হবে এটা ভাবাটাও ঠিক না। ন্যায্য মূল্য না পাওয়া, আড়তদার, আড়কাঠি, অতিরিক্ত ফলন, অতিবৃষ্টি, বন্যা ইত্যাদি সবই আছে। ঋণগ্রস্তও হতে হয় অনেকসময়। কিন্তু তা সত্ত্বেও পিছপা হতে বা পিছনে তাকাতে রাজি নয় ফালাকাটার কৃষিজগৎ। বরং কৃষিকে ঘিরে যে আর্থসামাজিক কাঠামো এখানে গড়ে উঠেছে আগামীতে ফালাকাটা মহকুমা ঘোষিত হলে এই স্বপ্ন অনেকটাই সাকার হবে মনে করছে কৃষিকে কেন্দ্র করে বেঁচে থাকা গ্রামগুলি।

ফালাকাটায় কৃষিমান্ডি তৈরি হওয়াটা কৃষিক্ষেত্রের বিকাশকেই সমর্থন করছে। কৃষির ওপর নির্ভরশীল গ্রামগুলিতে গেলেই টের পাওয়া যায় তাদের জীবননির্বাহ পুরোটাই কৃষিভিত্তিক। পড়াশোনার পাশাপাশি কৃষিকর্ম শেখাটা গ্রামীণ ফালাকাটায় জীবনের অঙ্গ হয়ে গেছে। স্নাতক বা স্নাতকোত্তর কৃষকের দেখাও মিলবে এইসব গ্রামে এবং অত্যন্ত গর্বের সাথে তারা কৃষিকাজে নিযুক্ত হচ্ছেন। চাকরির অনিশ্চয়তা বা অধীনতা, বাধ্যবাধকতাকে দূরে রেখে নব প্রজন্মের কৃষকেরা আনন্দের সাথেই কাজ করছেন।

কৃষিভিত্তিক বাণিজ্যেও ফালাকাটা এগিয়ে চলেছে। রাজ্য তথা দেশের বাকি অংশের সঙ্গে বহুদিনের রেল যোগাযোগ, নতুন জেলায় অন্তর্ভুক্তি এবং সর্বশেষ সংযোজন ফোর লেনের দ্রুত অগ্রগতি ফালাকাটাকে বেশ কয়েক ধাপ আগে নিয়ে গিয়েছে কোনও সন্দেহ নেই। সরকারের প্রশাসনিক মর্যাদা না পেলেও শহরে দুটি বড় বড় হোটেল চোখে আঙুল দিয়েই বোধ হয় প্রমাণ করে ফালাকাটার বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি বা অগ্রগতি, তাও বলতে হবে ফালাকাটার পর্যটন নিয়ে এখনও কিছুই হয় নি, যার সবটাই প্রভুত সম্ভাবনা যুক্ত। চা শিল্পের আকাল নতুন জেলার কোমর শক্ত করতে পারে নি, তার সমাধানের পথও দূর অস্ত বলেই মনে করে অভিজ্ঞ মহল। পযটন শিল্পের উন্নয়ন নিয়েও আজ পর্যন্ত কোনও রূপরেখার আভাস পায়নি জেলার মানুষ। ফলে অসীম সম্ভাবনা নিয়েও আধমরা হয়ে পড়ে আছে কালচিনির মত প্রাকৃতিক সম্পদে বিত্তবান ব্লক। আর স্বাভাবিকভাবেই এসময় কৃষি নির্ভরতায় সফল ফালাকাটাকেই জেলার মূল উৎপাদন বা বাণিজ্য কেন্দ্র ধরে নেওয়া ছাড়া গতি নেই। অতএব, আলিপুরদুয়ার জেলার উন্নয়নে ফালাকাটার গুরুত্ব সরকার বাহাদুর যত তাড়াতাড়ি বুঝতে পারবেন ততই তা জেলার পক্ষে মঙ্গল।

স্বরূপ গুপ্ত

মুজনাই নদী

বিশেষ প্রতিবেদন

রথের বাঁশি

দড়িতে টান পড়ল। ছোট্ট রথটি গড়গড়িয়ে চলেছে। দড়ি ধরে দুটি ছোট্ট পা টানছে, টানছে আর টানতে টানতে পেরিয়ে যাচ্ছে ভৌগোলিক রেখা যেখানে যা কিছু। ছোট অবয়বটির দারুণ মজা আজ। আজ না কি রথযাত্রা। সকাল থেকে মায়ের মুখে শোনা কথাগুলো বারবার ভেসে উঠছে তার ছোট্ট মানসপটে। দুপুর গড়িয়ে গেলেই রথের মেলায় যাবে তারা। রথটানা দেখবে রথখোলার বিরাট মাঠে দাঁড়িয়ে। জিলিপি খাবে গরমাগরম। মা বলে, রথের মেলা মানেই জিলিপি, পাঁপড়ভাজা আর লটকা। তারপর কেনা হবে বেলুন, গাড়ি আর বাঁশি। বেলুন ওড়াতে ওড়াতে বাঁশির ফুঁয়ে মা-বাবার কান চারটি ঝালাপালা করতে করতে রিক্সা চেপে বাড়ি ফিরবে তারা। মায়ের যত অদ্ভুত ব্যাপার। বাড়ি ফিরে ডালের বড়া ভাজতে ভাজতে অথবা ফজলি আম কাটতে কাটতে দুই চোখ দিয়ে জল গড়ায়। কী জানি বাপু কেন! সে অত বোঝে না।

এরকম ছবি আজকাল চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এখন আর ছোট্টটি নেই। স্কুলের শেষ ক্লাসে পৌঁছে সে জেনে গিয়েছে রথযাত্রার বিষয়বস্তু। ভিড় ভালো লাগে না বলে এদিন বেরোয় না সে। তবে আজও রথযাত্রার বিকেলে ডালের বড়া, ফজলি আমের টুকরো আর রসগোল্লা সাজানো ট্রে নিয়ে যখন ড্রইংরুমের সেন্টার টেবিলের ওপর রাখে মা, তখন সে আড়চোখে দেখে নেয় আজও, হ্যাঁ এখনও মায়ের চোখদুটো চিকচিক করে, কোনাদুটো ময়শ্চারাইজড। তখনি ঠিক গুন্ডিচায় পৌঁছে যান জগন্নাথ দেব , বলভদ্র আর সুভদ্রাকে নিয়ে। সারাদিন খোলা থাকে একটিই চ্যানেল, ওখানে পুরীর রথযাত্রা দেখায়। গুন্ডিচায় পৌঁছে গেলে মা খুব খুশি হয়। অনার্যদের রানি গুন্ডিচা। লোককথায় আছে, তিনি রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের মহীষী, জগন্নাথ রূপকল্পের মুখ্য ধাত্রী। বছরে মাত্র সাত দিনের জন্য এখানে বিশ্রাম নিতে আসেন জগতের পতি জগন্নাথ। এই নারী 'আর্য-বৈষ্ণব দুনিয়ার জগন্নাথের' কাছে যান না, জগন্নাথকে আসতে হয় তাঁর কাছে রথে চড়ে, যাবতীয় ঐশী অহংকার কে 'বড়দান্ড'-এর ধুলোয় জমা রেখে।

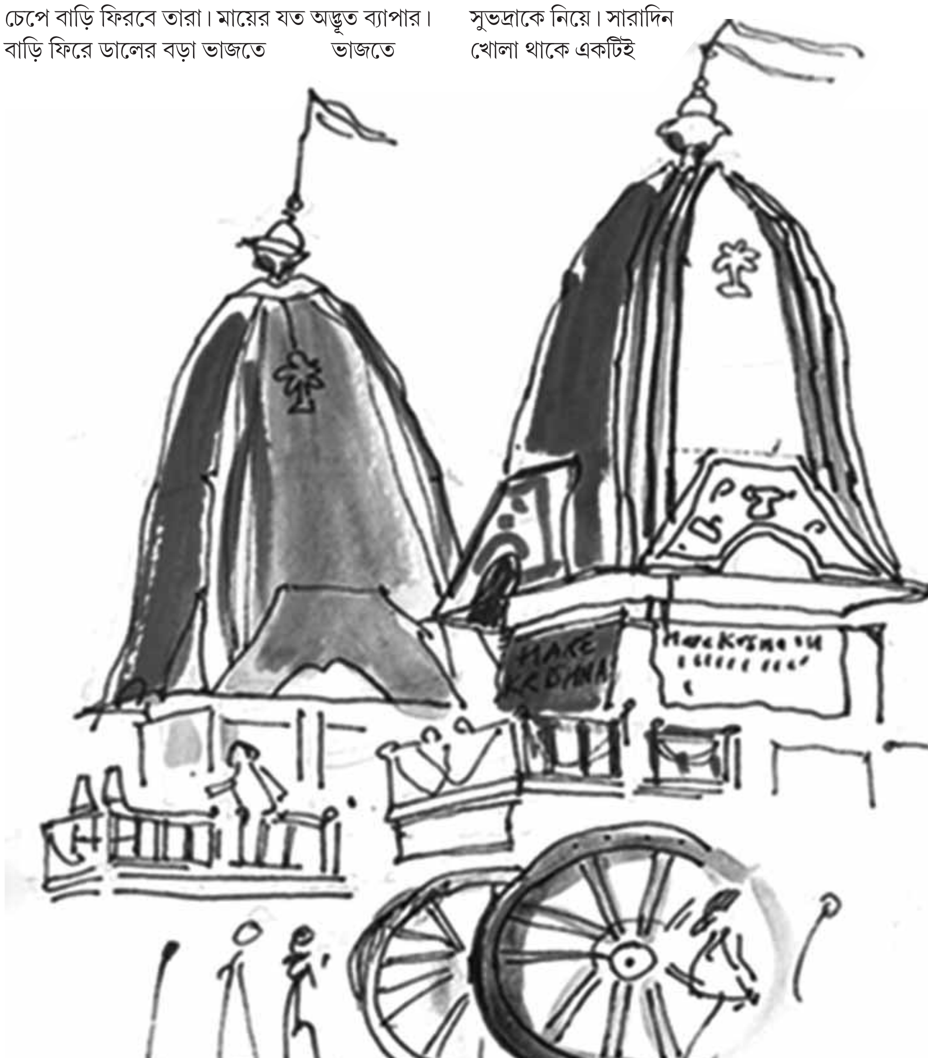

বাইরে থেকে দুশো পনেরো ফিট উঁচু বিস্ময়কর মন্দিরটিকে দেখেছি মায়ের দৌলতে বেশ কয়েকবার। এমনিতে তো সবাই ঘুরতে যায়, আমার উপরি পাওনা মায়ের সূত্র ধরে। তিনি ওড়িশার। আসলে প্রবাসী বাঙালি। মা বলে ওড়িশার প্রতি জনপদেই না কি একটি করে 'বড়দান্ড' আছে। সেখানে একধারে থাকে রথ। সারাবছর ঝড় জল সয়ে দিব্যি দাঁড়িয়ে থেকে, রথযাত্রার মাসখানেক আগে থেকে চলে তাকে সারিয়ে তোলার প্রক্রিয়া। তারপর রঙ টঙ লাগিয়ে নতুন হয়ে ওঠে। এরপর কাপড় দিয়ে সাজানো চলে। আর বিশেষ দিনটির আগে তার চুড়োয় স্থাপিত হয় ঝকঝকে কলস। তারওপরে চক্র। মায়ের আসলে মনে পড়ে যায় তার পরিবেলার কথা। মায়ের কথায় পরির দেশের মতই ছিল সেসব দিন। রথের দিন সকাল থেকে দলে দলে নারী-পুরুষ ছেলেমেয়ে নিয়ে রঙীন জামাকাপড়ে সেজে পৌঁছে যেত বড়দান্ডে। সেখানে আগের রাত থেকে বসে গেছে দোকানপাট। মোদকের দোকানে ভিয়েন বসেছে। খাজা গজা রসগোল্লা ছেনাপোড়া-র গন্ধে ম-ম করছে দশদিক। মায়ের বাবা ডাক্তার। তাঁর ছিল বদলির চাকরি। মায়ের কথায় মোটামুটি সব জায়গায়ই মেলার চরিত্র এক, সামান্য উনিশ-বিশ। একটি বড় রথেই তিন দেব-দেবী অবস্থান করেন। পুরী বা ভুবনেশ্বরের কথা আলাদা। রথের মেলার মজাই আলাদা। কী যে পাওয়া যায় না সে মেলায়!

একদিন ময়শ্চারাইজড চোখের পেছনের রহস্য জেনে ফেলি। জেনে ফেলি প্রতি রথযাত্রার বিকেলে একই মেনুর পশ্চাৎপট। ওইসব বিকেলে আমার মা তাঁর বাবাকে খুব মিস করেন। রথযাত্রার মেলা মানেই বাবা কিনত ফজলি আম, আনারস, রসগোল্লা। যতই ভাল খেতে হোক না কেন , সেদিন ছেনাপোড়া একদম নয়। আসলে রথযাত্রার পর নিলাদ্রী বিজয়ে জগন্নাথ ও লক্ষ্মীদেবীকে রসগোল্লা ভোগ দেওয়া হয়। তাই সেদিন রসগোল্লা মাস্ট। আর ডাল-নারকেল বড়া দিদুন বানাত , মা সেই ট্র্যাডিশন বজায় রেখেছে। নারকেলটি জগন্নাথদেবকে নিবেদন করে দেবতার সামনে ভাঙতে

হত, তারপর সেই প্রসাদ বাড়িতে আনা হত। সেই নারকেল আর ডালবাটা দিয়ে জিভে জল আনা বড়া তৈরি করতে দিদুন।

মা এখানে এসে প্রথমবার রথের মেলায় গিয়ে হতাশ হয়েছিল। কী যেন নেই, কী যেন নেই ভাবনা নিয়ে প্রথম দেখে লটকা। দেখতে পায় না ক্ষীরমোহন, যে রসগোল্লার ভেতর একটি ক্ষীরের গোল্লাও থাকে। খুঁজে পায় না তার ডানা মেলার দিনগুলি। আসলে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হলে একটা গাছের যা হয় প্রথম প্রথম, তাই হয় সব মায়েদের, সব মেয়েদের। স্বয়ং অনার্য দেবতাও তো ছাড় পান নি। অন্ত্যজমানুষদের দেবতা কে 'জগন্নাথ' হতে হয়েছে আদ্যন্ত আর্যদেবতা বিষ্ণুর রূপকল্প হিসেবে। মায়েদেরও তো মেয়েবেলা ছেড়ে আসতে হয় অন্য এক রূপকল্প নিয়ে। আষাঢ়ের ধারা-জলের সঙ্গে মিশে যায় তাদের রথের মেলা মিস করার, বাবাকে মিস করার অশ্রুজল। ময়শ্চারাইজড চোখ টিভির পর্দা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে কিচেনে চলে যায়, ফেলে আসা দিন মিশিয়ে নতুন আয়োজন করতে প্রতিবার। ওটিই তার রথের রশি।

২

চল্লিশ কেজি পাট দিয়ে তৈরি হয় রথের দড়ি!

আসলে দড়ি বা রশি ধরেই তো বেরিয়ে পড়া, পথের খোঁজে আর রথের খোঁজে।

বহুদিন কেটে গিয়েছে, এখন উত্তরের জনপদই আমার মায়ের ঘরবাড়ি। আর আমি এখন প্রবাসী। এই রথের উচ্চতা বাইশ ফুট। ছয়টি চাকা। সামনের ঘোড়াদুটি রূপোর। তবে এই রথের আরোহী মদনমোহন। জগন্নাথ এবং তাঁর ভাই বোন নয়। সুতরাং এ রথযাত্রা

আসলে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হলে একটা গাছের যা হয় প্রথম প্রথম, তাই হয় সব মায়েদের, সব মেয়েদের। স্বয়ং অনার্য দেবতাও তো ছাড় পান নি। অন্ত্যজমানুষদের দেবতা কে 'জগন্নাথ' হতে হয়েছে আদ্যন্ত আর্যদেবতা বিষ্ণুর রূপকল্প হিসেবে। মায়েদেরও তো মেয়েবেলা ছেড়ে আসতে হয় অন্য এক রূপকল্প নিয়ে। আষাঢ়ের ধারা-জলের সঙ্গে মিশে যায় তাদের রথের মেলা মিস করার, বাবাকে মিস করার অশ্রুজল। ময়শ্চারাইজড চোখ টিভির পর্দা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে কিচেনে চলে যায়, ফেলে আসা দিন মিশিয়ে নতুন আয়োজন করতে প্রতিবার। ওটিই তার রথের রশি।

কোচবিহারের প্রাণের মদনমোহনজীর। সাত দিনের জন্য মদনমোহন যান গুঞ্জবাড়ি। সাতদিন পর ফিরে এলে তাঁকে বারান্দায় রেখে বিশেষ ভোগ নিবেদন করা হয়। এই যাত্রা উপলক্ষে গুঞ্জবাড়িতে সপ্তাহব্যাপী মেলা হয়। কোচবিহারের বিখ্যাত রথযাত্রা মদনমোহনের রথযাত্রা।

রায়গঞ্জের গোবিন্দপাড়া। ৬৫বছর ধরে চলে আসছে এখানকার রথযাত্রা। এই রথের আরোহী গোবিন্দ।

দক্ষিণ দিনাজপুরের সবচেয়ে পুরনো ও ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা বালুরঘাটের বনশিরি গ্রামে। সর্বেশ্বর লাহা প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথ দেবের মন্দির। সেখান থেকে রথ বেরোয। লোহার রথ।

শহর শিলিগুড়ির প্রসিদ্ধ রথযাত্রা রথখোলার রথযাত্রা। আমার ছোটবেলার রথযাত্রা। কী নেই সেই মেলায়! দিন বদলালেও কিছু মেলার চরিত্র বদল হয় না। এখনও সেই মেলায় লটকা পাওয়া যায়। এখনও আসে মাটির খেলনা। থাকে নাগরদোলা। রঙীন জিলিপি, রঙহীন জিলিপি , খাজা গজা।

সারা উত্তরবঙ্গ জুড়েই ছোট-বড় রথযাত্রা। জগতের নাথ তিনি, তাঁকে নিয়ে এই আয়োজন তাই দিকে দিকে। উত্তরের একটি জনপদ তুফানগঞ্জ। এখানে গিরিধারীলাল গোপীবল্লভ জিউএর রথযাত্রা বেশ পুরনো। এই রথে ৫টি চূড়া। রথটি শালকাঠে তৈরি।

মাথাভাঙা, একটি ক্ষুদ্র জনপদ। এখানকার রথের আরোহী অষ্টধাতুর সপ্তনারায়ণ। আর সবকিছুর সঙ্গে কিন্তু বেশ মিলে গেছে ইসকনের রথযাত্রা। যেমন শিলিগুড়িতে তেমন অন্যান্য জায়গায়ও এই রথের যাত্রা অন্য একটি মাত্রা তৈরি করে।

ইংরেজী অভিধানের juggernaut শব্দটি কোথাও যেন মিলে মিশে রয়ে গেছে জগন্নাথের সঙ্গে। এক অদ্ভুত শক্তি যা আ-সমুদ্র হিমাচলের সীমানা ছাড়িয়ে পৌঁছে গেছে বিশ্বের দরবারে। এক অমোঘ দড়ির টানে ছোট-বড় ভেদাভেদ ভুলে এগিয়ে চলেছে সকলে।

শ্যামলী সেনগুপ্ত

পাটির মতো ডুয়ার্সের দেশজ

বেত শিল্প পুনরুদ্ধারের কোনও উপায় নেই?

উত্তরপক্ষ

প্রশান্ত নাথ চৌধুরী

সড়ক পথে তিস্তা পেরিয়ে জলপাইগুড়ি শহরে ঢোকবার মুখে পাহাড়পুরে সারি দিয়ে চোখে পড়ে বেতের ফার্নিচারের দোকান, আজকের নয়, বহু বছরের পুরনো। একটু ভাল করে খেয়াল করলে দেখবেন দোকানগুলিতে আগেকার জৌলুস আর নেই। খোঁজ নিয়ে দেখবেন বিক্রিবাটার হাল খুব খারাপ, কোনও উপায় নেই তাই কোনওরকমে চলছে সেগুলি। একই ছবি চোখে পড়বে ডুয়ার্সের অন্যত্রও। অথচ বেতেরই জাতভাই পাটি শিল্পকে কেবল পুনরুদ্ধারই নয়, রীতিমত আন্তর্জাতিক মানে তোলা সম্ভবপর হয়েছে সরকারি সহায়তা ও উদ্যোগেই। ভাল জাতের পাকা বেতের ফার্নিচার সামান্য যত্নেই শতায়ু হতে পারে, নির্মানশৈলির উৎকর্ষতায় অনায়াসে তা পৌঁছে যেতে পারে বহুমূল্যের সামগ্রী তালিকায়। প্রকৃতপক্ষে তা যায়ও, কিন্তু এ নিয়ে কাউকে মাথা ঘামাতে দেখি না কেন সেটাই বোধগম হয় না! হপ্তা কয়েক এনিয়ে উত্তরের নানা প্রান্তে ঘুরে যে কারণগুলি খুঁজে বের করা গেল তা পরপর সাজিয়ে ফেলা যাক।

এক। উত্তরবঙ্গের বনে জঙ্গলে একসময় প্রচুর বেত উৎপন্ন হত। এই জংলি বেত অতীতে বনদপ্তর বিক্রি করে নাকি ভালই উপার্জন করত। বনজ সম্পদ সুরক্ষার অভাবে, ব্যাপক চুরির কারণে, বর্তমানে উত্তরবঙ্গে বেতের ভান্ডার প্রায় শূন্য। বেতের কচি ডগা দিয়ে তেতোশুকতো খাবার প্রচলন ছিল। বেতের ডগা এককালে হাটে বাজারে বিক্রি হত। কিন্তু বিগত পঞ্চাশ বছরে বেতের ডগা হাটে বাজারে নজরে পড়ে না। ধান-পাট খেতের মাঝে মাঝে বেতের চাষ চোখে পড়ে ঠিকই কিন্তু ছোট ছোট পাখি ঐ বেতের ঝোপে বাসা বানায় আর আশপাশের ক্ষেতে শস্য পাকলেই হানা দেয়। তাই বেত চাষ প্রতিবেশী কৃষকের 'না পসন্দ'।

উত্তরবঙ্গের বনে জঙ্গলে একসময় প্রচুর বেত উৎপন্ন হত। এই জংলি বেত অতীতে বনদপ্তর বিক্রি করে নাকি ভালই উপার্জন করত। বনজ সম্পদ সুরক্ষার অভাবে, ব্যাপক চুরির কারণে, বর্তমানে উত্তরবঙ্গে বেতের ভান্ডার প্রায় শূন্য। বেতের কচি ডগা দিয়ে তেতোশুকতো খাবার প্রচলন ছিল। বেতের ডগা এককালে হাটে বাজারে বিক্রি হত। কিন্তু বিগত পঞ্চাশ বছরে বেতের ডগা হাটে বাজারে নজরে পড়ে না।

দুই। বর্তমানে বেত আসাম থেকে শিলিগুড়ির ভক্তিনগরে আসে ট্রাকে বোঝাই হয়ে। আশপাশের কারিগর সবাই সেখান থেকে কাঁচামাল হিসেবে বেতের বান্ডিল ক্রয় করে থাকে। ১২-১৪ ফুট লম্বা ২০ টা বেত নিয়ে এক বান্ডিল হয়। চল্লিশ বছর আগে এক বান্ডিলের দাম ছিল ৭৫ টাকা, তার বর্তমান মূল্য ১০০০ টাকা। আগে একটা বেতের মোড়ার দাম ছিল ৬০ টাকা বর্তমান মূল্য ৫৫০-৬০০ টাকা। দু এক বান্ডিল বেত বাজারে কেনা যায় না, কমপক্ষে ২৫-৩০ বান্ডিল বেত কিনতে হয়। স্টক প্রচুর থেকে যায়। সুতরাং যথেষ্ট ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল না থাকলে, এই ব্যবসায়ে টিকে থাকা মুশকিল। অথচ ব্যাঙ্ক থেকে সহজে লোন পাওয়া যায় না। জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের উল্টোদিকের দোকানগুলিতে কথা বলতে এসব তথ্য মিলল দুই প্রবীণ কারিগর সুধীর দাস ও অমল দাসের কাছ থেকে। সেই সত্তরের দশকে পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে এসে পেট চালাবার তাগিদে ডিআইসি ট্রেনিং নিয়ে একাজ শুরু করেছিলেন তাঁরা, আজ বয়সের ভারে, প্রতিকূলতার বাজারে খুব একটা আশার কথা শোনা গেল না তাঁদের মুখে।

তিন। মেশিনে তৈরি ও ফিনিশিং দেওয়া সস্তার প্লাস্টিকের অসম প্রতিযোগিতায় বেতের আসবাব পরাজিত। প্রযুক্তির প্রয়োগ আজও একেবারেই হয়নি বেতের আসবাব তৈরির ক্ষেত্রে। মাপের জন্য ফিতা, দা, করাত, ব্লো ল্যাম্প, বেত বাঁকানোর ডাইস ছাড়া কোন যন্ত্রপাতির ব্যবহার নেই। এ ছাড়াও বেতের আসবাব কিছুদিন পরপর টুকটাক সারাই বা রং করতে হয়। বেত কম পোক্ত হলে চট করে ঘুনপোকা আক্রমন করে, যদিও এখন এই পোকার হাত থেকে বাঁচতে রাসায়নিক দিয়ে শোধনের ব্যবস্থা অতীব কার্যকরী। এক্ষেত্রে বেতের কোয়ালিটি ও পরিচর্যাই দীর্ঘ আয়ুর মূলকথা। একদা উত্তরবঙ্গের বিভাগীয় কমিশনার ছিলেন দেবব্রত চক্রবর্তী, উনি একটা মূল্যবান কথা বলতেন, 'কোয়ালিটি উৎপাদন করলে ক্রেতা উড়ে আসবে'।

চার। ডিজাইন ও কোয়ালিটি একটা বড় ফ্যাক্টর হলেও এখানে মূল সমস্যার জায়গা হল মার্কেটিং বা বিপণন। লাটাগুড়িতে তৈরি বেতের আসবাব পত্রের যথেষ্ট সুনাম ছিল। বেশ কিছু মানুষ এই জীবিকার সাথে যুক্ত থাকত। কিন্তু বিপননের কোনও মজবুত ব্যবস্থাই ছিল না। অন্যান্য হস্ত শিল্পের মত এখানেও ক্রেতা প্রচুর দরদাম করে, অনেক সময় মজুরির পয়সা তোলাই কঠিন হয়ে পড়ে। জনৈক ডিআইসি কর্তাব্যক্তি পাল সাহেব একবার বলেছিলেন 'যে ক্রেতা কলকাতার শপিং মলে প্রিন্টেড প্রাইসে জিনিস কেনে সেই ব্যক্তিই স্থানীয় শিল্পীর হাতের তৈরী শো পিস কিনতে আধ ঘন্টা বা তার বেশী সময় ধরে দরদাম করে'। শিল্পীদের এই সমস্যা পোহাতে হয় না যদি সরকারি দপ্তর নির্দিষ্ট দামে তাঁদের কাছ থেকে আগাম কিনে নেয় এবং নিজেদের বিপণি ও ডিস্ট্রিবিউশনের মাধ্যমে তা বাজারে বিক্রি করে। অন্ধ্র ওড়িশা ছত্তিশগড়ে দেখা যায় হস্তশিল্পীরা অনেক স্বচ্ছল পরিবেশে রয়েছেন। এ রাজ্যে শিল্প দপ্তর প্রতি বছর দুই থেকে চার সপ্তাহের মেলা পরিচালনা করে, সেখানে সারা বছর ধরে তৈরি আসবাব পত্র ট্রাক বোঝাই করে শিল্পীরা কলকাতায় নিয়ে যান। ট্রাক ভাড়া এবং একজন শিল্পীর খাওয়া খরচ সরকার বহন করে ঠিকই কিন্তু তাঁরাই বলেন, অন্তত লাখ তিনেক টাকার মাল বিক্রি না হলে বাইরে গিয়ে পোষায় না। দিল্লির প্রগতি ময়দানের মেলাতেও স্থানীয় শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেছেন, কিন্তু অনেক কারিগরের মতে, ট্যাঁকের জোর না থাকলে বাইরে মেলা করতে যাওয়া কাজের কথা নয়।

চিত্রটা এতটাই হতাশাজনক তবু প্রতি বছর কিছু শিল্পী বাইরে মেলায় যান। ৩-৪ লক্ষ টাকার যা বিক্রি হয় সেটাই সারা বছরের মূল রোজগার। বেতের চেয়ার টেবিল, সোফা, দোলনা, র্যা ক এমনকি খাটও পাওয়া যায়। মিলিটারিতে কর্মরত উত্তর ভারতের বাসিন্দাদের মধ্যে বেতের জিনিসপত্রের বেশ চাহিদা আছে। শিলিগুড়ি হিলকার্ট রোডের ব্যবসায়ী খোকন রায় আরও জানালেন, তাঁর কারখানায় ভালমানের বেতের তৈরি চারটি চেয়ার ও একটি টেবিলের মূল্য ১৬০০০ টাকা থেকে ২৪০০০ টাকা। জলপাইগুড়ির সুধীরবাবুর মতে কলকাতার দক্ষিনাপনে তারই দাম দাঁড়ায় চল্লিশ হাজার। আমার সামনেই মাটিগাড়ার এক নেপালি ভদ্রলোক তিনটি চেয়ার ১৩০০০ টাকায় কিনলেন। যদিও খোকনবাবু বললেন এই চেয়ারগুলি দেখতে শৌখিন কিন্তু মজবুত নয়।

লাটাগুড়ির প্রবেশ পথে তিস্তা ক্যানেলের পাশেই ৬-৭ ঘর বেত শিল্পীর বাস। পারিবারিক ঐতিহ্য মেনে অতীত কালের বেত শিল্পের গৌরবের কথা ভেবে এখনও পর্যন্ত এই শিল্পের সাথে তাঁরা যুক্ত আছেন ঠিকই তাঁদের নতুন প্রজন্ম এই শিল্পকে কোনওমতেই জীবিকা করতে রাজি নন। কারণ শৈশব থেকে তাঁরা দারিদ্রতাই দেখে আসছেন, তাই এখন বিকল্প রোজগারের সন্ধান করছেন। উত্তর মাটিয়ালির দক্ষ শিল্পী পরিমল রায়ও একইরকম হতাশ, সংসার চালানোর মত রোজগার বেতের কাজ করে আর কোনওদিন হবে না।

আরেক শিল্পী সুনীল বিশ্বাস শিলিগুড়িতে একটি বড় দোকানে বেতের মাল বানিয়ে পাঠান, তাঁর মতে, ‘বেত ন্যায্য মূল্যে পেলে আর বাজারটা ভাল থাকলে এখানেও ভাল রোজগার হতে পারে’। সত্যিই তো, আভিজাত্যের এবং হেরিটেজের ছোঁয়া লেগে আছে এই শিল্পের সঙ্গে। তবে কাঁচামাল, বিপনন ও ডিজাইন বিষয়ে সরকারি এবং অসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া এই শিল্পকে রক্ষা করা সত্যিই কঠিন। সরকারি উদ্যোগ থাকলে বহু মানুষের কর্মসংস্থানের এখানে সুযোগ আছে। বন দপ্তর বা কৃষিজ বিপণন বিভাগ উন্নত মানের বেত চাষের ব্যাপারে কিছুটা তৎপরতা গ্রহণ কি করতে পারে না? পাটি চাষের মত এখানেও চাই সৎ সরকারি উদ্যোগ, শিল্পীদের সক্রিয় অংশগ্রহন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সজাগ দৃষ্টি। তবেই পুনরুদ্ধার সম্ভব ডুয়ার্সের এই দেশজ শিল্পের।

পাঠকের কলম

জলপাইগুড়ি ফার্মেসি কলেজের ভবিষ্যত কি শপিংমল?

রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধীনে থাকা জলপাইগুড়ি ফার্মেসি কলেজ দেশের অন্যতম প্রাচীন ইনস্টিটিউট, ১৯৪৮-এ স্থাপিত। শুরুতে এটা ছিল ডিপ্লোমা কলেজ। বহু আন্দোলনের পর ২০০৩ সালে এই কলেজে ব্যাচেলর ডিগ্রি পড়ান শুরু হয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি আমরা লক্ষ্য করলাম যে এই কলেজে ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষে ছাত্রভর্তি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল অফ টেকনিক্যাল এডুকেশনের প্রতিনিধিরা কিছুদিন আগে জলপাইগুড়িতে এসেছিলেন কলেজ পরিদর্শনের জন্য। তাদের নির্দেশেই এটা হয়েছে। কারণ হিসেবে তারা একগুচ্ছ পরিকাঠামোগত ঘাটতির কথা বলেছেন।

বস্তুত, বি-ফার্মা চালু হওয়ার পর থেকেই একের পর এক ‘ঘাটতি’ আমাদের নজরে পড়ছিল। ২০০৫ থেকেই এই কলেজের জন্য কোনও স্থায়ী অধ্যক্ষ নজরে পড়ে নি। বলা যায় জোড়াতালি দেওয়া অধ্যক্ষ দিয়ে কাজ চালান হচ্ছিল— যিনি পদমর্যাদা কিংবা বেতনের বিচারে আদৌ অধ্যক্ষ হতে পারেন না। প্রশাসনিক কমিটি এবং অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল বলেও কিছু নেই বহুদিন ধরে। ছাত্র ইউনিয়নও গত তিন বছর ধরে অদৃশ্য। বর্তমানে ডিপ্লোমা কোর্সের একজন সিনিয়ার লেকচারার অধ্যক্ষের পদ স্বেচ্ছায় সামলাচ্ছেন, তবে গত সাত বছর হল তাঁর বেতন বা পদমর্যাদা বৃদ্ধির কোনো গল্পই নেই!

কলেজে স্থায়ী শিক্ষকের পদ ২৪ এবং অশিক্ষক পদ ১৬টি। এই মুহূর্তে সবগুলোই ফাঁকা। পার্ট টাইম শিক্ষক দিয়ে কাজ চালান হচ্ছিল। কিন্তু তাঁদের বেতনও নিয়মিত মিলছে না। যে সিনিয়ার লেকচারারের কথা বললাম, তিনিই একমাত্র স্থায়ী শিক্ষক। কিন্তু তিনি ডিপ্লোমা কোর্সের। বস্তুত, যে ১২ জন এড-হক লেকচারার ২০০৩ থেকে প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন এই কলেজের পঠনপাঠন চালু রাখতে, তাঁরাও এখন গভীর উদ্বেগের মধ্যে রয়েছেন। গুটিকয় চুক্তিভিত্তিক অশিক্ষক কর্মচারিদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

অন্যদিকে, লাইব্রেরিয়ান নেই প্রায় ১৫ বছর ধরে। এই ধরনের কলেজে লাইব্রেরিয়ানের দায়িত্ব সামাল দেওয়া কোনো শিক্ষকের পক্ষে খুবই কঠিন কাজ। বাস্তবে সেটাই করতে হচ্ছে। ল্যাবরেটরিও অনাধুনিক। কিন্তু সেখানে কম্পিউটর এবং জরুরি সফটওয়ার নেই।

বি-ফার্মা চালু হওয়ার কারণে চারতলা কলেজ বিল্ডিং তৈরির পরিকল্পনা ঘটা করে পাস করা হয়েছিল। ২০০৩ থেকে অদ্যাবধি ১৫ বছরে দুটিমাত্র তল নির্মিত হয়েছে।

অবস্থা দেখে আমাদের মনে হতেই পারে যে জলপাইগুড়ি ফার্মেসি কলেজ নিয়ে সরকারের আদৌ মাথাব্যাথা নেই। এখন নতুন শিক্ষাবর্ষে ছাত্রভর্তি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আগামিতে কলেজ বন্ধ হয়ে যাবে হয় তো। যে সমস্যাগুলির কথা বলা হল, তার বাইরেও বহু সমস্যা আছে। যেমন হোস্টেল, সিসিটিভির অভাব, ক্যাম্পাসের নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি ইত্যাদি। কোনও সমস্যার সমাধানেই সরকারের বিশেষ হেলদোল দেখা যাচ্ছে না।

তা হলে এই ফার্মেসি কলেজের ভবিষ্যৎ কী? শপিং মল অথবা বিয়েবাড়িকে ভাড়া দেওয়া?

পিনাকী সেনগুপ্ত
জলপাইগুড়ি

পাঠকের কলমে উত্তরের নানা সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে এবং ‘এখন ডুয়ার্স’ পত্রিকায় প্রকাশিত রচনা নিয়ে পাঠক তাঁর নিজস্ব মতামত বা ভাবনা খোলাখুলি লিখতে পারেন। প্রয়োজনে পাঠকের পরিচয় গোপন রাখা হবে। তবে প্রকাশিত মতের দায় পাঠকের, পত্রিকার সম্পাদক বা প্রকাশকের নয়। লেখা পাঠান মেইল করে editor.ekhonduars@yahoo.com

ডুয়ার্সের চা বাগান চিনুন

আজকের সফর শুরু করলাম চালসা থেকে। চালসা থেকে মেটেলির দূরত্ব মাত্র ৭ কিমি। শেয়ার জিপেই যাওয়া যায়। জিপে বেশিরভাগই স্কুলযাত্রী এবং অফিসকর্মী। ঘড়িতে সময় সকাল সাড়ে নটা। দোকানপাট, হাট-বাজার, স্কুল, অফিস, বাড়িঘর নিয়ে পূর্ব ডুয়ার্সের একটি ছোট্ট জনপদ মেটেলি। চালসা মোড় থেকে কিছুটা এসেই রেললাইন। আগের মিটারগেজ সরিয়ে ব্রডগেজ লাইন পাতা হয়েছে। আর ঠিক তারপরেই দু তিনটে সর্পিল বাঁক ঘুরে পাহাড়ি পথের শুরু। এক লাফেই যেন অনেকটা উঁচুতে উঠে গেলাম। নিচে একান্তে পড়ে রইল ডুয়ার্সের সমতল আর চালসা শহরতলী। পাহাড়ের আঁকাবাঁকা মসৃণ পথ বেয়ে উত্তরে চলেছি। দুইপাশে আদিগন্ত চা-বাগানের সবুজ ঢেউ। বাঁদিকে চড়াইয়ের কিনারা ঘেঁষে সিনক্লেয়ার্স গ্রুপের রিসর্ট। অবকাশ যাপনের এক মহার্ঘ্য আবাস। এখানে বসে দুচোখ ভরে দেখে নেওয়া যায় ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ উপত্যকা, চা বাগিচা, দূরের নীল পাহাড় এবং আকাশ ভরা মেঘপুঞ্জ। চালসা এবং মেটেলি চা বাগান অধ্যুষিত অঞ্চল। সোনগাছি, আইভিল, ইনডং, এঙ্গো, জুরান্তী বাগান ঘুরে দেখার পরিকল্পনা। পুরনো মেটেলির ছবিটা যেন চোখের সামনে ভাসছিল। চালসার সিনক্লেয়ার্সকে পিছনে রেখে এগিয়ে চলেছি। সামনে অনন্ত সবুজ প্রান্তর। মাঝখানে সবুজ শ্যামলিমা চিরে মসৃণ রাস্তা। মানকচু বাগিচার মাঝে মাঝে শিরীষ গাছের জঙ্গল। সবুজের সমারোহ। ডাইনে কিলকট, আইভিল, ইঙ্গো, চালসা ইত্যাদি ছায়াঘেরা চা বাগিচা পেরিয়ে মাটিয়ালি বা মেটেলি ব্যস্ত জনপদ।

আইভিল চা বাগান

কালিম্পং এর পাদদেশে এবং ভুটান রেঞ্জের সন্নিহিত অঞ্চলে মালবাজার মহকুমার অন্তর্গত চালসাতে অবস্থিত এই টি এস্টেট। নিকটবর্তী রেলস্টেশন নিউ মাল জংশন চা বাগানের ফ্যাক্টরি থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে। বাগানের চারটি ডিভিশন — নয়া কামান, গুনটি, সাতখায়া এবং ডাংগি। সাদরি ভাষায় নদী বা ঝোরার পার্শবর্তী উঁচু ডাঙ্গা বা মাটি কথাটি থেকে ডাংগি নামের এই ডিভিশনের সৃষ্টি হয়। সাতখায়া চা বাগিচার সঙ্গে ১৯৬৮ সালে আইভিল চা বাগানের সংযুক্তিকরন ঘটে। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে বেঞ্জামিন সিম্পসনকে আইভিল চা বাগিচার লীজ প্রদান করা হয়। ভুটানে অ্যাসলে ইডেনের অভিযানকালে বেঞ্জামিন সিমসন তাঁর মেডিকেল অফিসার ছিলেন। ভুটানের হাত থেকে ব্রিটিশরা যখন ভুটান পুনরুদ্ধার করলো তখন এই রিলিজ হস্তান্তর হয়। বেঞ্জামিন সিম্পসনের পুত্র পি এ সিম্পসন এই বাগানের সম্পত্তি রক্ষা করতে থাকেন এবং উনিশশো কুড়ি সাল পর্যন্ত বাগানের ম্যানেজার রূপে তাঁর দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালন করেন। প্রাথমিক পর্বে বাগানটি সোনাপানি নামে পরিচিত ছিল। কারন প্রাকৃতিকভাবে ঝর্ণা থেকে যে জলরাশি নির্গত হত তার ওপর সূর্যালোক পড়লে তা সোনালী বর্ণ ধারণ করে বাগানের ঝরনার জল সোনা রং ছড়াতো বলে এই বাগানের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া এই ধরনের ঝর্ণার নামকরণ থেকে বাগিচার নাম সোনাপানি হয়। সাদরি ভাষায় ডেঙ্গি শব্দের বাংলা অর্থ ডাঙ্গা অর্থাৎ জলের পার্শ্ববর্তী উচ্চতম স্থান। এই কারণে উচ্চতম স্থান অধ্যুষিত অঞ্চল ডেঙ্গি বা ডাঙ্গি ডিভিশন।

প্রাথমিক পর্বে আইভিল চা বাগান উইলিয়ামসন মেজর কোম্পানির অন্তর্ভুক্ত ছিল। উনিশশো কুড়ি সালে ফাগু চা বাগান যখন আইভিল চা বাগানের সঙ্গে মিশে গিয়ে আইভিল টি কোম্পানি নামে পরিচিত হলো তখন বিদেশে অর্থাৎ ব্রিটেনে আইভিল টি-এস্টেটের এজেন্সির দায়িত্ব পেল গুডরিক টি এস্টেট এন্ড কোম্পানি। শুধুমাত্র কলকাতার এজেন্সির দায়িত্ব রইল উইলিয়ামসন মেজর কোম্পানির হাতে। ব্রিটেনে পরবর্তীকালে গুডরিক এবং ডানকানস কোম্পানি দুটি মিশে গিয়ে ডানকান গুডরিক কোম্পানি গঠিত হয়। আইভিল টি কোম্পানির এজেন্সি তখন থেকে ডানকান ব্রাদার্সের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৭৭ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই মালিকানা বলবৎ থাকে। ১৯৭৮ এর ১লা জানুয়ারি থেকে কলকাতার গুডরিক লিমিটেডের হাতে চা বাগিচার পরিচালনগত দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়। আইভিল চা বাগানটি জলপাইগুড়ি জেলার মেটেলি তফসিলের অন্তর্গত। গ্রাম পঞ্চায়েত মাটিয়ালি বাতাবাড়ি ১। নিকটবর্তী শহর মালবাজার ১০ কিলোমিটার। বৈদ্যুতিক সুবিধাযুক্ত শ্রমিক আবাস, বাবুদের স্টাফ কোয়ার্টারস, ম্যানেজারস বাংলো সহ বাগানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অসাধারন। জলপাইগুড়ি জেলার আইভিল চা বাগানটির ডুয়ার্সের অন্যতম সেরা চা উৎপাদক বাগান হিসাবে সুনাম আছে।

মালবাজার সাব ডিভিশনের মেটেলি ব্লকের আইভিল চা বাগানটির পরিচালক গোষ্ঠী গুডরিক গ্রুপ লিমিটেড। বাগানটি ডি বি আই টি এ সংগঠনের সদস্য। বর্তমান কোম্পানি ১৮৯২ সালে বাগানটির দায়িত্বভার গ্রহণ করে। আইভিল চা বাগানটির আয়তন এবং চাষযোগ্য আবাদীক্ষেত্র ১৫০৮. ১ হেক্টর। আপরুটেড এবং নতুন বপনযোগ্য আবাদীক্ষেত্র ৪৩ হেক্টর। রিপ্ল্যান্টেড এরিয়া ১৩ হেক্টর। ড্রেন এবং সেচের সুবিধাযুক্ত অঞ্চল ৮২৭.৮৪ হেক্টর। মোট চাষযোগ্য আবাদীক্ষেত্রও তাই। প্রতি হেক্টর জমি পিছু ২৩৪৯ কেজি করে চা ফ্যাক্টরিতে তৈরি হয়। মোট কর্মরত শ্রমিক ২১৪৬ জন। মোট বাৎসরিক উৎপাদিত চা ১৭-২০ লাখ কেজিরও বেশি। বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাগানে গুণগত মানের ইনঅরগ্যানিক সিটিসি চা উৎপাদিত হয়।

আইভিল চা বাগিচায় হাসপাতাল দুটি। ডিসপেনসারি আছে। বাগানে আছেন এম বি বি এস ডাক্তার। প্রশিক্ষিত নার্সের সংখ্যা ২ জন। মেল ওয়ার্ডের সংখ্যা ১৫ টি, ফিমেল ওয়ার্ডের সংখ্যা ১৬ টি। আইসোলেশন ওয়ার্ড ১০ টি, মেটারনিটি ওয়ার্ড ৪ টি। বাগিচার হাসপাতালে অপারেশন থিয়েটার আছে। অ্যাম্বুলেন্স আছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নিকটবর্তী চালসাতে। চিকিৎসা বাগানেই হয়। তবে দুরারোগ্য রোগের

জন্য গড়ে বছরে ১২০০ জন শ্রমিককে জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে অথবা মালবাজার মহকুমা হাসপাতালে রেফার করা হয়। বাগিচায় পর্যাপ্ত ওষুধ সরবরাহ হয়। ওষুধের তালিকা স্টক অনুযায়ী নোটিশ বোর্ডে দেওয়া হয়। উন্নত মানের পথ্য সরবরাহ করা হয়। নিয়মিত ডায়েট চার্ট অনুসরন করা হয়। বাগিচায় লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার আছেন ২ জন। ক্রেশের সংখ্যা স্থায়ী ১টি এবং মোবাইল ৪ টি। ক্রেশে পর্যাপ্ত জলের ব্যাবস্থা আছে। শৌচালয় আছে। দুধ, বিস্কুট বা পুষ্টিকর খাবার ক্রেশের শিশুদের দেওয়া হয়। শিশুদের পোশাক সরবরাহ করা হয় নিয়মিত। পর্যাপ্ত পানীয় জল ক্রেশে এবং চা বাগানে সরবরাহ করা হয়। ক্রেশে মোট অ্যাটেন্ডেন্ট ৪ জন। বাগিচা সংলগ্ন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও উচ্চ বিদ্যালয় আছে। শ্রমিক সন্তানদের বিদ্যালয়ে নেবার জন্য যানবাহনের ব্যাবস্থা হিসাবে একটা স্কুলবাস আছে। বাগানে বিনোদনমূলক ক্লাব আছে। খেলার মাঠ আছে। আইভিল টি গার্ডেনে বিগত অর্থবর্ষে ১ কোটি ৫০ লাখ টাকা প্রভিডেন্ড ফান্ড খাতে জমা পড়েছে। নিয়মিত পি এফ খাতে টাকা জমা দেয় গুডরিক কতৃপক্ষ। পি এফ বা গ্র্যাচুইটি বকেয়া থাকে না। শ্রমিকদের মজুরি, রেশন, জ্বালানি, কম্বল, ছাতা, ছপ্পল এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা চুক্তি অনুযায়ী দেওয়া হয়।

আইভিল বাগান থেকে বেড়িয়ে গাড়িতে যেতে যেতে নিজের মনেই মেটেলি জনপদের ইতিহাস নেড়েচেড়ে দেখার চেষ্টা করছিলাম স্মৃতিচারণার মাধ্যমে। পশ্চিম ডুয়ার্সের সবচেয়ে পুরনো জনপদগুলির মধ্যে মেটেলি অন্যতম। তাই মেটেলি বাজারকে কেন্দ্র করেই বিভিন্ন পেশার অন্তত তিন হাজার নরনারী জড়ো হয়েছিলেন বসতি গড়ার জন্য। যাবতীয় জমি ছিল সরকারি খাস মহলের। তাই ব্যক্তিগতভাবে কারো তা কিনে নেবার অধিকার ছিল না। কেবলমাত্র অস্থায়ী পাট্টার বিনিময়ে বাসিন্দারা ঘরবাড়ি তৈরি করতে পারত। পুরনো আমলের বার্মা সেলের যে পেট্রোল পাম্প ছিল সেখানেই ছিল লম্বা একখানা কাঠের একতলা বাড়ি। চালসা, বাতাবাড়ি প্রভৃতি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং বিভিন্ন চা-বাগানের বাসিন্দারা যারা ছিল তাদের সন্তানেরাই এই ছাত্রাবাসে থেকে পড়াশোনা করত। ১৯৫৩ সালে মেটেলি প্রগতি সংঘ, ১৯৫৭ সালে মেটেলি পাবলিক লাইব্রেরি এবং ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। চল্লিশের দশকের গোড়ায় মেটেলি কালিবাড়িতে কাজ চালানোর মত একটি মঞ্চ তৈরি হয়। লাগোয়া বাগানের কর্মচারীরা কাজের শেষে সন্ধ্যাবেলায় আসতেন নাটকের মহড়া দিতে। গোটা কয়েক হ্যারিকেনের আলোয় চমৎকার মহড়া চলত। নাটকের দিন হ্যাজাক এবং লাইট ভাড়া করে আনা হতো। নাট্যচর্চা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, এবং খেলাধুলা অনুষ্ঠিত হতো আন্তঃবাগান এবং বাজার অঞ্চলকে নিয়ে। ১৯৫৭ সালে মেটেলি ইয়ংমেন্স অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয় খেলাধুলার জন্য। তখনকার দিনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বলতে বোঝাত পরপর কয়েক রাত নাটক বা যাত্রা। একটু স্মৃতিমেদুর হয়ে পড়েছিলাম। চমক ভাঙল ড্রাইভারের ডাকে। তাকিয়ে দেখি ইনডং চা বাগিচার ফটকে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

ইনডং চা বাগান

ইনডং চা বাগানটির পরিচালক গোষ্ঠী ইনডং টি কোম্পানি লিমিটেড আই টি পি এ সংগঠনের সদস্য। বর্তমান কোম্পানি ১৯৭৫ সালে বাগানটির দায়িত্বভার গ্রহণ করে। বাগানে প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা ৩ টি। এগুলো হলো এন ইউ পি ডব্লিউ, পি টি ডব্লিউ ইউ এবং ডব্লিউ বি টি জি ই এ। চা বাগানটির আয়তন এবং চাষযোগ্য আবাদীক্ষেত্র ৭৪০.৩৮ হেক্টর, এক্সটেন্ডেড জমি নেই। আপরুটেড এবং নতুন বপনযোগ্য আবাদীক্ষেত্র ২৯.৫৫ হেক্টর। ড্রেন এবং সেচের সুবিধাযুক্ত অঞ্চল ২১৬.৬৮ হেক্টর। ড্রেন এবং সেচযুক্ত প্ল্যান্টেশন এরিয়া থেকে প্রতি হেক্টর জমি পিছু ১৩৫২ কেজি করে চা ফ্যাক্টরিতে তৈরি হয়। মোট কর্মরত শ্রমিক ১২১৪ জন। ইনডং চা বাগানে নিজস্ব চা পাতা উৎপাদনের গড় ২৫ লাখ কেজি। ফ্যাক্টরিতে নিজস্ব উৎপাদিত চা ৫-৬ লাখ কেজি। বাইরের বাগান থেকে কাঁচা পাতা সংগৃহিত হয় না। মোট বাৎসরিক উৎপাদিত চা ৫-৬ লাখ কেজি। বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাগানে ইওরগ্যানিক সিটিসি চা উৎপাদিত হয়। বাগানটি ছোটো হলেও চরিত্রগত দিক দিয়ে উন্নতমানের বাগান। শ্রমিক আবাস নির্মাণ, মেরামতি এবং রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ কোম্পাণি বছরে গড়ে ৫ লাখ টাকা খরচ করে। বাগিচায় শৌচাগারের সংখ্যা ২০৭ টি। ইনডং চা বাগিচায় হাসপাতাল আছে। ডিসপেনসারিও আছে। আবাসিক ডাক্তার আছে। প্রশিক্ষিত নার্সের সংখ্যা ২ জন। মেল ওয়ার্ডের সংখ্যা ৬ টি, ফিমেল ওয়ার্ডের সংখ্যা ৮ টি। আইসোলেশন ওয়ার্ড ১ টি, মেটারনিটি ওয়ার্ড নেই। বাগিচার হাসপাতালে অপারেশন থিয়েটার আছে। অ্যাম্বুলেন্স আছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র বাগানেই। চিকিৎসার জন্য শ্রমিকদের বাগানে অবস্থিত প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রেফার করা হয়। বাগিচায় ২০০৬ সাল থেকে লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার নেই। বাগিচায় পর্যাপ্ত ওষুধ সরবরাহ হয় না। ওষুধের তালিকা স্টক অনুযায়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নোটিশ বোর্ডে দেওয়া হয় না। তবে উন্নত মানের পথ্য সরবরাহ এবং নিয়মিত ডায়েট চার্ট অনুসরণ করা হয়। ক্রেশের সংখ্যা ১টি। ক্রেশে পর্যাপ্ত জলের ব্যাবস্থা, শৌচালয় আছে। দুধ, বিস্কুট বা পুষ্টিকর খাবার ক্রেশের শিশুদের দেওয়া হয় না। পর্যাপ্ত পানীয় জল ক্রেশে এবং চা বাগানে সরবরাহ করা হয় না। পানীয় জল সময়ে সময়ে ব্যবহারযোগ্যও নয়। বাগিচায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। বাগিচা সংলগ্ন উচ্চ বিদ্যালয় আছে। শ্রমিক সন্তানদের বিদ্যালয়ে নেবার জন্য যানবাহনের ব্যাবস্থা হিসাবে একটা ট্রাক্টর আছে। বাগানে বিনোদনমূলক ক্লাব আছে। খেলার মাঠ আছে। ইনডং টি গার্ডেনে নিয়মিত পি এফ বা গ্র্যাচুইটির টাকা জমা পড়ে। বোনাসও চুক্তি অনুযায়ী মিটিয়ে দেওয়া হয়। পি এফ বা গ্র্যাচুইটি বকেয়া থাকে না। শ্রমিকদের মজুরি, রেশন এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা চুক্তি অনুযায়ী দেওয়া হয়।

মেটেলি থেকে জুরান্তীর পথে

পুরনো চা বাগিচার সাহেব ম্যানেজারেরা আভ্যন্তরীন কাজে ঘোড়া ব্যবহার করতেন বিভিন্ন পোলো ক্লাব এর জন্য। আলাদা আলাদা রাখতে হতো বলে ঘোড়াকে কেন্দ্র করে বাগানে বাগানে আস্তাবল ছিলো। স্থানীয় মানুষের ব্যস্ততাকে ঘিরে মেটেলি হয়ে সামসিং পাহাড়তলীর এক মনোরম জনপদ। এখানকার বেশিরভাগ মানুষের জীনবনযাত্রা চা বাগিচা কেন্দ্রিক।

পুরনো চা বাগিচার সাহেব ম্যানেজারেরা আভ্যন্তরীন কাজে ঘোড়া ব্যবহার করতেন বিভিন্ন পোলো ক্লাব এর জন্য। আলাদা আলাদা রাখতে হতো বলে ঘোড়াকে কেন্দ্র করে বাগানে বাগানে আস্তাবল ছিলো। স্থানীয় মানুষের ব্যস্ততাকে ঘিরে মেটেলি হয়ে সামসিং পাহাড়তলীর এক মনোরম জনপদ। এখানকার বেশিরভাগ মানুষের জীনবনযাত্রা চা বাগিচা কেন্দ্রিক। বাঁ হাতে একটা কলেজ পেরিয়ে গেল। সংলগ্ন মাঠে স্কুলফেরত ছাত্র-ছাত্রীদের জটলা। মেটেলির জাগ্রত কালী বাড়িটির ঠিক উল্টোদিকে থানা। রবিবার বেশ জমজমাট হাট বসে। সামসিং থেকে স্থানীয় মানুষজন নিচে নেমে এসে প্রয়োজনীয় রসদ কেনাবেচা করে। শুনলাম চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষের দেশ ছবির দৃশ্য গ্রহণ হয়েছিল এই চালসা মেটেলি চা-বাগানে। নেওড়া নদীর কোল ঘেঁষে জুরান্তি চা বাগিচার কাছে

জুরান্তী চা-বাগানের হাসপাতাল, নিচে জুরান্তী ফ্যাক্টরি

আশ্চর্য সুন্দর এক পিকনিক স্পট আছে। অনাবিল স্নিগ্ধতা। নুড়ি পাথর ভেঙে নেওরা নদীর একেবারে কাছ বরাবর চলে এসেছি। নেওরা নদীর স্বচ্ছ জলে নামলাম। পা ডুবালাম জলে। এক প্রশস্তি ছড়িয়ে গেল শরীরে এবং মনে। চালসা, ডামডিম, মেটেলি, মালবাজার যেখানেই হোক তিস্তা এবং নেওরার বুকে রাত্রির ছায়া নামে। ডুবে যাওয়া মিলনের ম্যাজিক লণ্ঠন জ্বলে ওঠে ডুয়ার্স ভুবনে। সে আর এক রূপ। অবাক-করা এই রূপ চিরস্থায়ী হয়ে থাকে অনুভবে।

জুরান্তী চা বাগান

মালবাজার সাব ডিভিশনের মেটেলি ব্লকের জুরান্তী চা বাগানটির পরিচালক গোষ্ঠী জুরান্তী টি কোম্পানি। বাগানটি ডি বি আই টি এ সংগঠনের সদস্য। বাগানে প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা ২ টি। এগুলো হলো এন ইউ পি ডব্লিউ এবং পি টি ডব্লিউ ইউ। জুরান্তী চা বাগানটির আয়তন ৭৪২.৪৬ হেক্টর। চমোট চাষযোগ্য আবাদীক্ষেত্র ৫১০.১৮ হেক্টর। প্রতি হেক্টর ড্রেন এবং সেচযুক্ত প্ল্যান্টেশন এরিয়া থেকে প্রতি হেক্টর জমি পিছু ২১১৮ কেজি করে চা ফ্যাক্টরিতে তৈরি হয়। মোট কর্মরত শ্রমিক ১৪৫৯ জন। জুরান্তী চা বাগানে নিজস্ব চা পাতা উৎপাদনের গড় ৪৫-৫০ লাখ কেজি। ফ্যাক্টরিতে নিজস্ব উৎপাদিত চা ১০-১১ লাখ কেজি। বাইরের বাগান থেকে সংগৃহিত কাঁচা পাতা ১-২ লাখ কেজি। মোট বাৎসরিক উৎপাদিত চা ১১-১২ লাখ কেজি। বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাগানে ইঅরগ্যানিক সিটিসি চা উৎপাদিত হয়। শ্রমিক আবাস নির্মাণ, মেরামতি এবং রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ কোম্পাণি বছরে গড়ে ৫ লাখ টাকা খরচ করে। বাগিচায় শৌচাগারের সংখ্যা ২০০ টি।

জুরান্তী চা বাগিচায় সমৃদ্ধ হাসপাতাল আছে। ডিসপেনসারিও আছে। ডাক্তার আছে। প্রশিক্ষিত নার্সের সংখ্যা ১ জন। মেল ওয়ার্ডের সংখ্যা ৮ টি, ফিমেল ওয়ার্ডের সংখ্যা ৬ টি। আইসোলেশন ওয়ার্ড ৫ টি, মেটারনিটি ওয়ার্ড নেই। তবে মেটারনিটি ওয়ার্ড আগে ছিলো। বর্তমানে চা বাগানের মেটারনিটির কেসগুলিকে সব গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে। বাগিচার হাসপাতালে অপারেশন থিয়েটার নেই। অ্যাম্বুলেন্স আছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই। সবচেয়ে কাছের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইনডং এ। চিকিৎসার জন্য গড়ে বছরে ৩০০ জন শ্রমিককে রেফার করা হয়। বাগিচায় পর্যাপ্ত ওষুধ সরবরাহ হওয়ার দাবি উঠলেও শ্রমিকদের

অভিযোগ কেবলমাত্র জ্বর, মাথাব্যাথা, পেট খারাপ এর ওষুধই দেওয়া হয়। ওষুধের তালিকা স্টক অনুযায়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নোটিশ বোর্ডে দেওয়া হয় না। উন্নত মানের পথ্য সরবরাহ করা হয় না বললেই চলে। নিয়মিত ডায়েট চার্ট অনুসরণ করা হয় না। বাগিচায় লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার আছেন। বাগিচায় ক্যান্টিন নেই। ক্রেশের সংখ্যা ২ টি। ক্রেশে পর্যাপ্ত জলের ব্যাবস্থা আছে। শৌচালয় নেই। দুধ, বিস্কুট বা পুষ্টিকর খাবার ক্রেশের শিশুদের দেওয়া হয় না। শিশুদের পোশাক সরবরাহ করা হয় না নিয়মিত। পর্যাপ্ত পানীয়জল ক্রেশে এবং চা বাগানে সরবরাহ করা হয় না। পানীয় জল সময়ে সময়ে ব্যবহারযোগ্য নয়। বাগিচায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে বেশ কিছুটা দূরে। বাগিচা সংলগ্ন উচ্চ বিদ্যালয়ও বেশ কিছুটা দূরে। শ্রমিক সন্তানদের বিদ্যালয়ে নেবার জন্য যানবাহনের ব্যাবস্থা হিসাবে একটা বাস আছে। বাগানে বিনোদনমূলক ক্লাব আছে। খেলার মাঠ আছে। জুরান্তী টি গার্ডেনে বিগত অর্থবর্ষে গড়ে ৮০ লাখ টাকা প্রভিডেন্ড ফান্ড খাতে জমা পড়েছে। কোনো পি এফ বকেয়া নেই। বিগত চার বছরে গ্র্যাচুইটি বাবদ বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ ৫৩ লাখ টাকা। বছরে গড়ে ৫০ জন শ্রমিক গ্র্যাচুইটি পেয়ে থাকে। শ্রমিকদের মজুরি, রেশন এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা চুক্তি অনুযায়ী দেওয়া হয়। বাগানে শ্রমিকদের কোনো পাওনাগন্ডা বাকি নেই।

চোখ জুড়ানো এক আশ্চর্য সৌন্দর্য্যখনি জুরান্তী। মেটেলি থেকে জুরান্তির পথটি ভারি সুন্দর। জুরান্তী পর্যন্ত জিপ, জোঙ্গা এবং কমান্ডার যেভাবেই যাওয়া যাক না কেন, চালসা থেকে ২৫ থেকে ৩০ জন যাত্রী জিপের ভেতর ঠেসে ঠেসে এবং জিপের সামনে পেছনে ওপরে নিচে বসিয়ে কিভাবে যে ড্রাইভার চালিয়ে নিয়ে যায় তা বিস্ময়ের ব্যাপার। বিশেষত হাটের দিন। লোকজন এতেই অভ্যস্ত। আসলে মেটেলিতে বেশিরভাগই চা শ্রমিক। জিপগুলোও অনেক চা শ্রমিকদের। নিজেরাই ছুটির দিনে চালায়। কিছু কিছু ড্রাইভারের এটাই মূল পেশা। এবড়োখেবড়ো রাস্তা থেকে কয়েক হাত দূরে চা বাগান কোয়ার্টারে গেলাম। বাবুদের কোয়ার্টার যেমন হয়, সুন্দর নাম-না-জানা সাজানো বাগান, দোলন চাঁপা, বেলফুল, ফল আর কিছু ফুলের সমারোহ। আছে শাকসবজির বাগান, কোয়ার্টারের পেছনে প্রচুর কলাগাছ এবং ভুট্টাক্ষেত। মাঝেমাঝে হাতি এসে সবকিছু তছনছ করে দিয়ে যায়। চা-বাগানে আর সেই দিন নেই। ছেলেপুলেরা এখন আর বাগানের কাজ করতে নারাজ। সাহেবরা চলে যাবার পর চা বাগান মালিকের হাতবদল হয়েছে আর মুমূর্ষু রোগীর মত ধুঁকছে। সবচেয়ে অসুবিধা ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা।

ফ্যাক্টরির পাশ দিয়ে যেতে যেতে চা পাতার গন্ধ এসে নাকে লাগে। চা বাগানের পথ পাখ-পাখালির ডাকে মুখরিত। যেদিকেই তাকাই সবুজ সমুদ্র ঢেউয়ের মতন দূর দিগন্তে ছড়িয়ে রয়েছে। যেন পরিসমাপ্তি নেই এই সবুজ সমুদ্র ঢেউ এর। শিমুল, শিরিষ, সিট্রোনেলো গাছ। ছায়াপথে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের সঙ্গে গল্প করতে করতে যাই। জুরান্তি চা-বাগানের একদিকে এঙ্গো, অন্যদিকে নাগেশ্বরী। দূর থেকে দেখা যায় ম্যানেজারের সুন্দর কুঠি। রোদ্দুরে ফুলবাগানে স্ট্যাচুর মত দাঁড়িয়ে আছে বাগানের মালি। আমাদের দেখে একটু নড়েচড়ে উঠল। সত্যি লোভনীয় বাংলো, অথচ আশ্চর্য জনমানবহীন নির্জন। বাংলোর পূর্বদিকে ধাপে ধাপে উঠে গেছে পাহাড়। পাহাড়ের ধাপে ধাপে ঝুম চাষ হচ্ছে। রাশি রাশি প্রজাপতি উড়ছে থেকে থেকে। একটানা ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক। ম্যানেজার বাবুর কুঠির পাশ দিয়ে হেঁটে যাই। একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে কয়েকজন মদেশিয়া রমণী দুপুরের খাবারে মনোযোগী - ছোলা মটর,শুকনো রুটি। জোয়ান মরদেরা কেউ কেউ হাঁড়িয়া খাচ্ছে। ওদের ছবি তুলতে গেলে দারুণ খুশিতে ঢলে পড়ে এ ওর গায়ে। বড্ড সাধাসিধা জীবন ওদের। বাইরে থেকে আমরা কতটুকুই বা জানি। যেতে যেতে দেখতে পেলাম পাতা নিয়ে যাওয়া ট্রাকের পেছনে বাগানের বাবু এবং তাদের ছেলেমেয়েরাও অনেকে হাট-বাজার সেরে ফিরছে। কেউ যাচ্ছে মেটেলি লাইব্রেরীতে বই পাল্টাতে, টুকিটাকি জিনিসপত্র আনতে। হাঁটতে হাঁটতে আমরা পৌঁছে যাই নদীর পাশে। বর্ষায় নদীর চেহারা পাল্টে যায়। পাহাড়ি নদীর ধর্ম গাছের গুঁড়ি এবং বিশাল বিশাল পাথরের চাঁই নদীর স্রোতোধারা টেনে নিয়ে আসে। ভয়ংকর উত্তাল তরঙ্গায়িত নেওরা বয়ে চলেছে। ওপারে সবুজ অরণ্য, মাথার ওপরে নীলনীল আকাশ, নির্জন নদ, সব মিলিয়ে চমৎকার কোলাজ। ঠান্ডা জলে পা ডুবিয়ে বসে থাকি। পায়ের নিচে নুড়িপাথর সুড়সুড়ি দিচ্ছে। ডুয়ার্সের চা বাগান ঘুরে ঘুরে দেখার এটাই সবচেয়ে বড় পাওনা।

ভীষ্মলোচন শর্মা

রঙ্গিলা-র ভবলীলা

এখনকার ফিল্ম স্টারদের হাল দেখলে বড় দুঃখ লাগে জানেন। কোথায় সেই ক্রেজ? কোথায় সেই ফ্যান? ভেবে দেখুন, যাদের ছবি আমরা আঁকতাম তারাই কিন্তু এখন অবধি সত্যিকারের সিনেমা স্টার। তারা কেউ রোজগারের দরকারে জিন্দেগিতে কোনওদিন রেস্টুর‍্যান্টের বিজনেস করে নি বা মাচার শো-তে যায়নি। ওদের ওয়ার্লটা সাচ্চা সিনেমা ওয়ার্লের বাইরে আর কিছু ছিল কি, বলুন?

খেয়ালি মানুষদের তুলনা মেলা ভার। বিশেষত জীবনের একপেশে স্রোতে যখন তারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আচম্বিত কোনো বৈচিত্র্য পেশ করার দ্বায়িত্ব গ্রহণ করে ফেলেন। নিউ মার্কেট পাড়ায়, প্যারিস বার-এর ঠিক পাশে 'তাজমহল পান শপ'-এর কথাই ধরুন। এ দোকানের হরেক ফ্লেভার ও হরেক কিসিমের পান, পাশের পানশালাটির পানীয় বৈচিত্র্যের সাথে হামেশাই সমান তালে পাল্লা দিতে পারে। যদিও আসল বৈচিত্র্য কিন্তু সেটা নয়। সেটি হল দোকানের আদি প্রতিষ্ঠাতা মালিক মহাশয়েব গভীর মহম্মদ রফি প্রেম। যার সরব ও সচিত্র দলিল হয়ে বহু বছর ধরে দাঁড়িয়ে আছে এই লম্বা চওড়া গোটা দোকানখানা। দিলীপ কুমার, শাম্মী কপুর আর মহম্মদ রফি— এই তিন মহারথীর সৃষ্ট এক মহা অধ্যায়, সাদা কালো যুগের বলিউডে বিরাট তেজি সাত রঙ্গা প্লাবন নিয়ে এসেছিল পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে। আর ওই প্লাবনেরই একটি ছোট্ট ঢেউ-এর দাগ নিজের বুকে চিরস্থায়ী ভাবে ধরে রেখেছে 'তাজমহল পান শপ'। যেখানে দেখবেন পূর্ব উল্লেখিত ওই তিন প্রবাদপ্রতিম স্টারের নানা ভঙ্গীর ফটোগ্রাফে ছয়লাপ দোকানের প্রতিটি দেয়াল। তার ওপর দোকানময় রয়েছে বাহারি কাঁচের আয়না। যার মধ্যে আলো ও ছায়ার নানা প্রতিফলনে তাজমহল সুলভ চোখ ধাঁধানি সৃষ্টির প্রচেষ্টাও যথেষ্ট দ্রষ্টব্য। আর এছাড়া রফি সাহেবের কণ্ঠে প্রেমের বয়ান মুখর পুরোনো দিনের গান তো সারাক্ষণ বেজেই চলেছে।

অবশ্য আজকের সময়ের 'থিম' ভিত্তিক বিগ বাজেট পুজো প্যান্ডেল কিংবা এন্টারটেনমেন্ট পার্কগুলো এর চেয়ে অনেক বেশি জৌলুসপূর্ণ। সুতরাং তাদের সাথে এটার তুলনা টানার কোনো মানেই হয় না। কিন্তু যে সময়ে এই দোকান স্থাপিত হয়েছিল, তখনকার

মাপকাঠিতে এ নিশ্চয় এক বিরাট অভিনব ব্যাপার ছিল। কিংবা কে বলতে পারে, এর উলটোটাই হয়তো হয়েছিল। এক সাধারণ পান বিক্রেতা, যখন সময়ের অনেক আগেই নিজের ব্যবসাস্থলে এরকম একটা থিম প্রয়োগের কথা ভেবেছিলেন, সেটা তার সমসাময়িক মানুষদের কাছে হয়তো কিছুটা উদ্ভট খেয়াল বলেই পরিগণিত হয়েছিল। তবে সে কালে যেটাই হয়ে থাকুক, বৈচিত্র্য আর স্বাতন্ত্র্যের নিরিখে একালে কিন্তু এখনও একে গুড মার্কস দিতেই হবে। আর দোকানের পান যদি মুখে দিয়েছেন, তবে তো একদম এক কথায় ফুল মার্কস!

সন্ধের মুখে সেদিন, সেই বিখ্যাত দোকানের মশলা সুরভিত একখানা ঠান্ডা পান মুখে গুঁজে সবে রাস্তায় নেমেছি। চোখে পড়ল, উল্টোদিকের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আমার উদ্দেশে হাত নাড়ছেন তারিক ভাই। আমিও পাল্টা হাত নাড়লাম। এখান থেকে বেরিয়ে আমার গন্তব্য ছিল পুরনো হগ মার্কেট-এর দিকে। কিন্তু তারিক ভাইয়ের সাথে দু'-চার কথার কুশল বিনিময়ের জন্য রাস্তা ক্রস করতে হল।

—কি স্যার ভাল তো? চওড়া হাসি মুখে নিয়ে তারিকভাই শুধালেন।

জবাবে আমিও হেসে বললাম,

—হ্যাঁ, সব ভাল। আপনার কী খবর বলুন?

—চলছে দাদা।

—চলছে কি? বলুন জোরদার চলছে! অলমোস্ট প্রতি মাসে দেখছি হাফ ডজন করে বাংলা ছবি রিলিজ! আপনাকে আর পায় কে?

তারিক ভাই সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়লেন। বড়সড় ভারিক্কি গম্ভীর চেহারা তার। দাড়িগোঁফহীন চকচকে মুখমণ্ডলে মনুমেন্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে টেনিদার মতো পেল্লায় একখানা নাক। ঢুলু ঢুলু দুটি বড় চোখে খুশির ঝিলিক তুলে তিনি বললেন,

—তা ঠিকই। ছবি চলুক না চলুক আমার তো জানেনই, অ্যাডভান্স পেমেন্ট!

—সে তো বটেই। সিনেমার পাবলিসিটিতে নো ধার বাকির কারবার!

—তো আপনাদের সাথে আবার কবে কাজ হবে বলুন?

—আরে সে তো উপরওয়ালার মর্জি। সময় হলে নিশ্চয়ই হবে।

—ছবি টবি করতে বলুন কোম্পানিকে। আপনাদের ডিজাইন এত ভালো হয়। পোস্টার ছেপেও আনন্দ!

এ রাস্তায় গাড়ির ভিড় খুব বেশি নেই। কিন্তু ঈদের বাজার করতে চতুর্দিকে মানুষের ঢল নেমেছে। তার মধ্যে আছে ঝাঁকে ঝাঁকে বাইকের দৌরাত্ম্য। হর্ন বাজিয়ে যেমন খুশি এদিক ওদিক থেকে একদম ঘাড়ের ওপর এসে পড়ছে তারা। ফলে দু' দণ্ড দাঁড়িয়ে শান্তিতে কথা বলাই দায়। আর তাছাড়া কাজেরও তাড়া ছিল আমাদের দুজনেরই। তাই এরপর মামুলি কিছু কথা বলেই যে যার নিজের পথ ধরলাম।

রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে খেয়াল করে দেখলাম তারিক ভাইয়ের সাথে দেখা হল পাক্কা দু-আড়াই বছর বাদে। যে সময়টায় আমাদের প্রোডাকশন হাউস ধীরে ধীরে সিনেমার ব্যবসা থেকে সরে এসেছে। না হলে ধর্মতলা চত্বরের এই সিনেমা ডিস্ট্রিবিউশন পাড়ার পরিচিত মুখগুলোর আনাগোনা তো সারা বছরই লেগে থাকতো আমাদের আপিসে। তারিক ভাই, আজিম, আমানত ভাই যারা সকলেই বাংলা সিনেমার পাবলিসিটির ক্ষেত্রে এক একটা স্তম্ভ বিশেষ।

এখন অবশ্য পাবলিসিটি কথাটা বিশেষ ব্যবহার হয় না। পুরো খোলনলচে বদলে দেওয়া একটা নতুন শব্দ এসেছে তার জায়গায়। এখন বলা হয় 'ফিল্ম প্রোমোশন'! আর এই কার্যক্রমে শুধু সিনেমার পোস্টার দিয়ে কাজ চলে না। বরং খোদ ছবির স্টার এবং কো-স্টারকে দরকার হয়। টিভি চ্যানেলের টক শো হোক বা ছবির মিউজিক লঞ্চ অনুষ্ঠান বা রিলিজের সপ্তাহে সিনেমা হল ভিজিট, সবখানেই স্টারদের সশরীরে উপস্থিত থাকতে হয় ছবির কল্যাণ কামনায়। এমন কি সিনেমার প্রযোজকরা আজকাল একদম স্পষ্ট ভাষায় সেই সব টার্মস উল্লেখ করে রাখেন ছবির কন্ট্রাক্ট সই করানোর আগে। কারণ প্রোমোশনে মার খেয়ে গেলে ছবির ভবিষ্যৎ নাকি একেবারে অন্ধকার। তখন বক্স অফিস ঝিমোবে স্লো মোশানে। আর ছবিটির পতন ঘটবে হুড়মুড়িয়ে।

তবে হ্যাঁ, পোস্টার তাই বলে অচল হয়ে যায়নি এখনও। সিনেমা রিলিজের এক দু' সপ্তাহ আগে থাকতেই শহরের জুতসই দেয়াল জুড়ে তাই নিয়ম করে সারি

ইদানীং অবশ্য পোস্টারের এমন এমারজেন্সি ঘাটতি কালে ভদ্রে পড়তে দেখা যায়। কারণ সিনেমা হলে সিনেমার গড়পড়তা আয়ুই তো এখন তিন থেকে চার হপ্তার বেশি নয়। 'সগৌরবে' পঁচিশ দিন, পঞ্চাশ দিন বা একশো দিন-এর গর্বিত ঘোষণা সম্বলিত পোস্টার ক্বচিৎ কদাচিৎ চোখে পড়ে। তাও আবার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাবে সেগুলো হল 'অশ্বত্থমা হত ইতি গজ' কেস। অর্থাৎ, ছবি টানা একশো দিন চলছে বটে। কিন্তু সেটা একেবারে কোনও ধ্যাদ্ধাড়া গোবিন্দপুরের একটি মাত্র সিনেমা হলে।

সারি রঙীন পোস্টার পড়ে ছবির আগমন ঘোষণা করতে। সাইজের রকমফেরে পোশাকি ভাষায় যে পোস্টারগুলোকে বলা হয়, টু শিট, ফোর শিট বা সিক্স শিট পোস্টার। এই সব রঙচঙে জমকালো পোস্টার একচেটিয়া ভাবে দক্ষিণ ভারতের শিবকাশি থেকে ছেপে এনে কলকাতায় সাপ্লাই করাটাই তারিক ভাইয়ের কাজ। আজ্ঞে হ্যাঁ, এই সেই শিবকাশি, যেখানকার বাজি পটকার সুখ্যাতি শুনে এসেছেন এতকাল। কিন্তু ক'জন জানেন যে সেখানে দক্ষিণী সিনেমার বড় ফরম্যাটের পোস্টার ছাপার এক রমরমে ইন্ডাস্ট্রিও বিদ্যমান? আমাদের তারিক ভাই হলেন সেখানকারই এক প্রেসের পূর্ব ভারতীয় এজেন্ট। আর তার মুখ্য ক্লায়েন্ট হল বাংলা, ভোজপুরি আর ওড়িয়া সিনেমাগুলো।

শিবকাশি ডেলিভারি পাঠালে, হাওড়া স্টেশন থেকে বস্তা বোঝাই সে পোস্টার তারিক ভাই এনে পৌঁছে দেন ধর্মতলা চত্বরে সিনেমা ডিস্ট্রিবিউটারের ঘরে। এক এক পিস পোস্টারের দাম পনেরো থেকে কুড়ি টাকা। সুতরাং ডেলিভারি এসে পৌছলে, ডিস্ট্রিবিউটারের প্রথম কাজ হল লোক দিয়ে বস্তা খুলে, সেই পোস্টার গুণে হিসেব মেলানো। এবং তারপর, যত্ন করে তা গুছিয়ে রাখা। একটা পোস্টারও যাতে এদিক ওদিক না হয়, তার জন্য কত না সতর্কতা তখন! অথচ এই সব দামি পোস্টার যখন শহরের দেয়াল জুড়ে সাঁটা হয়, তখন তার গড়পড়তা আয়ু মোটে সাত থেকে দশ দিন। কারণ, তার মধ্যেই আবার নতুন ছবি চলে আসে, ওই একই দেয়ালের দখল নিতে।

আর শহরের বাইরে যত মফঃস্বলের সিনেমা হলে ছবি রিলিজ হয়, সেখানে রেওয়াজ হল, সিনেমা হলের মালিকরা নিজেদের খরচেই এক রঙের লেটারিং পোস্টার ছাপিয়ে নেবেন। ডিস্ট্রিবিউটারের ঘর থেকে তাদের কপালে মাথা পিছু বড় জোর একটা কি দুটো শিবকাশির ছয় শিট পোস্টার জোটে। এবং সেটা শুধুমাত্র সিনেমা হলের সামনের দেয়ালখানায় ডিসপ্লে করার জন্য। মজার ব্যাপার হচ্ছে যে, নিজের খরচে ছাপানো এই পোস্টার ডিস্ট্রিবিউটারকে কখনও কখনও দ্বিতীয়বার করে কিনে সরবরাহ করতে হয়। আর সেটা করতে হয় আজিমের সৌজন্যে!

সিনেমা পাবলিসিটিতে তারিক ভাইয়ের পর সেকেন্ড লাইন অফ অ্যাকশন হল এই আজিম। পোস্টার না হয় তারিক ভাইয়ের মাধ্যমে ছাপা হয়ে কলকাতায় এসে পৌঁছল। কিন্তু এবার দেয়ালে দেয়ালে সেগুলো সাঁটবে কে? তার জন্যই ডাক পড়ে আজিমের। উত্তর ও মধ্য কলকাতার প্রধান প্রধান সড়কগুলোর দুপাশে দুর্গম ও সুগম সব রকম দেয়ালেই সিনেমার পোস্টার সাঁটার একচেটিয়া অধিকার এই বেঁটে খাটো লোকটার দখলে। সজারুর কাঁটার মতো খোঁচা খোঁচা চুল এবং তারিক ভাইয়ের চেয়ে সামান্য ছোট আকারের ঢুলু ঢুলু ধূর্ত চোখ তার। মুখময় সর্বদা সরল হাসি। কিন্তু তা দেখে তার ভেতরটার আভাস পাওয়া দুষ্কর। কারণ তাকে এড়িয়ে অন্য লোক দিয়ে যদি কেউ পোস্টার লাগানোর চেষ্টা করে, তবে সেটা হবে ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার সামিল। এবং এক রাতের মধ্যে ছিঁড়ে ফর্দাফাই হয়ে সেই পোস্টার ভবলীলা সাঙ্গ হওয়া কেউ ঠেকাতে পারবে না।

নিন্দুকেরা বলে আজিমের খপ্পরে পোস্টার পড়লে একশোটার মধ্যে সত্তর থেকে আশিখানা শহরের দেয়ালে শোভা পায়। আর বাকি কুড়ি তিরিশখানা অবধারিত ভাবে বিক্রি হয়ে যায় নিউ মার্কেট থানার পেছনে পোস্টার গলিতে। দু'পাশে ট্যাঁরা বাঁকা উঁচু বাড়ির ফাঁকে সে এক আশ্চর্য সরু গলি। যেখানে দিনের আলো মাটি অবধি এসে পৌঁছয় একমাত্র বোধহয় দুপুর বারোটায়। সূর্য যখন একেবারে মাথার ওপরে। এবং গলির বেশির ভাগ অংশেই আপনাকে অতি সাবধানে ডিঙ্গি মেরে হাঁটতে হবে। কোথাও নর্দমার জল উপচে চলে এসেছে রাস্তার ওপর। কোথাও বা পথ রোধ করে জমে আছে আবর্জনার বিপজ্জনক ঢিপি। তারই মাঝে রাস্তার দু'পাশে ছোট ছোট অন্ধকার গুটিকতক খুপরি দোকান ঘর। প্রত্যেক দোকানেই মেঝে থেকে দেয়াল অবধি ডাঁই করে রাখা নানা মাপের পোস্টার। বিগত দু'-তিন বছরের মধ্যে রিলিজ হওয়া যাবতীয় হিন্দি, বাংলা এবং ইংরেজি ছবির পুরনো পোস্টার এখানে একটু খোঁজ করলেই পেয়ে যাবেন।

কারা কিনে নিয়ে যায় এই পুরনো পোস্টার, আর কীসের জন্যই বা কিনে নিয়ে যায় তার সম্পূর্ণ সালতামামি করা গবেষকদের কাজ। আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা থেকে এটুকুই জানি যে সিনেমা মাসখানেক চলার পরে যখন ডিস্ট্রিবিউটারের ঘরে পোস্টার বাড়ন্ত, তখন হামেশাই

তাকে নিজের পোস্টার আবার গ্যাঁটের কড়ি গুণে এখান থেকে কিনে নিতে হয়, মফঃস্বলের হলগুলোতে সাপ্লাই দিতে। তবে এই গাঁটগচ্চা ডিস্ট্রিবিউটার অতি আনন্দের সঙ্গেই দিতে রাজি হন। কারণ ছবি লং রান-এ ভাল চলছে বলেই না নতুন করে পোস্টার কিনতে হচ্ছে। আর এখানে কিনতে পাওয়া যাচ্ছে বলে অন্ততঃ এক গাদা টাকা খরচ করে আবার শিবকাশিতে অর্ডার দেয়ার দরকার পড়ছে না!

ইদানীং অবশ্য পোস্টারের এমন এমারজেন্সি ঘাটতি কালে ভদ্রে পড়তে দেখা যায়। কারণ সিনেমা হলে সিনেমার গড়পড়তা আয়ুই তো এখন তিন থেকে চার হপ্তার বেশি নয়। 'সগৌরবে' পঁচিশ দিন, পঞ্চাশ দিন বা একশো দিন-এর গর্বিত ঘোষণা সম্বলিত পোস্টার ক্বচিৎ কদাচিৎ চোখে পড়ে। তাও আবার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাবে সেগুলো হল 'অশ্বত্থমা হত ইতি গজ' কেস। অর্থাৎ, ছবি টানা একশো দিন চলছে বটে। কিন্তু সেটা একেবারে কোনও ধ্যাদ্ধাড়া গোবিন্দপুরের একটি মাত্র সিনেমা হলে। যে সিনেমা হল এই একশো দিনের মধ্যে চালাবার মতো দ্বিতীয় আর কোনো সিনেমাই যোগাড় করতে পারেনি। আর এছাড়া আরেকরকম ভেজালও অবশ্য খুব চলছে ইদানীং। বলশালী ডিস্ট্রিবিউশন হাউস অনেক সময় পয়সা বা পেশির জোরে, নেপথ্য থেকে হল মালিকদের ওপর চাপ দিয়ে, যে ভেজাল সাফল্যের কাহিনি সৃষ্টি করে। জলে থেকে কুমিরের সাথে বিবাদ করার ক্ষমতা তো বেশির ভাগ হলমালিকদেরই নেই। তাই সারা বছরের ছবি সাপ্লাই অব্যাহত রাখতে, সেই বড় ডিস্ট্রিবিউটারের সুপার ফ্লপ ছবিকেও জামাই আদরে তাদের চালু রাখতে হয়। দর্শক হোক বা না হোক, একটি করে শো চলবেই, যতক্ষণ না সেই ফিল্মের পঁচিশ বা পঞ্চাশ দিন পূর্ণ হওয়ার পোস্টার দেয়ালে সাঁটানো যাচ্ছে!

এই হল গিয়ে, বাংলা সিনেমার রঙচঙে রঙ্গিলা পোস্টারের জীবন চক্র। অবশ্য জীবন কাহিনির শুরুতে একটা জন্ম বৃত্তান্ত থাকে। পোস্টারের ক্ষেত্রে যেটা হল, তার ডিজাইনিং পর্ব। নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে একটা সময় ছিল, যখন বাংলা সিনেমার যাবতীয় পোস্টার ডিজাইন করতেন একবেমোদ্বিতীয়ম গৌতম বরাট। চুলে ম্যাজেন্টা কলপ আর অনিল কাপুরের মতো পুরুষ্টু ফোলা গোঁফ, এ দুটোই তার নিজস্ব ট্রেড মার্ক! তার স্টুডিওতে কাজ শুরু হত সিনেমার নামাঙ্কন দিয়ে। কয়েকটি হরফের নকশায় ছবির মেজাজ ফুটিয়ে তোলার সেই কৌশল অবশ্য অনেকটাই ফর্মুলা মাফিক। মানে কিছু লেটারিং স্টাইল আছে যেটা অ্যাকশন সিনেমায় মানাবে। কিছু স্টাইল আবার শুধুমাত্র রোম্যান্টিক সিনেমায় খাপ খায়। এই নামাঙ্কন সম্পূর্ণ হলে পরবর্তী পর্যায়ে, সিনেমার স্টিল ছবির ওপর তুলি চালিয়ে বা কাঁচি দিয়ে কাটাকুটি করে তিনি মূল পোস্টারের ডিজাইন তৈরি করতেন।

গৌতমদার একচেটিয়া এই রাজত্বে আমাদের মতো ভাগিদাররা জুটে গিয়েছিল কম্পিউটার, ফটোশপ আর ইন্টারনেট-এর যুগে। আমাদের অফিসে প্রথমবার এসেই যে টেকনোলজির মুগ্ধ ফ্যান হয়ে পড়েছিলেন তারিক ভাই। প্রায়ই বিকেলের দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এসে বসে থাকতেন তিনি, কম্পিউটার স্ক্রিনে আমাদের নানা কসরৎ দেখতে। আর তারিফ করে মাঝে মাঝেই বলতেন, এই সব ডিজাইন রাস্তায় পড়লে সবচেয়ে ভাল কেন লাগে জানেন? হিন্দি ছবির পোস্টারের পাশে আমাদের পোস্টারগুলো আর হারিয়ে যায় না!

দু'হাজার সালের শুরুর দিকে, ওই সময় থেকেই বাংলা ছবিতে পোস্টারের জন্য আলাদা করে ফটো শুট চালু হয়। আর ওই সব জাঁকজমকের কারণে কোয়ালিটির দিক থেকেও পোস্টার আরও একটু জাতে উঠে গেল। তবে, সহজলভ্য টেকনোলজির সব কিছুই তো আর ভাল নয়। কিছুটা বেনো জলের আগমনও অনিবার্য। এমনিতেই তখন দক্ষিণী সিনেমার হুবহু কপি করার একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছিল সিনেমা প্রযোজকদের মধ্যে। আর অনেকটা তেমন ভাবেই কিছুদিনের মধ্যেই পোস্টারের ক্ষেত্রেও সরাসরি দিশি-বিদেশি সিনেমার পোস্টার দেখে আইডিয়া চুরিটা একেবারে জলভাত হয়ে গেল।

চিরকালই অবশ্য দেখা গেছে লক্ষ্মী ও সরস্বতী এক জায়গায় পাশাপাশি আসনে বেমানান। সিনেমা জগত তাই স্বাভাবিক ভাবেই, চালাকির দ্বারা কার্যসিদ্ধিকে শিরোধার্য করে নিয়েছে বাণিজ্যের তীব্র চাহিদায়। নয়ত আমানত ভাইয়ের মতো জাত শিল্পীরও কিনা জামানত জব্দ হয়ে গেল!

২০০২ কি ২০০৩ সালের আগে অবধি, কলকাতার নামি দামি প্রত্যেক সিনেমা হলের প্রবেশদ্বারের মাথায় পেল্লায় পেল্লায় হাতে আঁকা যে পোস্টার আর কাট আউটগুলো সিনেমা রিলিজের আগে জ্বলজ্বল করত, তার প্রায় সব ক'টারই জন্ম আমানত ভাইয়ের কলুটোলার স্টুডিওতে। ছোটখাট চেহারার এই বয়স্ক মানুষটির চওড়া কপালের ওপর, ব্যাকব্রাশ করা চুলের স্টাইল খানিকটা শচীন কত্তার মতো। বয়সের ভারে কিছুটা ঝুঁকে ঝুঁকে হাঁটার অভ্যাস। আর পরনের পোষাকে কিছু রঙের ছিটে কোথাও না কোথাও সব সময় লেগে থাকবেই। সাদা কালো ছবির স্বর্ণ যুগে উত্তম সুচিত্রা জুটির ছবি আঁকা দিয়ে তাঁর কেরিয়ার শুরু হয়েছিল। তারপর অনেকগুলো দশক পেরিয়ে এসে সত্তর প্লাস বয়সে তিনি বাঁশের ভারায় চড়া বাদ দিয়েছিলেন বটে। কিন্তু স্টুডির দেয়ালের দাঁড় করানো প্রকাণ্ড ফ্রেমের ক্যানভাসে তখনও অনায়াসে নিজের চেহারার চেয়েও বড় আকারে, প্রসেনজিৎ কিংবা জিৎ-এর মুখ নিখুঁতভাবে তেল রঙে ফুটিয়ে তুলতে পারতেন। আর তখন এইসব বড় ফরম্যাট পাবলিসিটি ডিজাইন হাতে এঁকে তৈরি করতে অনেকটা সময় লাগত বলে, তাঁর দরজায় এসে ছবি রিলিজের অনেক মাস আগেই লাইন দিতে হত সিনেমা পার্টিদের। কিন্তু যেদিন থেকে ফ্লেক্স প্রিন্টিং জাঁকিয়ে বসল, আমানাত ভাইয়ের স্টুডিওতে এসে বাসা বাঁধল খাঁ খাঁ শূন্যতা। হাতে আঁকা ছবির বদলে, তখন ফটো থেকেই বড় বড় ফ্লেক্স ডিজাইন ছাপা সম্ভব হয়ে গেছে, এবং সে জিনিস রাতারাতি ছেপে সিনেমা হলে টাঙ্গিয়ে দিলেই যখন ল্যাটা চুকে যায়, তবে কে আর যাবে আমানত ভাইয়ের কাছে? ফলে, জীবন্ত একটা কারবার অচিরেই লোপ পেয়ে গেল।

আমানত ভাইয়ের সাথেও অনেক বছর বাদে একবার রাস্তায় দেখা হয়েছিল। নানা কথার ফাঁকে একসময় সেই বৃদ্ধ বললেন, "আমার কারবার চলে গেল দুঃখ নেই। কিন্তু এখনকার ফিল্ম স্টারদের হাল দেখলে বড় দুঃখ লাগে জানেন। কোথায় সেই ক্রেজ? কোথায় সেই ফ্যান? ভেবে দেখুন, যাদের ছবি আমরা আঁকতাম তারাই কিন্তু এখন অবধি সত্যিকারের সিনেমা স্টার। তারা কেউ রোজগারের দরকারে জিন্দেগিতে কোনওদিন রেস্টুর‍্যান্টের বিজনেস করে নি বা মাচার শো-তে যায়নি। ওদের ওয়ার্ল্ডটা সাচ্চা সিনেমা ওয়ার্ল্ডের বাইরে আর কিছু ছিল কি, বলুন?"

অভিজিৎ সরকার

(ক্রমশ)

এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

General Rates for Display Ads (INR)

Full Page, Colour:15,000
Full Page, B/W: 9,000
Half Page, Colour: 8,000
Half Page, B/W: 6,000
Back Cover: 30,000
Front Inside Cover: 20,000
Back Inside Cover: 20,000
Double Spread: 30,000

Special Rates for Local Trade only

Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

Mechanical Details: Full Page Bleed {21cm (W) X 28 cm (H)}, Non Bleed {18cm (W) X 25 cm (H)}, Half Page Horizontal {18 cm (W) X 12 cm (H)}, Vertical {8.5 cm (W) X 25 cm (H)}, Strip Ad Vertical {5.6 cm (W) X 25 cm (H)}, Horizontal 18 cm (W) X 6.5 cm (H), 1/4 Page 8.5 cm (W) X 12 cm (H), 1/6 Page {5.75 cm (W) X 12.2 cm (H)}

Rates are effective from April 1, 2018 issue

বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩

উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

এখন ডুয়ার্স

দিনাজপুরের দিনকাল

কুলিকে আঙ্গিনায় ভিড় জমিয়েছে পরিযায়ী অতিথিরা

জুন মাসের মাঝামাঝি থেকেই উত্তর দিনাজপুরের আবহাওয়া বড্ড খামখেয়ালি হয়ে ওঠে - কখনও প্রখর রোদের দাপট তো আবার কখনও তুমুল বৃষ্টি। এমন আবহাওয়াতেই এখানকার বনাঞ্চলে আশ্রয় নিতে শুরু করে নানা প্রজাতির পরিযায়ী পাখিরা। উত্তর দিনাজপুর জেলা সদর রায়গঞ্জ শহর থেকে চার কিলোমিটার উত্তরে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে অবস্থিত রায়গঞ্জ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য বা কুলিক পক্ষীনিবাস। প্রতি বছরের মত এবারও ইচ্ছেডানায় ভর করে আসতে শুরু করেছে দূরদেশী পরিযায়ী পাখিরা, ইতিমধ্যেই যা ইঙ্গিত মিলেছে এবারও তৈরি হবে রেকর্ড। গবেষণায় দেখা যায় প্রায় ১৬৪ প্রজাতির পাখি আসে এখানে। ওপেনবিল স্টর্ক, ইগ্রেট, নাইট হেরন, করমোরেন্ট সহ নানা ধরনের পাখি কুলিক পক্ষী নিবাসে বছরের এই সময় থেকেই গড়ে তোলে তাদের অস্থায়ী ঠিকানা। আর মাছরাঙা, কাঠঠোকরা, বক, শামুকখোল, ফিঙে, পেঁচা এসব স্থায়ী বাসিন্দারা তো আছেই। বাস্তুতন্ত্রের নিয়ম মেনেআছে বন বিড়াল, শেয়াল, খরগোশ, নানা ধরনের সরীসৃপ, কীটপতঙ্গ। প্রতি বছর প্রায় ৭০-৮০ হাজার পরিযায়ী পাখি আসে কুলিকে। যার মধ্যে ওপেনবিল স্টর্ক প্রজাতির পাখিই আসে ৪৭-৪৮ হাজার। গতবছরই রায়গঞ্জের কুলিক পক্ষীনিবাস এশিয়ার বৃহত্তম ওপেন বিল স্টর্ক কলোনির স্বীকৃতি পেয়েছে। এর আগে লিমকা বুক অফ রেকর্ডসে কম্বোডিয়া প্রথম স্থানে ছিল। গতবছর তাকে পিছনে ফেলে কুলিক পক্ষীনিবাস প্রথম স্থান দখল করে। বিশ্বের দরবারে রায়গঞ্জের কুলিক পক্ষীনিবাসের এই খ্যাতি গর্বিত করেছে জেলা তথা উত্তরবঙ্গবাসীদের।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সামাজিক অরণ্যায়ন কর্মসূচীর অধীনে ১৯৭০ সাল থেকে তৎকালীন পশ্চিম দিনাজপুরের এই এলাকাটির বিকাশ ঘটানোর উদ্যোগ গৃহীত হয়। দফতরের উদ্যোগে ইউক্যালিপটাস, কদম, জারুল, শিশু, মেহগনি, জাম সহ নানা ধরনের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় পর্ণমোচি গাছ লাগানো হয় এলাকা জুড়ে। মানুষের হাতে তৈরি এই অরণ্যে আরও বেশি সংখ্যায় বিভিন্ন পরিযায়ী পাখির আনাগোনা শুরু হয়ে যায়। ১৯৮৫ সালে একে 'রায়গঞ্জ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য' বলে ঘোষণা করা হয়। এই বনাঞ্চলের পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে কুলিক নদী। এই নদীর নামানুসারে এটি কুলিক পক্ষীনিবাস নামে পরিচিত। ১৯৯২ সালের ১লা এপ্রিল পশ্চিম দিনাজপুর ভেঙে উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা গড়ে ওঠে। আর উত্তর দিনাজপুরের জেলা সদরের স্বীকৃতি পায় রায়গঞ্জ শহর। রায়গঞ্জের সোহারই, ভট্টদিঘি ও আবদুলঘাটা এই তিন মৌজার প্রায় ৩৭০ একর জায়গা জুড়ে কুলিক পক্ষীনিবাসটি গড়ে উঠেছে। অভয়ারণ্যের আয়তন ১.৩ বর্গ কিলোমিটার। দক্ষিণ ও পূর্ব সীমানা জুড়ে কুলিক নদীর অবস্থান। সাথে রয়েছে অসংখ্য ছোট-বড় খাল যা বর্ষাকালে জলমগ্ন হয়ে যায়। পাখিদের জন্য ছোটো ছোটো মাছ, অ্যাপেল স্নেল, কীটপতঙ্গ সহ নানা ধরনের খাদ্যের উৎসস্থল হয়ে ওঠে।

প্রতি বছর প্রায় ৭০-৮০ হাজার পরিযায়ী পাখি আসে কুলিকে। যার মধ্যে ওপেনবিল স্টর্ক প্রজাতির পাখিই আসে ৪৭-৪৮ হাজার। গতবছরই রায়গঞ্জের কুলিক পক্ষীনিবাস এশিয়ার বৃহত্তম ওপেন বিল স্টর্ক কলোনির স্বীকৃতি পেয়েছে। এর আগে লিমকা বুক অফ রেকর্ডসে কম্বোডিয়া প্রথম স্থানে ছিল। গতবছর তাকে পিছনে ফেলে কুলিক পক্ষীনিবাস প্রথম স্থান দখল করে। বিশ্বের দরবারে রায়গঞ্জের কুলিক পক্ষীনিবাসের এই খ্যাতি গর্বিত করেছে জেলা তথা উত্তরবঙ্গবাসীদের। পরিযায়ী পাখিরা এখন ঢুকে পড়েছে গ্রামবাসীর মনের আঙ্গিনাতেও।

বছর কয়েক আগে পরিযায়ীদের সংখ্যা হঠাৎ কমে যাওয়া দুশ্চিন্তায় ফেলেছিলো বনদপ্তরকে। এরপরই বনদপ্তর উদ্যোগী হয় পক্ষীনিবাসটি বাঁচাতে। জুলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার পক্ষে পক্ষীবিশেষজ্ঞ গোপীনাথন মহেশ্বরণ কুলিকে এসে গবেষণা করেন ও পরিযায়ী পাখি কমে যাওয়ার বেশ কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেন। সেই সকল দিক মেনে বন দফতর পাখিদের খাদ্যসংস্থান সুনিশ্চিত করতে খনন করে স্বল্প গভীরতার বেশ কয়েকটি জলাশয়। পক্ষীনিবাসের নিরিবিলি পরিবেশ বজায় রাখতে বনাঞ্চল সংলগ্ন জাতীয় সড়ককে সাইলেন্স জোন ঘোষণা করা হয়। পরিযায়ী পাখি শিকার রোধ করতে ঘিরে ফেলা হয় গোটা পক্ষীনিবাসের সীমানা। আর তারপর থেকেই পরিযায়ী পাখীদের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়ে। কুলিক নদীর দূষণ রোধ ও পরিযায়ী পাখীদের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখলেই বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা ধরে রাখতে পারবে পক্ষীনিবাসটি। তাই উত্তরবঙ্গের গর্ব এই কুলিক পক্ষীনিবাস সংরক্ষণে সচেতন হতে হবে সকলকেই। আর যান্ত্রিক জীবনযাত্রা থেকে কিছুটা বিরতি নিয়ে প্রকৃতির সান্নিধ্যে নিজেকে খুঁজে পেতে বছরের এই সময়টাতে উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ কুলিক পক্ষীনিবাস একটি উল্লেখযোগ্য ঠিকানা বইকি।

পক্ষীনিবাসের খুব কাছেই ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক। কিন্তু শহরের শোরগোল থেকে দূরে নিজেদের মত করেই ঘর বাধে এই পরিযায়ীরা। শুধু তাই নয়, এই বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকা এমনকি আশেপাশের কয়েক কিলোমিটারের মধ্যে লোকালয়ের গাছগুলি জুড়েও

কুলিক পক্ষীনিবাসের রাস্তায়

বাসা তৈরি করে এরা। হাজার হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে এই পরিযায়ীরা এখানে এসে খড়কুটো সংগ্রহ করে। ইউক্যালিপটাস, জারুল সহ বনাঞ্চলের গাছগুলি জুড়ে তৈরি করে বাসা। পক্ষীনিবাসে ঢুকতেই ওয়াচ টাওয়ারটিতে উঠলে খুব কাছ থেকে তাদের জীবনশৈলী দেখা যাবে। সুদূর বিস্তৃত বনাঞ্চল জুড়ে শুধুই রকমারি পরিযায়ীর দল। সবুজ গাছগাছালির যতদূর চোখ যায় মনে হবে যেন গুড়ো গুড়ো সাদা রঙ ছড়িয়ে দিয়েছে কেউ। ঘর বানানোর প্রক্রিয়া শেষ হলে ডিম দেওয়া, তারপর ডিম ফুটে বেরনো পরিবারের নতুন সদস্যদের নিয়ে ব্যস্ততা, সারাদিন ঘুরে কুলিক নদী ও আশপাশের জলাশয় থেকে তাদের জন্য ছোটো মাছ, পোকামাকড় সংগ্রহ করা, বাচ্চাদের খাওয়ানো, ঝড়বৃষ্টি থেকে আগলে রাখা, বড় করা — পাখিপ্রেমীদের আনাগোনা এসময়টা তুঙ্গে ওঠে তো বটেই, সেই সঙ্গে পুজোর মরসুমে সাধারণ পর্যটকদের জন্যও যথেষ্ট উপভোগ্য হয়ে ওঠে কুলিক। এসময়ই বাচ্চাদের উড়তে শেখায় মায়েরা। এরপর নভেম্বর- ডিসেম্বর নাগাদ নিজেদের পুরনো ঠিকানায় ফিরে যেতে শুরু করে ওরা। দলে দলে বাসা খালি করে উড়ে যেতে থাকে, বড় বড় গাছেদের ডালে ডালে পড়ে থাকে ওদের ফেলে যাওয়া চিহ্ন। এই ওদের নিয়মবাধা জীবনচক্র। প্রতিবছর পরিযায়ীদের জীবনের এই সময়টা কাটে কুলিক পক্ষীনিবাসে। অনুকূল জলবায়ু ও প্রজননের উপযুক্ত বলেই চেনা ঠিকানায় পরের বার ফিরে ফিরে আসে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ওদের প্রিয় আবাসে। আর ওদের অপেক্ষাতেই যেন বসে থাকি আমরা।

বর্তমানে কুলিক নদীর নাব্যতা কমে যাওয়ায় চিন্তিত পরিবেশপ্রেমীরা। জেলা প্রশাসন ও বহু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কুলিকের নাব্যতা বাড়াতে উদ্যোগী হয়েছেন। গতবছরের বন্যার পর রায়গঞ্জের বিভাগীয় বনদপ্তরের উদ্যোগে কুলিক পক্ষীনিবাস সংস্কারের কাজ শুরু হয়। সুদৃশ্য প্রবেশদ্বার বানানোর কাজ চলছে জোর কদমে। জেলার মূল পর্যটন কেন্দ্রটি সাজাতে ও আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে ডিয়ারপার্ক, অ্যাকুয়ারিয়াম গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে বসানো হয়েছে কুলিক পক্ষীনিবাসের নবজীবন প্রকল্পের প্রতীকচিহ্ন। বনাধিকারিক দ্বীপর্ণ কুমার দত্ত জেলায় কুলিক পক্ষীনিবাসকে ঘিরে পর্যটন শিল্পের প্রসার ঘটানোর নানা উদ্যোগ নেন।পক্ষীনিবাসের প্রবেশদ্বারের ঠিক উলটো দিকেই জাতীয় সড়কের ধারে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গ পর্যটনের ট্যুরিস্ট লজ। বনাঞ্চলে প্রকৃতি ও পাখিদের কলতানের মাঝেই ছুটি কাটানোর আদর্শ জায়গা এই ট্যুরিস্ট লজটি। কলকাতা থেকে যার দূরত্ব প্রায় ৪২৫ কিলোমিটার এবং উত্তরবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র শিলিগুড়ি শহর থেকে প্রায় ১৮১ কিলোমিটার। কর্মব্যস্ত জীবন থেকে কিছুটা সময় বের করে প্রকৃতির সান্নিধ্য পেতে তাই একবার ঘুরে যেতেই পারেন উত্তরদিনাজপুরের এই পক্ষীনিবাস থেকে। বিশেষ করে বিশ্বের বৃহত্তম পক্ষীনিবাসের শিরোপা পেতেই উৎসুক পর্যটকদের সংখ্যাও বাড়ছে।

পরিযায়ীদের প্রিয় গ্রাম আঙ্গিনা

কুলিকের পাশাপাশি দক্ষিণ দিনাজপুরের আঙ্গিনাতেও আসতে শুরু করেছে একই প্রজাতির পরিযায়ীর দল, যেমন প্রত্যেকবার আসে। বালুরঘাট পৌঁছবার কুড়ি কিলোমিটার আগেই পড়বে এই পাখি গ্রাম। কুলিকের মত কোনও স্যাংচুয়ারি নয়, পাখিরা এখানে এসে বাসা বাঁধে জনবসতির মধ্যে, বড় বড় গাছের ডালে। মানুষে সাহচর্যে ভালবাসায় কেটে যায় কয়েকটি মাস। বেশ কিছু বছর ধরেই ওরা আসছে এখানে, কয়েকটা মাস থেকে বাচ্চা বড় হয়ে উড়তে শিখলেই ওরা উড়ে চলে যায়, পরের বছর ফের আসবার প্রতিশ্রুতিতে। জানালেন গ্রামের বিশ্বজিৎ বসাক, গত বেশ কয়েক বছর ধরে যিনি আঙ্গিনার এই পাখি গ্রামকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ দিনাজপুরের ইকো-পর্যটন সার্কিট গড়ে তোলার নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। বিশ্বজিৎবাবুই বললেন, পরিযায়ী পাখিরা এখন ঢুকে পড়েছে গ্রামবাসীর মনের আঙ্গিনাতেও। এই ক'টা মাস অতিথিদের মতই ওদের দেখভাল করেন গাঁয়ের মানুষ, তাঁদের উদ্যোগেই তৈরি হয়েছে আঙ্গিনা বার্ড অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশন সমিতি। বিশেষ করে গ্রামের বাচ্চাদের উদ্দীপনা থাকে চোখে পড়বার মত। ডিম ফুটে বাচ্চারা প্রথমেই তো আর উড়তে শেখে না, ফলে প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে গাছের উপর থেকে পড়ে যায় বহু বাচ্চা পাখি। তাদের বেশির ভাগই মারা যায়, যেগুলি বেঁচে থাকে তাদের মায়েদের আলাদা করে চিহ্নিত করা যায় না। গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খালবিল থেকে গেঁড়ি-গুগলি নিয়ে এসে খাওয়ায় তাদের, মায়ের পুরনো শাড়ির আঁচল ছিঁড়ে এনে বেঁধে দেয় তাদের ভাঙা পা বা ডানা, মানব শিশুদের নিরন্তর শুশ্রূষায় সুস্থ হয়ে বড় হয়ে ওঠে শিশু পাখিরা। পুজোর আগে বা পরে পরিযায়ীদের দল উড়ে গেলে সবচেয়ে বেশি মন খারাপ হয় ছোটদেরই।

কুলিক পক্ষীনিবাস, ছবি উতঙ্ক দে

ডিম ফুটে বাচ্চারা প্রথমেই তো আর উড়তে শেখে না, ফলে প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে গাছের উপর থেকে পড়ে যায় বহু বাচ্চা পাখি। তাদের বেশির ভাগই মারা যায়, যেগুলি বেঁচে থাকে তাদের মায়েদের আলাদা করে চিহ্নিত করা যায় না। গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খালবিল থেকে গেঁড়ি-গুগলি নিয়ে এসে খাওয়ায় তাদের, মায়ের পুরনো শাড়ির আঁচল ছিঁড়ে এনে বেঁধে দেয় তাদের ভাঙা পা বা ডানা

বিশ্বজিৎবাবুরা ইতিমধ্যেই চালু করেছেন ইকো প্যাকেজ ট্যুর (যোগাযোগ ৯৪৭৬৩৭৯৫৮১)। উৎসাহী মানুষ আঙ্গিনার সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারবেন অজানা দক্ষিণ দিনাজপুরকেও। পাখিপ্রেমী বা পর্যটনপ্রেমী মানুষ যে সাড়া দিচ্ছেন না তা নয়, কোনও কোনও মরসুমে বেশ ভালই হচ্ছে বলতে হবে। কিন্তু একটি পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তুলতে গেলে প্রয়োজন যে সরকারি সহযোগিতার সে অভাব রয়েই গিয়েছে। তবু আশায় কাজ করে চলেছেন তাঁরা, পাখিদের ভালবেসে, নিজের মাটিকে ভালবেসে ইকোপর্যটনের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। বিশ্বজিৎবাবুর কথায়, যতদিন পরিযায়ীরা ফিরে ফিরে আসবে ততদিনই বেঁচে থাকবে আমাদের আশা।

অপরাজিতা জোয়ারদার

শুকনো ডালের ভাস্কর

তাঁর খবর জানে কোচবিহারের কয়জনা?

কোচবিহারের কড়চা

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

ডুয়ার্স তাঁকে হাতছানি দেয়, তোর্সা তাঁকে ডাকে। তাঁর ভালবাসার আকর যে ওখানেই রয়েছে। আপাত চোখে যা অর্থহীন, কোচবিহারের উৎপল কুমার চক্রবর্তীর কাছে তার মূল্য অপরিসীম। সেই আকরের সন্ধানে একটু সুযোগ পেলেই তাঁকে দেখা যায় ডুয়ার্সের জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরতে বা নদীর পাড় ধরে হাঁটতে। এই পথচলার মাঝে যদি হঠাৎ পাওয়া যায় কোনও শুকনো ডাল, যদি ভেসে আসে কোনও কাঠের গুঁড়ি বা শেকড়— তখন তাঁর আনন্দের সীমা থাকে না কোনও। তারপর বাড়িতে এসে সেগুলো দিয়ে তৈরি হয় এক আশ্চর্য শিল্পকর্ম, যার পোশাকি নাম 'কাটুম কুটুম'।

বাড়ির পেছনের দিকের পুরনো রান্নাঘরটাকে বানিয়ে নিয়েছেন স্টুডিও। তাঁর একান্ত নিজস্ব জগৎ। সেখানেই এখন দিনের অনেকটা সময় কাটে নিজস্ব সৃষ্টির সঙ্গে। সরঞ্জাম বলতে হাতুড়ি, বাটালি, ফাইলার আর শিরিষ কাগজ। এগুলোর সাহায্যেই গাছের ডাল আর গাছের শেকড় থেকে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে সৃষ্টি করে চলেছেন একের পর এক অভিনব শিল্পকর্মের। তার হাতে সাধারণ ডাল বা শেকড় যেন বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। পথিকৃত নিঃসন্দেহে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কুটুম কাটাম'। তবে উৎপলবাবুর 'কাটুম কুটুম'-এর অভিনবত্ব হল, তাঁর তৈরি মডেলগুলোতে কোথাও কোনও রকম জোড়া দেওয়া হয় না। গোটা বিষয়টি তৈরি হয় একটি মাত্র ডাল বা শেকড় দিয়ে।

শিবশঙ্কর দে-র করা ডাকহরকরা

সদ্য স্কুলের চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন উৎপলবাবু। হাতে এখন অফুরন্ত সময়। তাই আরও বেশি মেতে উঠেছেন কাটুম কুটুম নিয়ে। তবে এই শিল্পের শুরুটা কিন্তু ছিল নেহাতই কাকতালীয়। সেটা ১৯৯৩ কি ৯৪ সালের কথা। স্কুলে ইতিহাসের ক্লাস নিচ্ছিলেন তিনি। পড়াতে পড়াতে হঠাৎই চোখ চলে গেল পেছনের বেঞ্চে। দেখলেন পড়ানো না শুনে একটি ছাত্র গাছের একটুকুরো ডাল নিয়ে একমনে নাড়াচাড়া করে যাচ্ছে। ক্লাসে এতটুকুও মন নেই তার। কিছুক্ষণ ব্যাপারটা লক্ষ্য করে হঠাৎই মাথাটা গরম হয়ে গেল শিক্ষক মশাইয়ের। 'ক্লাসে মন না দিয়ে খেলা হচ্ছে?' বলে ছাত্রের হাতের থেকে ডালটা নিয়ে একেবারে ক্লাসের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তিনি। ছাত্রটি ঘটনার আকস্মিকতা কাটিয়ে উঠে রাগত স্বরে বলল, 'এ কি করলেন স্যার? ফেলে দিলেন? অবশ্য এইসব গাছের ডালের মর্ম আপনি কি বুঝবেন?'— কথাটা যেন কোথায় গিয়ে লাগল উৎপলবাবুর। সেদিনের মতো আর ক্লাস নেওয়া হল না তার। একসময় মাঠের থেকে ওই ডালটা কুড়িয়ে এনে টিচার্স রুমে বসে অনেকক্ষণ তাকে দেখতে লাগলেন। ইতিমধ্যে বার কয়েক রাজু (কালী) নামের ওই ছাত্রটি ডাল ফেরৎ নেওয়ার জন্য স্যারের কাছে এসে অনুরোধ করলেও উৎপলবাবু সেটি ফেরত দেননি। উলটে বলেন, দেখি আমি কিছু বানাতে পারি নাকি এটা দিয়ে। বাড়ি ফিরে আসার পরেও 'আপনি এর মর্ম কি বুঝবেন স্যার' কথাটা তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল। সে দিন থেকেই শুরু। সত্যিই সেই ডালটা দিয়ে ছোট্ট একটা মডেল তৈরি করেছিলেন। যা আজও খুব যত্ন করে রেখে দিয়েছেন তিনি। পরে কালীকে মডেলটা দেখিয়েও ছিলেন। সেই ঘটনার ২৫ বছর পরেও উৎপলবাবুর অকপট স্বীকারোক্তি, এই শিল্পকর্মতে সেই ছাত্র কালীই আমার প্রেরণা।

উৎপল কুমার চক্রবর্তী, বাঁ দিকে

অথচ উৎপলবাবুর এক বন্ধুই অনেক বছর ধরে এরকম গাছের ডাল, গাছের শেকড় দিয়ে বেশ ছোট ছোট মডেল বানাতেন। এসব জিনিস সংগ্রহ করার জন্য অনেক সময় ওই বন্ধুর সঙ্গে বিভিন্ন জঙ্গলে বহুবার সঙ্গীও হয়েছেন তিনি। কিন্তু কোনও দিনই একবারের জন্যও এই মডেল বানানো তাকে টানেনি। আর সেদিনের স্কুলের সেই ঘটনাটা অদ্ভুতভাবে তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। জীবনে প্রথমবার একটা শুকনো নিরীহ গাছের ডালকে প্রাণ দিয়ে উৎপলবাবু খোঁজ পেলেন এক গভীর শিল্প জগতের।

স্কুল, সংসার সব দায়িত্ব সামলে যতটুকু সময় পাওয়া যেত তিনি মগ্ন থাকতেন এই কাজে। ধীরে ধীরে অনেক ডাল প্রাণ পেল তার হাতে। কিন্তু দুঃখ একটাই দর্শক কোথায়? উৎসাহ দেবার লোক কোথায়? স্কুলের একটা অনুষ্ঠানে প্রথম নিজের বানানো মডেল প্রদর্শীত করলেন। অনেক সময় বিভিন্ন পুজো মন্ডপে সাজিয়ে রাখতেন তার কাটুম কুটুম। যাতে একবারে অনেক মানুষের নজরে আসে তার সৃষ্টি। এভাবেই কেটে গেল প্রায় ২০টা বছর। অনেক চেষ্টায় ২০১৩ সালে কলকাতার একাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এ ব্যবস্থা করলেন একক প্রদর্শনীর। ১৯৫৭ সালে জন্ম হওয়া কলা একাডেমি এ জিনিস এই প্রথম দেখল। সেবার প্রচুর কলাপ্রেমী মানুষের প্রশংসা পেয়েছিলেন তিনি। সকলের মুখে ছিল একটাই কথা— অভিনব। এই প্রশংসা উৎপলবাবুর মনের খিদে যেন আরও বাড়িয়ে দিল। এবারের লক্ষ্য দিল্লির ললিত কলা একাডেমি। সেই সুযোগও এসে গেল ২০১৫ সালে। এত দূরে মডেলগুলো নিয়ে যাওয়া চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। আর সব নিয়ে যাওয়া আসা করাও সম্ভব নয়। তাই দিল্লিতে তার সমস্ত কাজ নিয়ে যেতে পারেননি। এরপর ২০১৭ তে যোগ দিলেন আই সি সি আর গ্রুপ শো-তে। সে বছরই কলকাতা একাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এ একক প্রদর্শনী করলেন আবার। শিল্পী মহলে ধীরে ধীরে পরিচিতি বাড়তে লাগল। এ বছরেরই ১৯-২৩ মার্চ গোয়া পাঞ্জিমের কলা একাডেমিতে সাত দিনের একটি শিল্প প্রদর্শনী ছিল। এতে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত— দিল্লি, ছত্তিশগড়, পাঞ্জাব, কর্নাটিক, বিহার, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও গোয়ার শিল্পীরা অংশ নিয়েছিলেন। 'ইটার্নাল স্প্রিং' নামক ওই প্রদর্শনীতে পশ্চিমবঙ্গ থেকে কাটুম কুটুম নিয়ে যাওয়ার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন উৎপল চক্রবর্তী। অসাধারণ সেই অভিজ্ঞতা, জানালেন শিল্পী নিজে।

'খুব ইচ্ছে বিদেশে যাই, শিল্পের পীঠস্থান ইতালি, ভেনিস এসব জায়গায় নিজের শিল্পকে দেখাই। বিদেশে প্রদর্শনী করার আমন্ত্রণ আছে ঠিকই কিন্তু তাতে অনেক খরচ।' তাই এই স্বপ্ন আদৌ পূর্ণ হবে কি না জানা নেই উৎপলবাবুর। এতক্ষণে এই একবারই তার চোখে দেখা গেল যন্ত্রণার আভাস। কোনও প্রচার নেই, নেই কোনও স্পন্সর। বিদেশে যাওয়ার জন্য আর্থিক সহায়তা করার মতো শিল্পপ্রেমী মানুষও মেলে নেই। তবুও নিজের স্টুডিওতে সৃষ্টির তাগিদে বুঁদ হয়ে আছেন তাঁর একান্ত 'কাটুম কুটুম' নিয়ে।

রাজনগর কোচবিহার তার প্রান্তিক অবস্থান সত্ত্বেও শিল্প-সংস্কৃতির চর্চায় একসময় পিছিয়ে ছিল না। শিল্প,

সাহিত্য, চারুকলা সবদিক থেকেই তৎকালীন কোচবিহার রাজ্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল। রাজাদের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের প্রতি অনুরাগের বড় প্রমাণ কোচবিহার রাজপ্রাসাদ। ইংরেজদের তৈরি করা, কিন্তু শিল্পকর্ম অসাধারণ। শুধু তাই নয়, কোচবিহারের বিভিন্ন প্রান্তে যত ঐতিহ্যের নিদর্শন আছে প্রতিটিই সেই অপূর্ব ভাস্কর্যের সাক্ষ্য বহন করে। মদনমোহন বাড়ির ভেতরে যে দুটি ফ্লাওয়ার ভাস রয়েছে, আগে সেগুলোই রাজবাড়ির ভেতরে ছিল। বিদেশ থেকে আনা ভাস দুটি ভাস্কর্য শিল্পের প্রতি অনুরাগেই নিদর্শন। এসব ক্ষেত্রে স্থানীয় শিল্পীদের কোনও ভূমিকা না থাকলেও সেই আমলে কী তারও আগে স্থানীয় শিল্পীরা পাথরের ওপর বিভিন্ন মূর্তি খোদাই করত বলে অনেকের ধারণা। গোসানিমারির কামতেশ্বর গড় থেকে যে সব পাথরের মূর্তি পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে বেশ কিছু মূর্তির কাজ তেমন নিখুঁত নয়। সেই মূর্তিগুলো স্থানীয় শিল্পীদের তৈরি করা বলেও অনেকের অনুমান। যদিও এর সত্যতা সম্পর্কে যথেষ্ট প্রমাণ মেলেনি।

কোচবিহারে রাজ আমলের শেষের দিকে একজন শিল্পীর কথা জানা যায়, তিনি হলেন ভুকু সাহেব, পোষাকি নাম কুমার কুলেন্দ্র নারায়ণ। মূলত রাজপ্রাসাদের চিত্রশিল্পী হলেও তিনি ভাস্কর্যও করতেন। স্টেট ট্রান্সপোর্টের উল্টো দিকে (পশ্চিম দিকে) বাসুদেব ফার্মেসির ওখানে অনেক বছর আগে 'কাফে ডি হুলু' নামে একটি আধুনিক রেস্তোরাঁ ছিল। সম্ভবত সেটিই কোচবিহারের প্রথম কফি শপ। রেস্তোরাঁটির মালিক ছিলেন এই ভুকু সাহেব। সেই শপে ঢোকার মুখে দু'দিকে দুটি কংক্রিটের সিংহের মূর্তি রাখা থাকত। সেই সিংহ দুটির কারিগর কিন্তু ছিলেন ভুকু সাহেব নিজে।

ষাটের দশকে ভাস্কর্য তৈরির ক্ষেত্রে আর একজনের নাম জানা যায়, তিনি হলেন শিবশংকর দে সরকার। কোচবিহার বড় পোস্ট অফিসের পিছনে পলাশ বাড়ি রোডে ছিল তাঁর বাড়ি। সুইডিশ মিশন ইনস্টিটিউশনের (বর্তমানে মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ উচ্চ বিদ্যালয়) ছাত্র ছিলেন তিনি। আগ্রহ ছিল ভাস্কর্য শিল্পের প্রতি। প্লাস্টার অফ প্যারিস, লোহা ইত্যাদি বিভিন্ন জিনিস দিয়ে তৈরি হত তার অসামান্য শিল্পকর্ম। তার তৈরি করে উপহার দেওয়া ডাকহরকরা আজও কোচবিহারের একটি বাড়িতে সযত্নে রক্ষিত আছে।

হয়ত আরও অনেক প্রতিভাধর মানুষ ছিলেন এখানে, হয়ত আরও অনেক ভাস্কর সঠিক উৎসাহ বা সুযোগের অভাবে বেড়ে উঠতে পারে নি, সেসব খবর রাখবার কোনও তাগিদই বোধ করে নি কেউ। যেমন এই প্রজন্ম জানলই না প্রাচীন আরও একটি শিল্পের নাম তা হল লিনোকাট। লেটার প্রেসের যুগে লিনোলিয়াম নামে রাবারের মত এক ধরনের শিট কেটে ছাপার জন্য যে শিল্প তৈরি হত তার চলতি নামই ছিল লিনোকাট। কোচবিহারে লিনোকাটে অসাধারণ সব ছবি তৈরি করতেন পবিত্র কুমার দাস। সে সময় যাবতীয় বই বা পত্রপত্রিকার প্রচ্ছদ বা ইলাস্ট্রেশনের ছবি ছাপা হত লিনোকাট থেকেই।

এখন সেই শহরের স্মৃতিতে পুরানো ঘিয়ের গন্ধ শুধু, ঝুলিভর্তি ধুলো ছাড়া কিছু নেই। এ শহরের প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন মূর্তি উধাও হয়ে যায় বেমালুম, রাজবাড়ির সম্পদ শোভা পায় কোনও অনাকাঙ্খিত ড্রয়িংরুমে, এ শহরের গর্ব অমিয়ভূষণ মজুমদার শতবর্ষেও কলকে পান না, এ শহরে পশ্চিমবঙ্গের রূপকারকে হেলায় নামিয়ে আনা হয় স্থানীয় পুরপ্রধানের সমমর্যাদায়। আজ পুরবাসীরাই স্বীকার করেন নির্দ্বিধায়, বছরের পর বছর জমে থাকা নর্দমার পাঁকের মতই এ শহর আজ লজ্জাহীন বিকারহীন সৌন্দর্যহীন যেন কোনও ডাইনোর গলিত বিকৃত শব। যেমন দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে নিভৃত কোনে শিল্পসাধনা করে চলেছেন উৎপলবাবু, জাতীয় স্তরে বহুবার স্বীকৃত প্রশংসিত হয়েছে তাঁর এই নান্দনিক শিল্পকর্ম। সেসব খবর এই শহরের রাখতে বয়েই গেল!

পঁচিশ বছর পেরিয়ে প্রশ্ন তিনবিঘার
পর্যটন নাকি পাচার ? কোনটা বেছে নেওয়ার ?

কোচবিহারের কড়চা

দেবব্রত চাকী

২৫ বছরেরও বেশি আগের সময়কার কথা। সারা দেশ তো বটেই, বিশ্বের তামাম সংবাদ মাধ্যমের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল একটি সীমান্তবর্তী প্রান্তিক এলাকার ওপর। রাতারাতি তা উঠে এসেছিল সংবাদের শিরোনামে। তিনবিঘা, চার অক্ষরের এই নামটি রাতারাতি হয়েছিল বিখ্যাত। সেই সময়কালে দেওয়ালে দেওয়ালে লেখা হত স্লোগান, 'আসুক লাঠি গুলির ঘা, তবু দেব না তিনবিঘা'। প্রান্ত উত্তরবঙ্গের এক উত্তাল গণ-আন্দোলনের পরিচয় ছিল 'তিনবিঘা আন্দোলন' হিসাবে। তিন তিনটি প্রাণ ঝড়ে পড়েছিল দুই পর্বে এই আন্দোলনে। ১৯৮১ সালে দহগ্রাম ও আঙ্গারপোতা নামক ভারতের কোচবিহার জেলার অভ্যন্তরে দুটি বাংলাদেশী ছিটমহলে জনগণনাকে কেন্দ্র করে প্রতিবাদ আন্দোলনে শহীদ হয়েছিলেন সুধীর রায়। এর প্রায় ১১ বছর পর ১৯৯২ সালে তিনবিঘা হস্তান্তর পর্বে এক উত্তাল পরিস্থিতিতে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান ক্ষিতেন অধিকারী ও জিতেন রায় নামে দুই যুবক। সেই সময়কালে তিনবিঘা প্রতিরোধ আন্দোলনে গড়ে উঠেছিল কুচলিবাড়ি সংগ্রাম কমিটি ও তিনবিঘা সংগ্রাম কমিটি নামে দুটি সংগঠন। এই দুটি সংগঠনের তীব্র গণ-আন্দোলনের মুখে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার পুলিশ ও আধা সেনা নামিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিয়ে ১৯৯২ সালের ২৬ জুন তিনবিঘা কড়িডর লিজ কার্যকর করেছিল। অর্থাৎ দহগ্রাম ও আঙ্গারপোতা নামক দুটি ছিটমহল তিনবিঘা করিডরের সাহায্যে বাংলাদেশের মূল ভূ-খণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল।

এই সময়কালে তিস্তা দিয়ে বহু জল গড়িয়ে গেছে। তিনবিঘা আজ পর্যটন ক্ষেত্র। আন্তর্জাতিক করিডরের মান্যতাপ্রাপ্ত ১৭৮ বাই ৮৫ বর্গ মিটার আয়তনের এই করিডর দিয়ে দিনরাত ২৪ ঘণ্টা বাংলাদেশের লোকজন পূর্ব-পশ্চিমগামী সড়ক ব্যবহার করে চলাচল করছে। পক্ষান্তরে করিডরের উত্তর-দক্ষিণগামী সড়ক ব্যবহার করে ভারতের কুচলিবাড়ি অঞ্চলের বাসিন্দারা মেখলিগঞ্জের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছে। করিডরের চার কোণে উড়ছে চারটি ভারতীয় পতাকা। প্রত্যহ পতাকা উত্তোলন ও নামানো পর্বটি বেশ আকর্ষণীয়। ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী পূর্ণ যত্নসহকারে কাজটি করে থাকেন। আপাত দৃষ্টিতে তিনবিঘা কড়িডর সীমান্ত পর্যটনের এক উজ্জ্বল ক্ষেত্র বিশেষ। সারাদিন বহু পর্যটক তিনবিঘা করিডর পরিদর্শন করে দুটি রাষ্ট্রের সান্নিধ্য উপভোগ করেন। তিনবিঘার ভৌগোলিক পরিবেশ বেশ মনোরম। যাতায়াতের পথে বাংলাদেশ দর্শন, সীমান্তরক্ষী বাহিনীর একাধিক সীমান্ত চৌকী এই পর্বে দ্রষ্টব্য বিশেষ।

এত গেল মুদ্রার এক পিঠ, অন্য পিঠের চিত্রটি কী? প্রশ্ন করেছিলাম একসময়ের উত্তাল গণ-আন্দোলন পর্বে নেতৃত্ব প্রদানকারী কুচলিবাড়ি সংগ্রাম কমিটির সাধারম সম্পাদক গিরিনাথ রায়কে। কোচবিহার শহরের দেবীবাড়িতে নিজ বাসভবনে বসে ভারতীয় জীবনবিমা দপ্তরের কর্মী গিরিনাথবাবু প্রশ্নের উত্তরে কিন্তু তাঁর হতাশা গোপন করেন নি। তিনবিঘা হস্তান্তর পর্বে বহু প্রতিশ্রুতি ছিল, কিন্তু সেগুলি কতটা রক্ষিত হয়েছে সেটাও এই মুহূর্তে বড় প্রশ্ন! কুচলিবাড়িতে হাসপাতাল তৈরি হয়েছে কিন্তু চিকিৎসা পরিষেবা কতটা মেলে? মেয়েদের জন্য হাইস্কুল আজও অধরা। তিনবিঘা পর্যটন কেন্দ্র ঢাকঢোল পিটিয়ে যতটা প্রচার হল পরিকাঠামো ততটা গড়ে উঠল কি? তিনবিঘা হস্তান্তর পর্বে দহগ্রাম-আঙ্গারপোতা থেকে গুটিকয়েক পরিবার ব্যতিত প্রায় চারশত হিন্দু পরিবার জীবন-সম্ভ্রম বাঁচাতে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কপালে উদ্বাস্তুর তিলক পড়ে তারা ডাঙ্গারহাট, মেখলিগঞ্জ শহরের সরকার পাড়া, ধূপগুড়ি, গাদং, ময়নাগুড়ি ইত্যাদি জনপদে নতুন করে জীবন সংগ্রাম শুরু করেছিলেন— তাদের প্রতি সরকার কোনও দায়িত্ব পালন করেছে কি? কেন কুচলিবাড়ির মানুষ অন্যত্র চলে যাচ্ছে— এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজবার চেষ্টা করেছে কি কেউ? গিরিনাথবাবু গলায় আক্ষেপ ঝড়ে

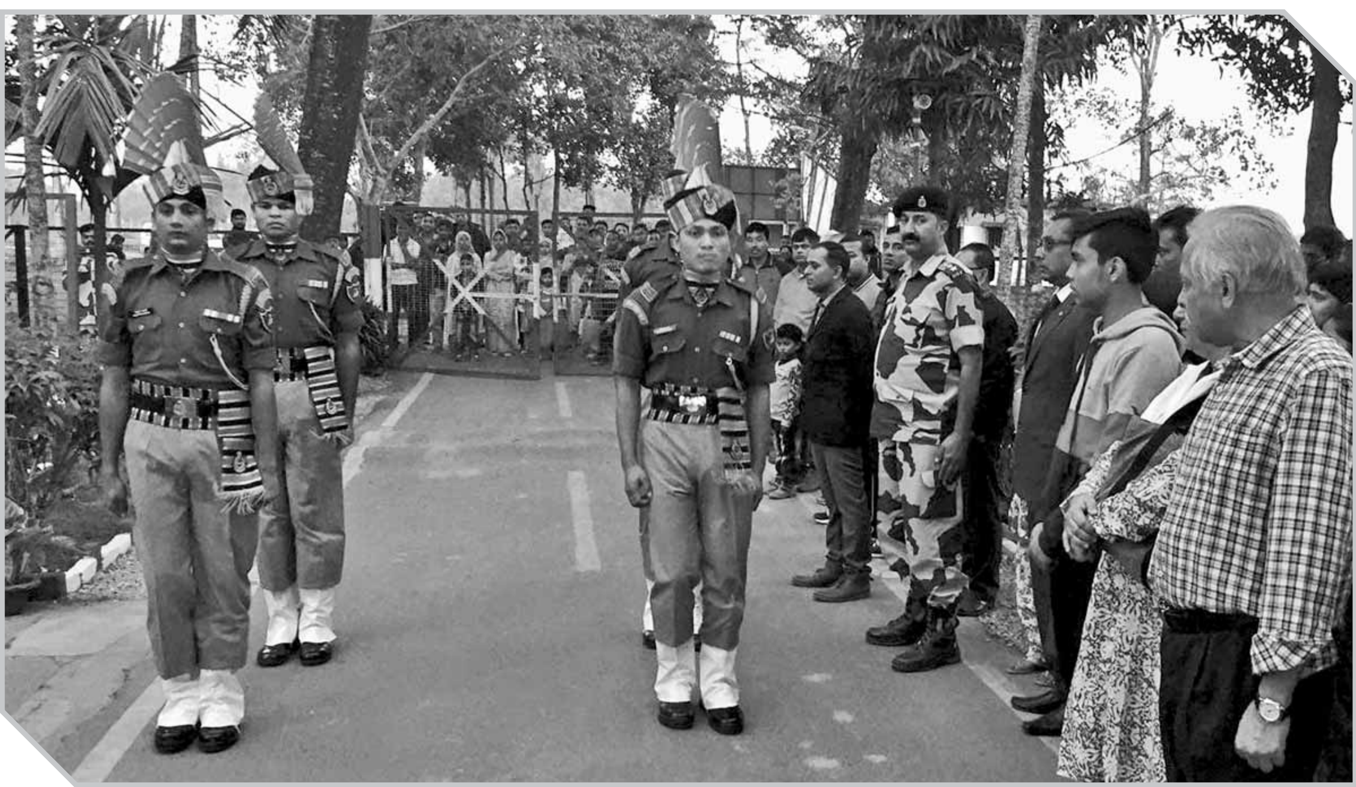

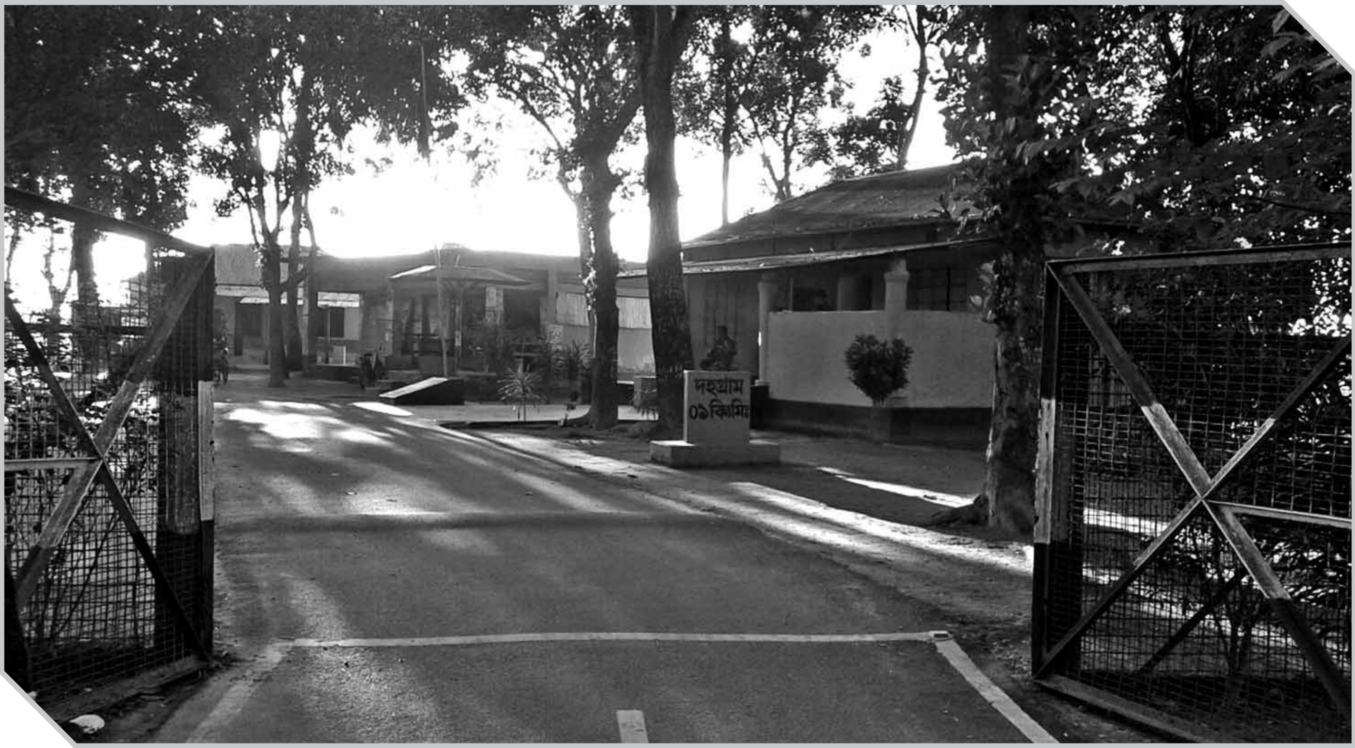

পড়ছিল। শহীদ ক্ষিতেন অধিকারী ও সুধীর রায়ের পুত্রদের কথা কেউ মনে রাখল না। তাদের কর্মসংস্থানের বিষয়ে কোনওপক্ষই প্রয়াসী হল না— এই হতাশা গোপন করব কী করে? স্পষ্ট উত্তর গিরিনাথবাবুর। তবে যাট ছুঁই ছুঁই গিরিনাথবাবু এখনই হাল ছাড়তে রাজি নন। ছিটমহল বিনিময় যখন কার্যকরী হয়েছে তখন দহগ্রাম-আঙ্গারপোতা ছিটমহল হিসাবে থাকবে কেন? তাঁর দাবি তিনবিঘা করিডর তুলে দিয়ে দহগ্রাম-আঙ্গারপোতাকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করা হোক। কেননা তাঁর মতে, দহগ্রাম এই মুহূর্তে হয়ে উঠেছে পাচারকারীদের স্বর্গরাজ্য, অপরাধীদের ভারতে প্রবেশের করিডর, যা সরকার বা সংবাদ মাধ্যম কারুরই অজানা নয়। অতএব সমস্ত বিষয়টি নতুন করে পর্যালোচনা হোক— এটাই চান গিরিনাথ রায় তথা কুচলিবাড়ি সংগ্রাম কমিটি।

সময় গড়িয়ে গেছে অনেকটাই। প্রেক্ষাপট ক্রমশ বদলে যাচ্ছে। ভোগবাদ সকল মৌলিক ভাবনাকেই করে তুলছে স্থূল। গভীর ভাবনা ভাববার লোক-ই বা কোথায়? তবে সমাজ চলছে, সমাজ চলবে! এর মধ্যে দাবি উঠেছে তিনবিঘার আকর্ষণ বাড়াতে পশ্চিমের ওয়াগা সীমান্তের অনুকরণে সেজে উঠুক এই আন্তর্জাতিক করিডরটি। বিএসএফ-এর প্যারেড দেখতে ভীড় জমাক আমজনতা।

গিরিনাথ রায়

পর্যটনের মধ্যে দিয়ে সার্বিক বিকাশ ঘটুক কুচলিবাড়ির। যেটাই হোক, দ্রুত হোক এটাই মনে মনে কামনা করছে জেলার মানুষ।

তিনবিঘা হস্তান্তর পর্বে বহু প্রতিশ্রুতি ছিল, কিন্তু সেগুলি কতটা রক্ষিত হয়েছে সেটাও এই মুহূর্তে বড় প্রশ্ন! কুচলিবাড়িতে হাসপাতাল তৈরি হয়েছে কিন্তু চিকিৎসা পরিষেবা কতটা মেলে? মেয়েদের জন্য হাইস্কুল আজও অধরা। তিনবিঘা পর্যটন কেন্দ্র ঢাকঢোল পিটিয়ে যতটা প্রচার হল পরিকাঠামো ততটা গড়ে উঠল কি? তিনবিঘা হস্তান্তর পর্বে দহগ্রাম-আঙ্গারপোতা থেকে গুটিকয়েক পরিবার ব্যতিত প্রায় চারশত হিন্দু পরিবার জীবন-সম্ভ্রম বাঁচাতে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কপালে উদ্বাস্তুর তিলক পড়ে তারা ডাঙ্গারহাট, মেখলিগঞ্জ শহরের সরকার পাড়া, ধূপগুড়ি, গাদং, ময়নাগুড়ি ইত্যাদি জনপদে নতুন করে জীবন সংগ্রাম শুরু করেছিলেন— তাদের প্রতি সরকার কোনও দায়িত্ব পালন করেছে কি?

অল্প দূর বাহাদুর

ডুয়ার্সের হেথা হোথা

বিরাট বটগাছের ছায়ায় গেরস্ত গামছা পেতে শুয়ে আছেন। শিশু-কিশোরের দল গাছের ডাল ধরে ঝুলছে। পাশেই ঢালু জমি গড়িয়ে গেছে পাঙ্গা নদীর দিকে। নদী টপকে চা বাগান। ভারি চমৎকার দৃশ্য। মনে হচ্ছিল সাদাকালো যুগের বাঙলা সিনেমা। বস্তুত, বাহাদুর পঞ্চায়েতের অধীনে থাকা ভুষাপাড়া গ্রামের এই জায়গাটা আমরা তিনচারজন খুঁজে বের করেছিলাম বছর দশেক আগে। নাচের স্কুলের ছাত্রীদের ডিভিডি বের করা হবে। জলপাইগুড়ি টাউন লাগোয়া রোমান্টিক লোকেশন খোঁজা হচ্ছে। তখন কে জানি বলেছিল, ভুষাপাড়ার দিকে দারুন ভাল একটা জায়গা আছে। চা বাগান, নদী। অবশ্য সেসব আরও কয়েকটা জায়গাতেও পাওয়া যেত, কিন্তু ভুষাপাড়ার সে জায়গা এক্কেবারে জনবিরল। ভিড় করে নাচ দেখতে আসার কোনও চান্সই নেই।

এক বাহাদুর ছিল ইন্দ্রজাল কমিক্সের হিরো। জলপাইগুড়ি টাউনের পশ্চিমে এই বাহাদুর একটি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং অনেক পুরনো একটা জায়গা। পাঙ্গা সাহেব বাড়ি থেকে জহুরী তালমা পর্যন্ত প্রায় দশ কিলোমিটার রাস্তার দু-পাশে এই অঞ্চলের বিস্তার। দক্ষিণে শোভারহাটের খানিকটা। এই রাস্তা বহুদিন পর্যন্ত ছিল ছ-ফুট চওড়া। দু-পাশে ফুটখানেক নিচে জমি। উল্টোদিক থেকে গাড়ি চলে এলে সে জমিতে নেমে পড়তে হত। জহুরী তালমা ছাড়িয়ে একেবারে চাউলহাটি অব্দি সে রাস্তার বিস্তার। চাউলহাটি না গিয়ে শিলিগুড়ির দিকেও চলে যাওয়া যায়। একদা এ রাস্তার নাম ছিল তেঁতুলিয়া রোড। তখন রায়গঞ্জ থেকে আম বোঝাই গরুর গাড়ি এ পথ দিয়ে ভিড় জমাত শহরের কদমতলায়। তেঁতুলিয়া এখন বাঙলাদেশে। যদি কখনও তেঁতুলিয়া করিডর চালু হয় তবে ডুয়ার্স থেকে রায়গঞ্জ-বালুরঘাটের রাস্তা অনেকটা কমে যাবে।

বাহাদুর অঞ্চলের হালও বদলে যাবে তখন।

ক-দিন ধরে ডুয়ার্সে জবরদস্ত গরম চলছিল। ঘামতে ঘামতে প্রায় যখন গলে যাওয়ার যোগাড় তখন তবলাবাদক প্রবীর প্রস্তাব দিল তাঁর স্কুটিতে চেপে হাওয়া খেতে যাওয়ার জন্য। গন্তব্যের পরিচয় পেয়ে বুঝলাম বাহাদুরের দিকে। সেই নাচের ছবি তোলার পর আর সেদিকে যাওয়া হয় নি ভেবে সাগ্রহে রাজি হলাম এবং কালের অমোঘ নিয়মে প্রবীর আমাকে নিয়ে গেল ভুষাপাড়ার সেই পরিচিত 'লোকেশন'-এ। যেতে যেতে দেখলাম ছয়ফুটি রাস্তা এখন চকচকে আর চওড়া। সদ্যসমাপ্ত পঞ্চায়েত ভোটে শাসক দল জিতেছে ১৩-৭ গোলে। বিজেপি সাত গোল দিয়েছে।

পঞ্চাশ বছর আগে বাহাদুর অঞ্চলের পাঙ্গা সাহেববাড়ি এলাকায় শহরের রাউত পরিবারের ব্যক্তিগত বিমানবন্দর চালু ছিল। বন্দরের কিছু আগে ছিল তাঁদের পেল্লায় বাগান। অগণিত ফলগাছে ঘেরা সে বাগানে পিকনিক করতে আসত অনেকেই। সেদিন ভুষাপাড়ায় হাওয়া খেতে খেতে ভাবছিলাম যে, আরেকদিন এসে সে বাগানের বর্তমান দশা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এর দিন সাতেক পর, আবহাওয়া যখন কিঞ্চিৎ ঠান্ডা হয়েছে, আবার রওনা দিলাম বাহাদুরের দিকে। প্রথম গন্তব্য

রাউতবাগান।

কিন্তু, এ কোন রাউতবাগান? কয়েকটা লিচু গাছ ছাড়া গোটা বাগানটাই বদলে গেছে চা বাগানে। জনবসতি ঘন হয়ে উঠছে। অবশ্য চা চাষ যে এই অঞ্চলে হু হু করে বাড়ছে, তা আগের দিনই ঘুরতে ঘুরতে বুঝতে পারছিলাম। চিরকালের ধান আর পাটের জায়গা নিচ্ছে চা। সাপের মত আঁকাবাঁকা গতিতে বয়ে যাওয়া পাঙ্গানদীর দু-পাশে প্রাকৃতিক কারণে প্রচুর ঢালু জমি। বড় বড় ঘাস আর আগাছায় ঢাকা এসব জমি সেই আদিকাল থেকে পড়ে থাকত অবহেলায়। সে সব জমি এখন চা চাষের কারণে মূল্যবান হয়ে উঠেছে। পথের দু-পাশে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত নিচু জমি দেখলাম ফাঁকা পড়ে আছে, কিন্তু ঢালু জমিগুলো অধিকাংশ চা গাছে ঢাকা।

এলাকার লোকের সঙ্গে বাক্যবিনিময় করে জানলাম, চা চাষে আগ্রহ ঝড়ের বেগে বাড়ছে। জমির দাম বেড়ে গেছে হু হু করে। রাস্তার ধারে এক বিঘের দাম লাখ কুড়ি। এমনিতে এই বাহাদুর অঞ্চল অর্থনীতির বিচারে মোটেই বাহাদুর নয়। দেশভাগের আগের গল্প ছিল আলাদা। তখন সে-ই বিহার থেকে রায়গঞ্জ হয়ে মালবোঝাই গরু-মোষের গাড়ি রওনা দিত জলপাইগুড়ির দিকে। পাঙ্গা বন্দরে নামত ডাকোটা বিমান। স্বাধীনতা পর রায়গঞ্জে যাওয়ার সেই চমৎকার রাস্তাটা গেল বন্ধ হয়ে। পথ হয়ে গেল শিলিগুড়ি হয়ে অনেক লম্বা। এই যে তেঁতুলিয়া রোড ধরে স্কুটিতে চেপে চলছি, তার দু-পাশ সীমান্তে গিয়ে থমকে গেছে। একদিকে চাউলহাটি তো একদিকে ক্যাম্পের হাট। তারপর বেরুবাড়ি, হলদিবাড়ি। সবই বর্ডার বটে।

মূল রাস্তাটা পাকা আর চকচকে হলেও গ্রামের রাস্তাগুলো কেমন? সম্প্রতি পঞ্চায়েত ভোটের আগে দু-পাঁচটা গাঁয়ে পাইচারি করে একটা সূত্র আবিষ্কার করেছি। গাঁয়ের কাউকে যদি বলা যায়, বাহ! রাস্তাঘাট তো বেশ ভালই দেখলাম, তবে দু-রকম প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়। কেউ অমায়িক হাসেন। তিনি নির্ঘাৎ শাসক দলের। কেউ তেলেবেগুনে জ্বলে উঠতে গিয়ে শান্ত থেকে কিঞ্চিৎ কড়া সুরে বলেন, ওই দিকের রাস্তাটা দেখেন। রাস্তাই নাই!

তিনি অবশ্যই গৈরিক।

ভুষাপাড়ার মোড়ে চমৎকার গরুর দুধের চা খেয়ে লুঙ্গির কায়দায় ধুতি পরা এক বিরলকেশ ব্যক্তিকে

ফিরতে ফিরতে পাঙ্গা এয়ারপোর্টের কাছে থামলাম। বিরাট ফাঁকা মাঠটা ছোটবেলায় দেখেছিলাম। রাস্তা থেকেই দিব্যি দেখা যেত। অনেকটা দূর থেকেই দেখা যেত। বাড়িঘর আর দোকানে সে দৃশ্য ঢেকে গেছে। মাঠ নেই। দোকানঘরের ফাঁক দিয়ে নজরে পড়ল বিরাট পাটক্ষেত। পাটই বলে দিচ্ছে যে বিমানের পাট চুকে গেছে বহুকাল। অনেকে অবশ্য স্বপ্ন দেখেন যে পাঙ্গা বিমানবন্দর আবার চালু হবে।

জিগ্যেস করলাম, গড়ালবাড়ির রাস্তাটা কি ছাড়িয়ে এসেছি?'

'না, না। সামনেই।'

'এই রাস্তাটা তো বেশ বানিয়েছে দেখছি!'

ফর্মুলা কাজ করল। তিনি কিঞ্চিৎ খিঁচিয়ে বললেন, 'যান না। গড়ালবাড়ির রাস্তাটায় যান!'

গড়ালবাড়ির রাস্তা অবশ্য কোনওকালেই ভালো দেখি নি। শেষ গেছিলাম বছর দশেক আগে ঘোরতর কৃষ্ণপক্ষের রাতে রিক্সা রিজার্ভ করে মুর্শিয়া গান শুনতে। দেখলাম সে রাস্তা আর এ রাস্তার তফাৎ পাচ্ছি না। সন্ন্যাসীর হাট, ঠুঁটা পাকুড়ি, জহুরী তালমা — সরকারি অবহেলার অনেক চিহ্ন ছড়িয়ে আছে। চাউলহাটি পর্যন্ত যাওয়া হয় নি।

গড়ালবাড়ি অবশ্য আলাদা গ্রাম পঞ্চায়েত। মুসলিম প্রধান এলাকা। একদা এই এলাকা থেকে বহু গরির মানুষ ঝুড়ি আর কোদাল নিয়ে ভাঙা সাইকেলে চেপে শহরে আসতেন মজুরি খাটতে। এখনও আসেন। তবে অল্প কয়েকজন। বস্তুত, লাগোয়া গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে মজুরি খাটতে আসা লোকের সংখ্যা প্রতিদিনই কমে যাচ্ছে। রোজগারের রাস্তা খুলেছে গ্রামে। বাহাদুর অঞ্চলও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে গেছে দারুকেন্দ্র। বহু ছোকরা এখন সকাল থেকেই 'খেয়ে' থাকেন।

অ্যানালগ যুগে যাঁরা লুকিয়ে দু-পাত্র খাবে বলে শহর থেকে এদিকে চলে আসতেন, তাঁরা ভরা বোতল সঙ্গে করেই আনতেন। কারণ জলপাইগুড়ির পর দ্বিতীয় দারুকেন্দ্রটি সেই জহুরী তালমায়। সেকালের গ্রামীন যুবকেরা কষ্টের টাকায় ফুর্তি করতে চাইলে সিনেমা হলে আসত সঙ্গি জুটিয়ে।

কিন্তু ভুষাপাড়ার সেই লোকেশনটা প্রথম দেখার পর মনে হয়েছিল, এখানে একটা দারুকেন্দ্র স্থাপন করলে দারুণ জমবে। মোহিত নগর ফার্মের পাশ দিয়ে একটা রাস্তা চলে এসেছে পাঙ্গানদী পর্যন্ত। সেটা পাকা করে নদীর ওপর একটা ছোট সেতু বানালেই ভুষাপাড়ার লোকেশনে যাওয়ার পথ খুলে যাবে জাতীয় সড়কের দিক থেকে। চকচকে পথে গাড়ি ছুটিয়ে নিস্তব্ধ ভুষাপাড়ায় চাঁদের আলোয় নদীর ধারে টেবিল পেতে সুরাপান করতে লোকের অভাব হওয়ার কথা নয়।

স্থানীয় দুই যুবককে এমন প্রস্তাবের কথা শোনাতেই তাঁরা চুপ হয়ে গেলেন। একটু পরে জানা গেল যে জায়গাটা নাকি প্রসিদ্ধ এবং উন্মুক্ত 'বার' হয়ে উঠেছিল কিছুদিন হল। সারাদিন রাশি রাশি লোক এসে বোতল খুলে বসে যেত। সে এক মহা অশান্তি। তারপর স্থানীয় প্রমীলা বাহিনী হামলা চালিয়ে সব ভেঙে দিয়েছে। পুলিশ-সাংবাদিক সবাই নাকি সেদিন ভিড় করে এসেছিল এখানে।

'তাহলে তো মদ চলবে না!' আমি বললাম। 'কিছু ভেবেছেন কি?'

এবার জানা গেল একটি কালিমন্দির এবং তার পুজো উপলক্ষ্যে জমাট একটা মেলা বসাবার পরিকল্পনা রয়েছে। খুবই মহৎ পরিকল্পনা সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার ভাল লাগল না। বাহাদুর এলাকায় ঢোকার পর থেকে মূল রাস্তার ধারে নতুন যেটা নজরে পড়ছিল, তা হল মন্দির। ছোট ছোট মন্দির গজিয়েছে অনেক। এরপরেও কেন ভুষাপাড়ার লোকেশনে মন্দির হবে?

বেলা ফুরিয়ে আসছে। আকাশে বাদল মেঘের স্তর ভারি হচ্ছে। উত্তর দিকে অনেক দূর বিস্তৃত নিচু জমিতে ঝাঁকে ঝাঁকে বক নেমেছে। হাল্কা হাওয়ায় দুলছে সার সার কচুপাতা। রাস্তার দু-পাশে সার দিয়ে রাখা লঙ্কার গাছ। শুকিয়ে যাওয়া ডালে একটা দুটো লাল হয়ে যাওয়া লঙ্কা চোখে পড়ছিল। আচমকা তিন-চারটে বাচ্চার ক্রিকেট খেলার দৃশ্য একটানে পলকের জন্য কৈশোরে টেনে এনে আবার ফিরিয়ে দিল বর্তমানে। আমরা ফিরছি। ফিরতে ফিরতে পাঙ্গা এয়ারপোর্টের কাছে থামলাম। বিরাট ফাঁকা মাঠটা ছোটবেলায় দেখেছিলাম। রাস্তা থেকেই দিব্যি দেখা যেত। অনেকটা দূর থেকেই দেখা যেত। বাড়িঘর আর দোকানে সে দৃশ্য ঢেকে গেছে। মাঠ নেই। দোকানঘরের ফাঁক দিয়ে নজরে পড়ল বিরাট পাটক্ষেত।

পাটই বলে দিচ্ছে যে বিমানের পাট চুকে গেছে বহুকাল। অনেকে অবশ্য স্বপ্ন দেখেন যে পাঙ্গা বিমানবন্দর আবার চালু হবে। আমি দুঃখের সঙ্গে এই স্বপ্ন দেখি না। সুদূর ভবিষ্যতে অবশ্য অনেক কিছুই হতে পারে। কিন্তু এই এলাকার উন্নতির জন্য চাই তেঁতুলিয়া করিডর। একদা এই করিডর নিয়ে গেরুয়া শিবির বেশ ব্যানার- পোস্টার লাগিয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রে তাঁদের সরকার আসার পর তাঁরা আশ্চর্য মৌন। একালের সদ্য গোঁফ ওঠা বিজেপির স্থানীয় ছাত্র নেতাকে তা নিয়ে কিঞ্চিৎ খোঁচা দেওয়ার আশায় সে প্রসঙ্গে তুলতে গিয়ে নিজেই তাজ্জব হয়ে গেলাম!

খোকা জানেই না তেঁতুলিয়া কী!

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

ঘালেটার মহলদীরাম রাঙারুণ

ইকো পর্যটনের খোঁজে

অফবিট ডেস্টিনেশন। একেবারে আনকোরা সদ্য গড়ে ওঠা মহলদীরামে সালামান্ডার জঙ্গলক্যাম্প অসাধারণ বললে ভুল হবে। ঈশ্বরের বাসভূমি। গডস ওন কান্ট্রি বললে অতিরঞ্জিত হবে না। আবিষ্কারক, সৃষ্টিকর্তা বিশু মহারাজের ভাষায় ঈশ্বরের নিজ নিকেতন। অনাঘ্রাত পুষ্প। অপরিসীম সৌন্দর্য, অনাবিল পরিবেশ, শান্ত নির্জনতায় মহলদীরামে ছেয়ে আছে। গত ১৯ এপ্রিল উদ্বোধন, ফিতে কাটা পর্ব শেষ হলে করতালির মধ্য দিয়ে ভ্রমণ পিপাসুদের উপস্থিতিতে দারুণ সাড়া পড়েছে। যারা শহুরে কোলাহল, কাঁইকিচির, ডামাডোল, ধুলোধোঁয়ায় অস্থির এখানে কয়েকটি দিন কাটিয়ে গেলে শরীর চাঙ্গা হয়ে উঠবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

মাদারিহাটের জলদাপাড়া জঙ্গল ক্যাম্পের কর্ণধার স্নেহভাজন বিশ্বজিতের সাদর আমন্ত্রণ— স্যার চলে আসুন বৌদিকে নিয়ে। কাকতালীয়ভাবে আমি তখন আপার সিটং-এর আহালদারা, ঘালেটারের নির্জনতায় ডুবে আছি। বিশেষ করে আহালদারা যেন স্বপ্নপুরী, রূপকথার দেশ। পাহাড়ের মাথায় গুটিকয় ছোট ছোট ঘর। যিনি দেখভাল করেন রেঁধেবেড়ে দিয়ে চলে যান। তারপর যেন রাক্ষসপুরী। চারিদিকে গভীর শূন্যতা, নির্জনতায় খা খা করে। আহালদারার অভাবনীয় নির্জনতা গায়ে কাঁটা দেয়। কেমন যেন ছমছমে পরিবেশ। আমি আর গিন্নি। দ্বিতীয় আর কেউ নেই। গিন্নী বলে— শুধু তুমি আর আমি এখানে থাকবে কী করে? দ্বিতীয় কোনও টুরিস্টের মুখ দেখছি না। হা হা হু হু হাওয়া। রাতবিরাতে হঠাৎ যদি কিছু হয়ে যায় তখন কী হবে?

গাড়ির চালক গৌতম বলে— 'আহা! আমি তো আছি। কিসের ভয়?'

—বলা যায় না ভূতেরা আসতে পারে।

অতএব নামথিং পোখরি ছুঁয়ে চলে আসি ঘালেটার হোমস্টে-তে। পরিচালনায় নেচার বিয়ন্ডের হামারো হোমের পার্থ। ঘালেটার মন্দ নয়। ঘরবাড়ি, মানুষজনের দেখা মেলে। আর পাখিদের এত বেশি ভিড় যে সারাক্ষণ পাখির গান। বিবিধ শব্দ ঝংকার পাহাড়ের রং বদলের দৃশ্য দেখতে দেখতে সময় কেটে যেত।

চৌকিদার কাম পাচক। সে রেঁধেবেড়ে চলে যায়। পাহাড় চূড়া, ভিউ পয়েন্ট, মেঘ কুয়াশার খেলা কতক্ষণ! ঘালেটারে গড়িয়ার এক যুবক অতিথি অভ্যাগতদের দেখভাল করে। বলে— 'স্যার কোনও টেনশন করবেন না। আমি সর্বক্ষণের জন্য আছি। যা লাগে বলবেন। সাধ্যমতো সেবা করব'। সবে এসেছে। কলকাতাকে কি ভুলতে পারে? মাঝে মাঝে কেন জানি না বিমর্ষ, মনমরা হয়ে চুপচাপ পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে কী ভাবে সেই জানে। তাই বলে আমাদের প্রতি সেবাযত্নের কোনও ত্রুটি রাখেনি। ছোট্ট পাহাড়ি জনপদ। চাইলেই তো সব কিছু পাওয়া যায় না।

ঘালেটার থেকে একদিন খাজা মানে প্রাতঃরাশ খেয়ে দু'জনে মহলদীরামের উদ্দেশে রওনা হই। যাত্রাপথে পাকদণ্ডী চড়াই পথের দু'দিকের নিসর্গ শোভা দেখার উপায় নেই। ভয়ংকর কুয়াশা। দু'হাতে দূরের বস্তু অদৃশ্য। হুড়মুড় করে মেঘবালিকারা গাড়ির সম্মুখে নেচেনেচে এদিকওদিক যেন ছুটে বেড়াচ্ছে। মানুষজনের মুখ দেখছি না যে জিজ্ঞেস করব— 'মহলদীরাম কত দূরে ছ?' দু'জন রাস্তার ধারে বসে ছিল। গাড়ি থামিয়ে গৌতম জিজ্ঞেস করে, সালামান্ডার জঙ্গল ক্যাম্পের কথা। উত্তর আলিকতি। বাটো। বাটো বটে। হঠাৎ দেখি চা-বাগানের মাঝখানে একটি দুটি ঘরবাড়ি। ওই তো দেখা যাচ্ছে। ঠিক পৌঁছে গেলাম। আরে বাপি যে দেখি পথের ধারে। গাড়ি থেকে নামতেই তীব্র হিমেল হাওয়ার খপ্পরে যেন কুপোকাৎ। ঝিরঝিরে বৃষ্টি। কুয়াশার ওড়না উড়ে যাচ্ছে। মাথায় মাঙ্কি ক্যাপ আর জহরকোটে কি শীত মানে? গিন্নি বলে চাদরটা আনলে ভাল করতাম।

বাপি বলে— 'লাগেজপত্র কোথায় গৌরীদা? আপনাদের জন্য ঘর রেডি।' দ্যাখো কান্ড! বাপি এ যাত্রা ছাড় দাও। ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে নীচতলায় নীলকান্ত রেস্তোরাঁয় ঢুকি। প্রবেশ পথে ওঁ নমঃ শিবায়। যেদিকে চোখ যায় চা-বাগানের ঢাল সিঁড়ি ভাঙা অঙ্কের মতো ছন্দে ছন্দে নেমে গেছে। কোথায় লাগে মুন্নার, কুন্নুর, পোনমুড়ি, উটি। মহলদীরাম সবাইকে টেক্কা দিয়ে বিশ্বসুন্দরী। ফাটাফাটি, এক্সেলেন্ট অ্যাম্বিয়েন্স। রেস্টুরেন্টের ভিতরে চক্ষু ছানাবড়া। করেছে কী বিশু! লয়েড, ক্যাম্বেল, হুকার, চ্যাপম্যান— পুরনো দার্জিলিঙের সাদাকালো ছবি তেমনই বসার ব্যবস্থা। দুর্ধর্ষ কোলাজ। সাধ্য নেই বর্ণনা দেবার। বাপির প্রশ্ন কী খাবেন স্যার বলুন। গরম গরম খিচুড়ি?

—না ভাই, চা ও টা।

মহলদীরাম শব্দটি লেপচা ভাষার অন্তর্গত। আদিতে বলা হত মহালদী পাহাড় থেকে উৎপত্তি হয়ে তীব্র গতিতে বাঁক নিয়ে সজোরে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে। এল এস এল ও'ম্যালির মূল্যবান দার্জিলিং গেজেটিয়ার ১৯০৭ সালে প্রকাশিত। তাতে উনি স্পষ্ট লিখেছেন দ্য ফাউন্টেন হেড অর সোর্স অফ মহলদী, এ নেম গিভেন টু দ্য রিজ নিয়ার কার্শিয়াং দ্যাট রাইজেজ বিলো ইট। সমতলে এই মহলদী বাংলাতে পরিচিত হয় মহানদী বা পরবর্তীকালে মহানন্দা নামে খ্যাত। ইতিহাস বলে দার্জিলিং জেলার প্রথম প্রাচীনতম ওল্ড মিলিটারি রোড মহলদীরামে এসে থমকে যায়। পাংখাবাড়ির মতো এখানে চমৎকার ইউরোপিয়ান স্টাইলে বাংলো ছিল। এখন চিহ্নমাত্র নেই। মহলদীরাম চা-বাগানের পাশেই জাংপানা, আরও ওপরে মহানদী কার্শিয়াং, গিদ্দা, বাগোরা। বিশ্বজিতের ভাললাগা এবং ধীরে ধীরে বেড়ানোর জন্য সবরকম সুযোগ-সুবিধাসহ সালামান্ডার জাঙ্গলক্যাম্প। মহলদীরামের আকর্ষণ এর ভার্জিন বিউটি। স্থানীয় মানুষজন, চা-বাগানের লোকজন বেজায় খুশি এই কারণে, এখানে যারা বেড়াতে আসবেন তাদের কল্যাণে স্থানটির উন্নতি হবে। গ্রামবাসীরা গভীর আশা ব্যক্ত করেছেন। মহলদীরামে কয়েকটি দিন থেকে কাছাকাছি আহালদারা, ঘালেটার সমগ্র সিটিং কমলালেবুর জন্য বিখ্যাত। আদা, বড় এলাচ, ঝাড়ু, বিরল প্রজাতির নেউটে, বন্য শুয়োর দেখতে পাবেন। বাড়তি পাওনা নামথিং পোখরি। অন্য দিকে মংপু, বাগোড়া, চটকপুর, দিলারাম, টাইগারহিল। পায়ে হেঁটে বা গাড়িতে আনন্দে ঘুরে বেড়ানোর সৌন্দর্যখনি। আগামী দিনে এই নির্জনতা, শান্ত পরিবেশ বিঘ্নিত হবে বলে মনে হয় না। মানুষের ভিড়ে যেমনটি হয়েছে রিশপ, লাটাগুড়ি, চিলাপাতা। বছরের যে কোনও সময় আপনি বেরিয়ে পড়তে পারেন। বছর জুড়েই ঠান্ডা। শীতে হাড়পাঁজর কাঁপিয়ে তুলবে সন্দেহ নেই।

যোগাযোগ ঃ সালামান্ডার জঙ্গল ক্যাম্প, মহলদীরাম। ফোন ঃ ৯৭৩৩২৬৭৫১৭, ৭৯৫৮৭০৪৪৭১, ৮৯৭২৩৫৩০০৩। ই মেল

aranya.jaldapara@gmail.com।

দূরত্ব ঃ শিলিগুড়ি থেকে ৭০ কিমি, কার্শিয়াং থেকে ২২ কিমি, শিবখোলা ১২ কিমি, লাটপাঞ্চার ১২ কিমি, সিটং ৭ কিমি।

মহলদীরাম থেকে পরিষ্কার আকাশ থাকলে দেখা যায় তরাই-ডুয়ার্সের সবুজ অরণ্য, নদী।

থাকাখাওয়া ঃ মাথাপিছু ১২০০ টাকা।

রিম্‌ঝিম্ রাঙারুণ

দিলারামের স্বর্গীয় পথ বেয়ে চটকপুর, চিমনি, বাগোরা। আর সোনাদা থেকে গড়গড়িয়ে পাতালে প্রবেশ। সে সময় সোনাদা থেকে বাঁ দিকে বোল্ডার বিছানো পথ বেয়ে জোঙ্গা কিংবা ল্যান্ডরোভার নাচতে নাচতে হেলেদুলে ওকস্, রংমুখ সিডার হয়ে মুন্ডাকোঠী চা-বাগান, নদী, জঙ্গল, কমলা বাগান। অতীব সুমিষ্ট কমলা যত খুশি খাও, ঝোলাতে ঢোকাও। ম্যানেজার দত্ত সাহেবের কল্যাণে শতবর্ষ প্রাচীন ইউরোপিয়ান ম্যানেজরা ডাইরেক্টরর্সদের বাংলোতে আরামে আয়েসে বিলাসে থাকা। সাহেব চলে গেলেও সাহেবিয়ানা দস্তুর মতো বজায় আছে। ইতিহাস বলে এখানে চ্যাপম্যান, হুকার, লয়েড ক্যাম্বেলের জমানায় হোপটাউন গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখত ইংরেজরা। শেষ পর্যন্ত স্বপ্ন অধরাই থেকে যায়। যেমনটি হয়েছিল ওল্ড মিলিটারি রোড। সাক্ষী চিমনি। সেঞ্চল থেকে সরিয়ে ক্যান্টনমেন্ট তৈরি হল জলাপাহাড়ে।

অনবদ্য মুন্ডাকোঠী, রংমুখ অ্যান্ড সীডার। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ধাপে ধাপে নেমে গেছে চা-বাগানের সারি। যেদিকে চোখ যায় পাইন, ফার, দেওদার, স্প্রুস, ওকস আর মুন্ডাকোঠীতে নিরিবিলি দিনযাপন। মুন্ডাকোঠী, রংমুখ থেকে যাবার কথা ছিল পান্ডেম, রাঙারুণ। দার্জিলিঙের আদি বোটানিক্যাল গার্ডেন গড়ে উঠেছিল রাঙারুণে। বহু বছর বাদে ডাক এসেছিল 'হামরো হোম' থেকে। নেচার বিয়ন্ড নামে একটি ভ্রমণ সংস্থার অন্যতম পরিচালক স্নেহভাজন শ্রীমান পার্থ খোঁজখবর নিয়ে জানাল— 'স্যার দিন কয়েকের জন্য রাঙারুণে কাটিয়ে আসুন। শিলিগুড়ির ঘিঞ্জি, অপরিসর ভিড় ঠেলাঠেলি, দার্জিলিং তথৈবচ। এখন চলাফেরা করা যায় না। যাবার পথে আহালদারা, ঘালেটার দুটি রাত কাটাবেন। অতি উত্তম প্রস্তাব। তবে কমলা লেবুর সময় হলে সোনায় সোহাগা হত। সিটং জুড়ে সোনালি বর্ণ, তাক লাগান সনতুলা। ঘালেটার জায়গাটি মন্দ নয়। এখান থেকে একদিন ঈশ্বরের বাসভূমি মহলদীরাম বেড়িয়ে আসি। তারপর রাঙারুণের পথে রওনা হলাম। প্রাতঃরাশ সেরে।

চালক গৌতম রাঙারুণে একবারই টুরিস্ট নিয়ে এসেছিল। মুশকিল হল গাড়িচালক ভাল কিন্তু প্রকৃতি, সৌন্দর্য প্রীতি ছিঁটেফোঁটা নেই। সংসারের সাত-পাঁচ নিয়ে সারাদিন ভাবে। ঘালেটার থেকে যোগীঘাটের নিসর্গ চিত্র এককথায় আনপ্যারালাল। চারিদিকে পাহাড় সবুজের ঝালর যেন ঝুলে পড়েছে। যোগীঘাটে নাকি যোগী রামদেব বাবা পতঞ্জলি আশ্রম বানানোর চিন্তাভাবনা করেছিলেন। সেতুটি চমৎকার। সত্যি এক আজব দেশে যেন চলে এসেছি। এবড়োখেবড়ো চড়াই উৎরাই ভেঙে মংপুর রবিঠাকুরের বাড়ির পাশ দিয়ে ধ্যানগম্ভীর ধুপি গাছের জটলা, তারই মাঝে স্বচ্ছ মোমমসৃণ পথ। সবচেয়ে ভাল লাগছিল দৈত্যাকৃতি ফার্ন, হাওয়ায় মাথা দোলাচ্ছে। গাড়ি থেকে নেমে পাইনের আলো আঁধারি পরিবেশে কীটপতঙ্গের শব্দ ঝংকার শুনতে শুনতে যাওয়া। এপথে তেমন গাড়ি ঘোড়ার ছুটোছুটি নেই। ধীরে ধীরে পৌঁছে গেলাম তিনমাইল। এখান থেকে অনেকগুলো পথ মাকড়শার জালের মতো ওপর-নিচে বেরিয়ে গেছে।

ঘুম, টাইগার হিল, গ্লেনবার্ন, তাগদা, লপচু, পেশক হয়ে তিস্তাবাজার আবার তাগদা হয়ে তিনচুলে। আরও আগে রম্ভী বনবাংলো। অনেকে খোঁজই রাখে না। বুকিং হয় দার্জিলিং ডিএফও অফিসে। অন্যদিকে বড়ামাঙ্গোয়া, থার্ড মাইল থেকে আমরা সোজা গড়গড়িয়ে নেমে যেতে থাকি রাঙারুণের দিকে। দোকানপশার, ঘরবাড়ি, গাড়ির জটলা ভেদ করে উৎরাই পথ। দু'পাশে গভীর পাহাড়ি অরণ্য। বেশ আদিম বুনো গন্ধ নাকে লাগছে। তাড়স্বরে ঝিঁ ঝিঁ শব্দ। হঠাৎ আকাশ ভেঙে ঝমঝম বৃষ্টি শুরু হল, সঙ্গে ধুমধাম শিল পড়তে থাকে। ফড়িংয়ের মতো ওয়াইপার নাচলেও সম্মুখের পথ অস্বচ্ছ, অচেনা, গৌতমকে বললাম কোনও ঝুঁকি নিও না, একপাশে দাঁড়িয়ে পড়। বৃষ্টিতে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। উপর থেকে জল গড়িয়ে নামছে। বৃষ্টি একটু কমলে ধীরে ধীরে রাঙারুণে প্রবেশ। ডান দিকে চা-বাগান। কিছু ঘরবাড়ি। একে তাকে জিজ্ঞেস করে করে হামরো হোম-এ পৌঁছে গেলাম। তামাং পরিবার অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। স্মার্ট ফোনের দৌলতে আগেভাগে খোঁজখবর হয়ে গেছে। রাস্তা ঘেঁষে তামাংদের বাড়ি। দুটো ঘর হোম স্টে রূপে সাজিয়েছে। এরকম আরও কিছু ঘরবাড়ি রাঙারুণে হোম স্টে হিসাবে চালু হয়ে গেছে হামরো হোমের প্রচেষ্টায়।

তামাং পরিবারের নবীন প্রবীণ সবাই পরম সমাদরে আমাদের দু'জনকে স্বাগত জানায়। স্বাগত ছ হোজুর লাই হামি পাহাড়বাসী হো। খাদা পরিয়ে দেয়। জিজ্ঞাসা করে ঘর পছন্দ তো? আপনারা গেস্ট। অতিথি দেবভব। আমরা হোস্ট। ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে বলবেন। বাঙালিদের মতো রান্নাবান্নায় তেমন পটু বা পারদর্শী নই। গিন্নির উত্তর— নিরামিষ পছন্দ। মাংস-মাছ-ডিম না হলেও চলবে। পথের ধারেই ঘর। বিছানা থেকেই পাহাড় দেখা যায়। পাহাড়িয়াদের ভীষণ পুষ্পপ্রীতি। প্রতিটি বাড়ির ব্যালকনি, ছাদে-কার্নিশে ঘরে-বাইরে কত যে বিচিত্র পুষ্পসম্ভার ভাবা যায় না। ভাল লাগে এদের ফুল চুরির অভ্যাস নেই। চা-বাগানের শ্রমিকরা কাজের শেষে ঘরে ফিরছে নিঃশব্দে। তেমন কোলাহল কলরব কিছুই নাই। ফ্রেশ হয়ে আমরা দু'জনে ওদের ড্রইয়িং রুমে গিয়ে বসি। মেয়ে, বউ, শ্বশুর, শাশুড়ি, ছেলে সবাই যোগ দেয়। নেপালি ভাষায় তেমন সড়গড় নই। তাতে কিছু এসে যায় না। হৃদয়ের উষ্ণতা, আন্তরিকতা, ভালবাসা ষোল আনা বজায় আছে। বলে মাঝে কয়েকটা মাস আন্দোলন করে পাহাড়ের উন্নয়ন পিছিয়ে গেল। এখন শান্ত। আমরা তো শান্তি চাই। সমতল ও পাহাড়ের ভেদাভেদ করে কি ফায়দা হল বলুন তো! গোর্খাল্যান্ড ইস্যু নিয়ে আলোচনা থেকে দূরে থাকাই ভাল। বড় স্পর্শকাতর বিষয়। নেচার বিয়ন্ডের শ্রীমান পার্থ বলে, জানেন স্যার রাঙারুণ নামের রহস্য। আদার ব্যাপারি হলেও জাহাজের খবরাখবর কখনও রাখি। দু'দিনের বৈরাগী হলে কী হবে। রাই আর গুরুংদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ হত খুব। তারপর একদিন আপোশে মিলে মহব্বৎ। সেই থেকে রাঙারুণ। যেমন খুশি ব্যাখ্যা করুন। রাঙারুনকে ভাললাগার পেছনে একটাই কারণ কোলাহল কলরব নেই। নেই ধুলো ধোঁয়া। যানজটের ঝামেলা। পরম শান্তিতে কাটানোর জন্য আদর্শ জায়গা রাঙারুণ।

রাতের মেনু কী হবে জিজ্ঞাসা করে। রুটি, তরকারি, ডাল, ভাজা। দুপুরে খাওয়া হয়নি জেনে চাউমিন বানিয়েছিল। সঙ্গে চা তো আছেই। গিন্নী মহিলামহলে গল্পে মজে গেছে। আমি বাইরে বেরিয়ে চারপাশটা দেখি। পায়চারি করি। ছোট্ট রাঙারুণের সৌন্দর্য উপভোগ করি। বাইরে বারান্দায় চেয়ারে বসে ধ্যানমৌন পাহাড়টার বুকের দিকে তাকিয়ে থাকি। লাকপা দার্জিলিং থেকে গাড়ি চালিয়ে ঘরে ফিরে দেখা করতে আসে। —আঙ্কল, কোনও প্রবলেম হলে বলবেন। পাহাড়ের বুকে একটু একটু তারার মতো আলো জ্বলে উঠল। সন্ধ্যার পর মনে হল যেন দীপাবলীর রাত। —ওই দেখুন দার্জিলিং চৌরাস্তা, ম্যাল, টুরিস্ট লজ, টাওয়ার। রাঙারুণ থেকে যদি চড়াই ভাঙতে পারেন অল্প সময়ে দার্জিলিঙে পৌঁছতে পারবেন। আগামী দিনে এখান থেকে নতুন রাস্তা দিয়ে দার্জিলিং পৌঁছতে পারবেন, কাজ চলছে। খুব তাড়াতাড়ি চালু হবে। কনকনে না হলেও ঠান্ডা ভালই। গিন্নী ফিরে এসে বলে ওরা সত্যি ভাল মানুষ। কী সুন্দর হাসিখুশি আপন করে নিয়েছে আমাদের। কত গল্প করল সংসারের সুখ-দুঃখ নিয়ে। আগামীকাল রাঙারুণের চারপাশ দেখাতে নিয়ে যাবে। বললাম— তুমি যাও। আমি বরং এই চেয়ারে বসে উপাসনা, প্রাণায়াম করি।

শুরুতে রাঙারুণের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছিলাম এবার রাঙারুণের গল্প শোনাই। ১৮৭০ সালে রাঙারুণে দার্জিলিঙের বোটানিক্যাল গার্ডেন তৈরি হয়। একে তো প্রকৃতি সমগ্র স্থানটি পাহাড়ি অরণ্যে সমৃদ্ধ। জলবায়ু মনে করা হয়েছিল অনুকূল। প্রচুর দুর্লভ ভেষজ গাছ, মস, অর্কিড, নানা প্রজাতির ফার্ন, ধুপি, সিডার, স্প্রুস, রডোডেনড্রনের বৈচিত্রময় সম্ভার। দুর্ভাগ্য উদ্ভিদ বিশারদের মতামত হল স্থান নির্বাচন সঠিক হয়নি। ভয়ঙ্কর শিলাবৃষ্টির কারণে বহু গাছ মারা যায়। ১৮৭৮ সালে উদ্ভিদ বিশেষজ্ঞ এবং প্রশাসনিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দার্জিলিং সদরে বোটানিক্যাল গার্ডেন স্থাপিত হয়। জমি দান করেন মিস্টার লয়েড। লয়েড ব্যাঙ্কের মালিক।

গভীর পাহাড়ি অরণ্য, চা-বাগিচা, শান্ত নির্জন জনপদ রাঙারুণ নিঃসন্দেহে শান্তিপ্রিয় পর্যটক, নির্জনতার উপাসকের কাছে মনে হবে পরমানন্দময় জগত। মাঝে মাঝে সাইরেনের মতো শব্দ বেজে ওঠে চা-পাতি কারখানায়। গামবুট, ছাতা, পাতা তোলার বাকেট নিয়ে চা-শ্রমিকরা নিঃশব্দে যেতে থাকে। ব্যালকনিতে বসে ওদের চলাচল দেখি। মাঝে মাঝে মেঘ কুয়াশা রোদ বৃষ্টির লুকোচুরি খেলা ভারি মজার। বিশেষ করে পুঞ্জপুঞ্জ মেঘেরা যখন ভেসে বেড়ায় পাহাড়ের বুকে। রাঙারুণ লেপচা শব্দ যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে রংলি রংলিয়ট, অনেক গল্প কাহিনি কিংবদন্তী, প্রেম-ভালবাসা। পাহাড়ে অনেক জায়গা রয়েছে আদিতে লেপচাদের সমাজ সংস্কৃতির সঙ্গে সংপৃক্ত। শুধু লেপচা নয়, তিব্বতী, ভোট, বাংলা, নেপালি নানা শব্দ ভাণ্ডারে সমৃদ্ধ। আমি গবেষক, পণ্ডিত, ভাষাবিদ নই। সীমিত সময়ে রাঙারুণের অনেক দ্রষ্টব্যস্থলই অদেখা রয়ে গেল। প্যান্ডেম, গিং বৃষ্টির জন্য যেতে পারিনি। সন্ধ্যার পর রাঙারুণ থেকে দার্জিলিং যেন স্বপ্নপুরী দীপাবলীর আলোকমালায় যেন সজ্জিত হয়ে ওঠে। ঝিকমিক করে। রাত্রি ন'টাতে রাতের আহার সেরে নিতে হয়। বাইরে নিঝুম, শুনশান। কিছুক্ষণ বসে থাকি তারপর কম্বল মুড়ি দিয়ে নিদ্রাদেবীর আরাধনা।

ঘালেটার ও রাঙারুণে থাকবার জন্য যোগাযোগ- www.humrohome.com। টোল ফ্রি নম্বর ১৮০-১২৩৩-৭৫৯।

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

ডুয়ার্সের সোনালি দিগন্ত

অসহ্য প্রসব যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে কোনও মহিলা চা-শ্রমিক। প্রত্যন্ত চা বাগান থেকে হাসপাতাল বহুদূর! মধ্যরাত্রের অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতিতে অসহায় পরিবারের লোকজন আর প্রতিবেশিরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কেউ একটা নিরুপায় খবর পাঠাল বানারহাটের সোনালি সামন্তকে। অভাবনীয় দ্রুততায় ছুটে এলেন এক তরুণী। গর্ভবতীকে পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত নিলেন, হাতে সময় নেই, বাড়িতেই ডেলিভারি না করালে বিপদের সম্ভাবনা। মুহূর্তের মধ্যে আয়োজন হল সব। তারপর সবার দুশ্চিন্তার ঘাম ঝরিয়ে ভুমিষ্ঠ হল নবজাতক তার কান্নার আওয়াজে। নরম কাপড়ে জড়িয়ে শিশুকে কোলে নিয়ে বাইরে এসে হাসিমুখে সোনালি বললেন, মেয়ে হয়েছে গো, নাম কী দেবে বলো? আনন্দে যে তখন চোখের জল আর বাঁধ মানে না কারুর।

এটি কলকাতার বাবুদের বানানো ডুয়ার্সের কোনও অ্যাওয়ার্ড পাওয়া ডকুফিচার ফিল্ম নয়, সমস্যায় জর্জরিত ডুয়ার্সের চা বাগানের অবিশ্বাস্য কঠিন বাস্তব দৃশ্য। তবে হ্যাঁ, এ কাহিনি শুনলেই তাঁরা যে ক্যামেরা বগলে ট্রেনে উঠে পড়বেন তা নিশ্চিত। সোনালিকে খুঁজে পাবেন চা বাগানেই, কখনও সাইকেলে, কখনও পায়ে হেঁটে। গ্রাসমোর চা-বাগানের চার নম্বর লাইনের দিব্যা টোপ্পোর মতো আরও তিনটি শিশু এখন সুন্দর জীবন পেয়েছে সোনালির জন্যই। এই তিনজনের প্রত্যেকেরই জন্ম থেকে হৃদযন্ত্রে ফুটো ছিল। সোনালির চেষ্টাতেই রাজ্যের শিশুসাথী প্রকল্পে ওদের নিখরচায় অপারেশন হয়েছে। এমনও রয়েছে, কোনও শিশুর ঠোঁট জন্ম থেকে কাটা, কোনও শিশুর তালুতে ফুটো ইত্যাদি— তাদেরকে সঠিক সময়ে সঠিক স্থানে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন সোনালি। তারা প্রত্যেকেই এখন সুস্থ।

আড়াই বছরের একটি ছোট্ট কন্যাশিশুকে সামলেও যে এতবড় কাজের সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়া যায় এবং নির্দ্ধিধায় সে সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া চলতেই থাকে সোনালি সামন্তর কর্মকাণ্ড না দেখলে তা ভাবাই যেত না। স্বামী একজন কর্তব্যপরায়ণ পুলিশকর্মী। স্বাস্থ্যবিভাগের এএনএম পদে থেকে নাগরাকাটা ব্লকের বিএস কোম্পানির উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের অন্তর্গত গাঠিয়া চা-বাগান ও গ্রাসমোর চা-বাগানের প্রায় বারো হাজার শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকায় দিনরাত সেবা করে গেছেন সোনালি। সেবার কথা মাথায় রেখে তিনি শুধুমাত্র নিজের কর্মসংস্থানের মধ্যে নিজেকে আটকে না রেখে যুক্ত হয়েছেন বিভিন্ন এনজিও-র সঙ্গে। সেবাকেই নিজের জীবনের ব্রত করে নিয়েছেন আর তার স্বীকৃতিস্বরূপই কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর থেকে সোনালি সামন্তকে দেওয়া হয়েছে জাতীয় পুরস্কার। জলপাইগুড়ি জেলা স্বাস্থ্যদপ্তরসহ গোটা জেলা জুড়েই খুশির হাওয়া বয়ে গেছে সোনালির এই খবরে।

মাননীয় রাষ্ট্রপতী রামনাথ কবোন্দি ও সোনালি সামন্ত

সোনালি সামন্তরা ডুয়ার্সে নিয়ে আসছে নতুন দিগন্তের সকাল। শত বঞ্চনা অবহেলার পাথর সরিয়ে মাথা চাড়া দিচ্ছে নতুন চারাগাছ। নয়া প্রজন্মের ভোর আনে বার্তা, আর নয় এবার বাংলাকে আগামীর পথ দেখাব আমরাই।

কেয়া ব্যানার্জি

টয়লেট এক প্রেম কথা নয়

খবরের কাগজে হঠাৎই চোখে পড়েছিল একটি ছোট্ট খবর। সেখানে একটি স্কুলের ছাত্রী পেট ব্যথায় কাতরাচ্ছিল, শিক্ষিকা তাকে টয়লেটে যেতে বলায় সে চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে যে সে কিছুতেই স্কুলের বাথরুমে যাবে না, তার চেয়ে পেট ব্যথায় কষ্ট পাবে তাও ভাল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল নিজেদের স্কুল জীবনের কথা। ক্লাস ফাইভ থেকে টুয়েলভ এই আটটা বছর আমি একদিনও স্কুলের বাথরুমে যাইনি, স্কুলে গিয়ে জল খেতাম না। এমন নয় যে আমার জীবনে বাথরুম নামক বস্তুটির কোনও দরকার পড়ে না বা আমি সুপারওম্যান। বরং দেশের সব মেয়েরা বা তাদের মায়েরাই বলবে, আমরাই আসলে সুপারওম্যান, কারণ আমাদের বাথরুম পায় কিন্তু আমরা না গিয়েও কাটিয়ে দিতে পারি সারাটা দিন। আর আমাদের মেয়েদেরকে সেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে আসছে স্কুল থেকেই। দিনের অনেকটা সময় স্কুল-কলেজে কাটাতে হয়, ফলে টয়লেটে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা স্বাভাবিক, কারণ এটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। মেয়েদের বাইরে উন্মুক্ত স্থানে বাথরুম করাটা সভ্যতা শালীনতার মধ্যে পড়ে না, সেই শিক্ষা মেয়েরা পায় ছোটবেলায় নিজে নিজে বাথরুম করতে শেখার পর থেকেই। সরকারি স্কুলগুলির অব্যবহারযোগ্য কদর্য বাথরুম মেয়েদের সেই প্রশিক্ষণকেই যেন আরও পোক্ত করে দেয়। টয়লেটের পাশ দিয়ে আনমনে যাওয়ার সময়ও চোখ-মুখ-নাকের বিকৃতি এসে যায় আপনাআপনিই। আর যারা বাধ্য হয়ে টয়লেটে যেত বা যায়, শুনেছি তারা চোখ বন্ধ করে রাখে, নাকে রুমাল। কোনও প্রকারে কাজ হয়ে গেলে দৌড়ে পালিয়ে আসে। যেন অপরাধের শাস্তি। সেই প্রশিক্ষণ বড় করুণভাবে কাজে লাগে বাকি ব্যবহারিক জীবনে।

আমাদের দেশে জনসংখ্যার অনুপাতে সর্বত্রই গণশৌচালয় বা পাবলিক টয়লেট কেবল অপ্রতুলই নয়, তা সাধারণত ব্যবহারের অযোগ্য হয়। আর তার ফল ভুগতে হয় মূলত মেয়েদেরই। শিলিগুড়ি-কলকাতা রুটে আগে চলত বিলাস বহুল ভিডিও রকেট বাস, যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এখন এসেছে আধুনিক প্রযুক্তির শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ভলভো বাস। কিন্তু প্রায় অর্ধশতককাল এই 'প্রগতি'র পথে চলবার পরেও চিত্র এতটুকু বদলায় নি! আজও এই বারো-চোদ্দ ঘন্টার রুটে মেয়েদের ছোট বা বড় বাথরুম করবার আধো অন্ধকার যে ব্যবস্থা আছে নিতান্ত নিরুপায় না হলে তা ব্যবহার করা যায় না, অন্তত সভ্য মানুষের যে ন্যূনতম পরিচ্ছন্নতাটুকু প্রয়োজন তা নেই। আজও মেয়েরা সড়কপথের লংজার্নিতে জলস্পর্শ করে না, আর ওপরওয়ালার কাছে কাতর প্রার্থনা করেই গাড়িতে ওঠে, বিড়ম্বনায় ফেলো না ঠাকুর, নির্বিঘ্নে তাড়াতাড়ি ঘরে পৌঁছে দাও। বেড়াতে গেলেও একই কষ্ট। এমন অনেক দর্শনীয় স্থান রয়েছে যেখানে টয়লেট নেই। আর আকাশপথে এখন যে হারে যাত্রী সংখ্যা বাড়ছে তাতে এয়ারপোর্টগুলো যে খুব তাড়াতাড়ি নিজেদের 'আমরা আলাদা' তকমা হারাবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। যে দেশ ডিজিটালি উন্নতির দাবি রাখে, ঝা চকচকে মোড়কে নিজেকে মুড়ে ফেলার প্রয়াস চালায় সেখানে রেল স্টেশন, বাস স্ট্যান্ড, পার্ক, বিভিন্ন ঘোরার জায়গায় টয়লেটগুলিতে দুর্গন্ধময় পরিবেশে গা গুলিয়ে ওঠে, টেকা দায়। কোথাও কোথাও জলও থাকে না। কেন? এত অভাব? টাকা? নাকি জলের?

স্বাধীনতার সত্তর বছর পেরোবার পর হঠাৎই জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিল সরকার। স্বচ্ছ ভারত, নির্মল ভারত, গোটা দেশ সঁপে দিয়েছিল দেহ-মন-প্রাণ এবং তার সঙ্গে কত হাজার কোটি টাকা (তা জানা নেই)। বিডিও সাহেবদের কাকভোরে উঠে বাঁশি বাজিয়ে দৌড় করানো হয়েছিল, বেগপ্রাপ্ত মানুষগুলিকে গাড়ুহাতে মাঠ থেকে ঘরের পথে ফেরাতে। সাহেবদের শরীরচর্চা ছাড়া কতটা কাজের কাজ হয়েছে জানা নেই, অথচ একটি টাকাও অতিরিক্ত খরচ না করে ক্লাস ফাইভ থেকে ক্লাস টুয়েলভ স্কুলের বাধ্যতামূলক পাঠ্যক্রমে যদি ঢোকানো যেত বাড়িঘর, টয়লেট ব্যবহারের ও নিয়মিত পরিস্কার রাখবার প্র্যাকটিকাল ক্লাস? দশ ও বারো ক্লাসে বাইরের পরীক্ষক দ্বারা তার ওপর ১০০ নম্বরের মূল্যায়ন? করা যেত না? এটি সম্ভব করতে পারলে আমার বিশ্বাস, তার ফল মিলত অচিরেই, আগামী ১০-১২ বছরেই দেশ বোধহয় সত্যিকারের নির্মলতা লাভ করতে পারত, অন্দর সে। কারণ অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে হাটে-মাঠে-ঘাটে-আকাশে-যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বত্র পৌঁছে গেলেও আজও মেয়েরা যে একটি শাপ থেকে মুক্তি পায় নি, সেই মুক্তি ঘটত স্কুলের ছোট্ট বয়স থেকেই। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক শাসনে তা হবার নয়, দেশের পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী মায় রাষ্ট্রপতি পদে মেয়েরা বসবার পরেও না। আসলে চিন্তাধারারই বদল হয়নি আমাদের, প্রাকৃতিক ক্রিয়াকলাপকে এখনও আমাদের দেশে স্বাভাবিক বলে ধরা হয় না। তার নিকৃষ্টতম প্রমাণ সরকারি স্কুলগুলি। শারীরিক অসুবিধে, ইউরিন ইনফেকশন এবং জল কম খাওয়ার ফলে কত রকমের অসুখ তখন থেকেই বাসা বাঁধতে শুরু করে মেয়েদের শরীরে তার ইয়ত্তা নেই।

ছেলেরা প্রস্রাবাগার নিয়ে মেয়েদের মত বেশি হৈচৈ করে না, কারণ মেয়েদের মতো অসুবিধেয় তাদের পড়তে হয় না। সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় যার নাম দিয়েছিলেন 'কুকুর কর্ম'। রাস্তায় যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে পড়লেই হল, ভিড় ভাট্টা, পাশ দিয়ে মহিলাদের যাতায়াত, কোনও কিছুই তাদেরকে সে কাজ করতে আটকায় না। পাড়ায় পাড়ায় ড্রেনের দু'ধারে পেছন ফিরে পুরুষ মানুষের প্রস্রাব করার দৃশ্য আমাদের কাছে সুপরিচিত। কোনও কোনও পাঁচিলে ঠাকুর দেবতার ছবি সেঁটে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা করে, অনেকে লিখে দেন 'এখানে প্রস্রাব করিবেন না'। কিছুদিন পর 'না'-টা কীভাবে যেন উধাও হয়ে গিয়ে থেকে যায় 'এখানে প্রস্রাব করিবেন'। মফস্বলগুলিতে বাস স্ট্যান্ডের কাছে প্রস্রাবাগার আছে কি নেই জানা যায় না, কারণ বাস থেকে নেমেই লোকজনের মিছিল করে পাড়ার ভেতরে প্রস্রাব করতে আসার দৃশ্য দেখে দেখে আমরা বড় হয়ে গেলাম। নাকে রুমাল, মাথা নীচু করে, তাড়াতাড়ি হেঁটে পার করেছি রাস্তা, যেন আমরাই কোনও দোষ করেছি। পুরুষদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নিবারণ করতে কেউ বাধা দেয় না। ওরা জানে এটা ওদের তৈরি করা সমাজ, এখানে ওদের অসভ্যতা করা সাজে, মেয়েদের নয়। তাই ক্যারামেলাইজড পপকর্ণ বা কোল্ডড্রিংক খেতে খেতে মাল্টিপ্লেক্সে 'টয়লেট এক প্রেম কথা' দেখে ভুমি-অক্ষয়কুমারের ভূয়সী প্রশংসা করতে করতে বাড়ি ফেরার সময় ওরা রাস্তার ধারে হিসি করে হাল্কা হয়। তবেই না সিনেমা দেখা সার্থক!

হিমি মিত্র রায়

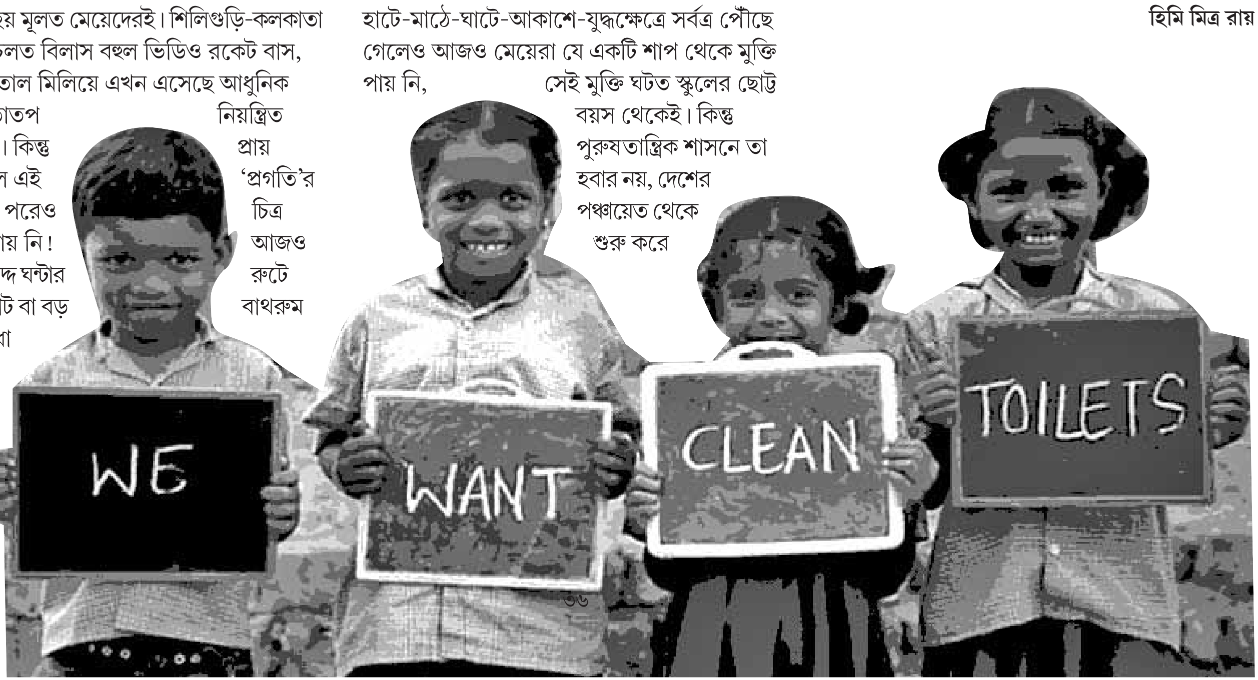

অ্যাসিড সন্ত্রাস!

শিকার মেয়েরাই!

অ্যাসিড হামলা একটি বিশেষ প্রকারের পূর্বপরিকল্পিত হিংসাত্মক শারীরিক আক্রমণ, যেক্ষেত্রে অঙ্গ-বিকৃতি, নির্যাতন, বিকলাঙ্গ বা হত্যা করবার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে অন্যের দেহে অ্যাসিড বা অনুরূপ ক্ষয়কারী পদার্থ নিক্ষেপ করা হয়। অ্যাসিড হামলা মূলত মহিলাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত একটি ঘৃণ্য অপরাধ। সমীক্ষায় দেখা গেছে, এই হামলার শিকারদের আশি শতাংশই নারী! সাধারণত মহিলাদের ওপর অ্যাসিড হামলার পেছনে থাকে অশ্লীল বা অগ্রহণযোগ্য প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, সম্পর্কের টানাপোড়েন, প্রতিহিংসা, বিশ্বাসঘাতকতার সন্দেহ, ধর্ষণের মতো যৌন অপরাধের অভিপ্রায় ইত্যাদি। ভাগ্যক্রমে অতি শীঘ্র চিকিৎসা পরিষেবা পেয়ে প্রাণে বেঁচে গেলেও, অ্যাসিড হামলার সুদূরপ্রসারী পরিণামগুলির মধ্যে রয়েছে অন্ধত্ব, পঙ্গুত্ব, মুখ ও শরীরে স্থায়ী ক্ষতচিহ্ন এবং সেই সাথে অতি গভীর সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিক সঙ্কট। সরকারী পরিসংখ্যান অনুসারে, ২০১৪ সালে সারা ভারত জুড়ে ২২৫টি অ্যাসিড হামলার ঘটনা ঘটেছে। ২০১৫ এবং ২০১৬ সালে এই হামলার ঘটনা ক্রমবর্ধিত হয়ে যথাক্রমে ২৪৯ এবং ৩০৭ সংখ্যায় এসে দাঁড়িয়েছে।

২০১৩ সালের আগে অ্যাসিড হামলায় সাজা দেওয়ার জন্য আলাদা আইনি ধারা ছিল না। বাধ্য হয়ে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৬ ধারাতেই অ্যাসিড হামলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হত। এই ধারায় শুধুমাত্র অ্যাসিডই নয়, যে কোনও বিপজ্জনক অস্ত্র বা উপায় অবলম্বন করে স্বেচ্ছায় মারাত্মক আঘাত সৃষ্টি করা সংক্রান্ত একাধিক বিষয় অর্ন্তভুক্ত রয়েছে। কিন্তু অ্যাসিড হামলার মতো ঘটনা, যা আক্রান্তের গোটা জীবনটাই নষ্ট করে দিতে পারে, সে ব্যাপারে আরও সংবেদনশীল আইনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল বেশ কিছু দিন ধরেই। সেই সূত্রেই নয়া আইন।

২০১৩ সালের ফৌজদারি (সংশোধন) আইনে অ্যাসিড হামলাকে একটি স্বতন্ত্র অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ফলস্বরূপ ভারতীয় দন্ডবিধিতে বিশেষভাবে অ্যাসিড হামলা সম্পর্কিত নতুন দুটি ধারা ৩২৬-এ এবং ৩২৬-বি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ধারা ৩২৬-এ মোতাবেক, স্বেচ্ছায় অ্যাসিড প্রভৃতি ক্ষয়কারী পদার্থ ব্যবহার করে গুরুতর আঘাত সৃষ্টি করবার অপরাধের ক্ষেত্রে নূন্যতম সাজা ১০ বছরের কারাদণ্ড, সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন কারাবাস এবং সেই সঙ্গে ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হবে। ক্ষতিপূরণের অর্থ অ্যাসিড আক্রান্তের হাতে তুলে দেওয়া হবে। তবে আক্রান্তের চিকিৎসার খরচ মেটাতে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিসম্মত হওয়া একান্ত জরুরি। এটি একটি প্রগাহ্য এবং জামিন অযোগ্য অপরাধ। শুধুমাত্র দায়রা আদালতে এই মামলার বিচার হবে। ধারা ৩২৬-বি মোতাবেক, স্বেচ্ছায় অ্যাসিড নিক্ষেপ করা বা নিক্ষেপ করবার চেষ্টা করবার অপরাধের ক্ষেত্রে নূন্যতম সাজা ৫ বছরের কারাদণ্ড, সর্বোচ্চ শাস্তি ৭ বছরের কারাবাস এবং সেই সঙ্গে ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হবে। এটিও একটি প্রগাহ্য এবং জামিন অযোগ্য অপরাধ। এক্ষেত্রেও শুধুমাত্র দায়রা আদালতে মামলার বিচার হবে।

নারীদের ওপর অ্যাসিড হামলার মতো ঘৃণ্য অপরাধকে ভারতের নিজস্ব স্বতন্ত্র সামাজিক বৈশিষ্ট্য এবং সমস্যার দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করা উচিৎ। প্রকৃতপক্ষে বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে এদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক রূপান্তরের প্রেক্ষাপটে ভারতে অ্যাসিড সন্ত্রাসের ভয়াবহতা, আকার এবং জটিলতাকে অনুধাবন করা প্রয়োজন। অ্যাসিড হামলা মূলত লিঙ্গ রাজনীতির গভীরে অন্তর্নিহিত এক ক্রমবর্ধমান লিঙ্গ ভিত্তিক অপরাধ যা পরম্পরাগতভাবে নারীদের উপর পিতৃতান্ত্রিক সমাজের নিয়ন্ত্রণ এবং সহিংসতাকে সমর্থন করে।

ফৌজদারি (সংশোধন) আইন, ২০১৩ প্রণয়নের ফলে ফৌজদারি কার্যবিধিতে একটি নতুন ধারা ৩৫৭-বি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সেই ধারা অনুসারে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৬-এ ধারা অনুযায়ী অ্যাসিড আক্রান্তকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হলেও, ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৫৭-এ ধারায় রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রদেয় ক্ষতিপূরণও আক্রান্তের অবশ্য প্রাপ্য। একই সাথে ফৌজদারি কার্যবিধিতে ৩৫৭-সি ধারাটিও যুক্ত করা হয়েছে, যার ফলে সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল অ্যাসিড আক্রান্তকে বিনামূল্যে যথোপযুক্ত প্রাথমিক চিকিৎসা বা উচ্চতর চিকিৎসা প্রদান করতে বাধ্য থাকবে। এছাড়াও ভারতীয় দন্ডবিধির ১০০ নং ধারায় বলা হয়েছে, অ্যাসিড নিক্ষেপ বা প্রয়োগ এবং অ্যাসিড নিক্ষেপ বা প্রয়োগের চেষ্টা করার ফলে গুরুতর আঘাতের আশঙ্কা থাকলে কোনও ব্যক্তি আত্মরক্ষার্থে হামলাকারীকে হত্যা পর্যন্ত করতে পারবেন! উপরন্তু, আক্রান্তকে ক্ষতিপূরণ প্রদান, বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান এবং অ্যাসিড বিক্রি নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিষয়ে ভারতের মাননীয় সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন নির্দেশনা রয়েছে, যা নিঃসন্দেহে অ্যাসিড আক্রান্তদের ন্যায় বিচারের পথ অনেকাংশে সুগম করেছে।

জাতি সঙ্ঘের প্রাক্তন মহাসচিব কোফি আন্নান বলেছেন, 'নারীদের প্রতি সহিংসতা সর্বাপেক্ষা লজ্জাজনক মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং সম্ভবত সবচেয়ে ব্যাপ্তিশীল।' তবে নারীদের ওপর অ্যাসিড হামলার মতো ঘৃণ্য অপরাধকে ভারতের নিজস্ব স্বতন্ত্র সামাজিক বৈশিষ্ট্য এবং সমস্যার দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করা উচিৎ। প্রকৃতপক্ষে বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে এদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক রূপান্তরের প্রেক্ষাপটে ভারতে অ্যাসিড সন্ত্রাসের ভয়াবহতা, আকার এবং জটিলতাকে অনুধাবন করা প্রয়োজন। অ্যাসিড হামলা মূলত লিঙ্গ রাজনীতির গভীরে অন্তর্নিহিত এক ক্রমবর্ধমান লিঙ্গ ভিত্তিক অপরাধ যা পরম্পরাগতভাবে নারীদের উপর পিতৃতান্ত্রিক সমাজের নিয়ন্ত্রণ এবং সহিংসতাকে সমর্থন করে। তাই শুধুমাত্র আইনে পরিবর্তন এনে অ্যাসিড হামলার মতো ঘৃণ্য অপরাধ বন্ধ করা কখনই সম্ভব নয়, তার জন্য প্রয়োজন আমাদের লিঙ্গ বৈষম্য দোষে দুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির আশু বদল।

রাখি পুরকায়স্থ
আইন বিশেষজ্ঞ Email: rakhe.pur@gmail.com

রূপ লাবণ্যের চাবিকাঠি রূপার কাছে

শ্রীমতী ডুয়ার্স

মেটেলির মেয়ে রূপা দে বড় হয়েছেন অনাবিল প্রকৃতির কোলে। প্রকৃতিই তার চোখে লাগিয়ে দিয়েছিল সুন্দরের রং, কানে দিয়েছিল সুন্দর সেজে ওঠার মন্ত্র। তারপর জীবনযুদ্ধে লড়াই যখন তাঁকে স্বাবলম্বী হতে শেখাল তখন সাজাবার পেশাকেই বেছে নিলেন রূপা। বিউটিশিয়ান কোর্স করে শুরু করলেন ছোট্ট বিউটি পার্লার 'লাবণ্য'। প্রথমে গতানুগতিক ফেসিয়াল, থ্রেডিং, ওয়াক্সিং, ব্লিচ, ডিট্যানিং এসব করতে করতে শুরু করেন ব্রাইডাল মেকআপ। বিভিন্ন বিয়ে বাড়িতে ডাক পড়তে থাকে তাঁর। ক্রমে দেখা যায় কনে সাজানোয় রীতিমত নাম-ডাক ছড়িয়ে পড়ছে, তাঁর হাতেই মাটিয়ালি লাবণ্য পেতে চাইছে ডুয়ার্স কন্যারা।

গোড়ার দিকে এই অঞ্চলে কনে সাজাবার যোগ্য লোকের অভাব রূপাকে এই পেশায় নিজের পায়ে দাঁড়াবার সুযোগ করে দিয়েছিল ঠিক কথা। কিন্তু পেশাদারি শৈলিতে নিজেকে ক্রমাগত উন্নীত করার প্রয়োজনীয়তা সবসময়ই উপলব্ধি করেছেন রূপা। অনলাইনে এইচ ডি মেকআপ কোর্স করেছেন কাজের ব্যস্ততার ফাঁকেই। রূপার সাজানোর মধ্যে সবসময়েই একটা ব্যতিক্রমী ছোঁয়া খুঁজে পান মেয়েরা যা তাঁকে ক্রমাগত উপরে উঠতে সাহায্য করেছে। গত দশ-বারো বছর ধরে এই কাজ তাঁকে আলাদা একটি পরিচিতি এনে দিয়েছে ডুয়ার্সের মানুষজনের কাছে। এখন শিক্ষিকা হিসেবে তাঁর কাজের কৌশলবিদ্যা ছড়িয়ে দিতে চাইছেন নতুন মেয়েদের মধ্যে, যাতে এর মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থান হয়। নিজের জায়গায় তো বটেই, এমনকি শিলিগুড়িতেও ব্রাইডাল মেক-আপের ক্লাস করাচ্ছেন রূপা। তাঁর 'লাবণ্য' ছড়িয়ে পড়ছে চতুর্দিকে। একদিকে সাজগোজের নিত্যনতুন ভাবনাকে নিয়ে আসবার তাগিদ, অন্যদিকে দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখানো এই দুইই রূপাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে প্রতিনিয়ত।

নিজস্ব প্রতিনিধি

Hotel Yubraj & Restaurant Monarch
(Air Conditioned)

Room	Single	Double
Super Deluxe (Non AC	Rs. 650	900
Deluxe AC	Rs. 990	1200
Super Deluxe AC	Rs. 1100	1300
VIP Deluxe AC	Rs. 2000	2000
Suite	Rs. 3000	3000
VIP Suite	Rs. 3500	3500
Extra Occupancy (N-AC)	Rs. 100	--
Extra Occupancy (SC)	Rs. 200	--

N.B. *Tax as per applicable*

Charu Arcade, B. S. Road, Cooch Behar
Tel. No. +91 9735526252, (03582) 227885/231710
Email: hotelyubrajcoochbehar@gmail.com
www.hotelyubrajcoochbehar.com

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ের কিছু প্রাচীন ব্রত আজও পালন করে মেয়েরা

অনেকটা পথ পেরিয়ে এসে পেছন ফিরে তাকালে মনে হয়, সেই বালিকা বয়সে দেখা ও শেখা জীবনের অনেক পাঠের অর্থই আজ অন্যরকম। কিছু ব্রত-পার্বণ, পুজো-পাঠ তো হতই বাড়িতে। আনন্দ পেতাম বৈকি। তবে আবেগ আর বিস্ময়বোধের কাজল আঁকা সে নবীন চোখ ক্রমে হারিয়ে গেছে যাপনের নানা বাঁকে। এখন ঘটনার কার্যকারণ সূত্র খোঁজে আর যুক্তি দিয়েই চুক্তি করতে ভালোবাসে এ পোড়খাওয়া মন!

তবুও কেমন মায়া জড়ানো অনন্য এক অনুভবে জেগে আছে সে মধ্যবিত্ত বাঙালি বাড়ির উঠোন, ঘরের চৌকাঠ, বৃষ্টির ছাঁটে ভেজা বারান্দা, ঠাকুরঘর, সে কাঠের সিংহাসনে! ধুনোর গন্ধ, পেতল-প্রদীপের নরম আলো যা সে ঘরের আবছা অন্ধকার দূর করতে পারে না! ছোট্ট তে-পায়ার ওপর ছোট্ট গ্লাসে জল; বাটায় বাতাসা, কলা। পাশের বাটায় পান-সুপুরি। বড় কালচে রঙের কাঠের বারকোসে ফুল-চন্দন-তুলসীপাতা, ধান-দুব্বো। দাদু খুব শ্রদ্ধা নিয়ে উচ্চারণ করতেন ‘তুলসী পত্র’। যাইহোক সে বয়সে তো সাধারণ মানুষের জাগতিক জীবনে পরমকাঙ্খিত এই ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ইত্যাকার মহাগুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোনও ধারণাই গড়ে ওঠেনি। তবু ঠাকুমার সঙ্গে রীতিমতো যুদ্ধ করে কোনও কোনও বৃহস্পতিবারে পুরোহিতের আসনটি দখল করে, পুজোর শাড়ি পরিধান করে বা শাড়ির একটি পোঁটলা হয়ে ছন্দের দোলায় দুলেদুলে পাঠ করছি পাঁচালি। যুক্তাক্ষর উচ্চারণে ঠোক্কর খেয়ে প্রশ্ন করেছি, নিশি মানে কি গো? গগন মানে কি? নানান প্রশ্নে মাতামহীকে ব্যতিব্যস্ত করেছি কম নয়। আজন্ম পরিচিত থৈথৈ চাঁদের আলোর দারুণ ম্যাজিকের ছোঁয়া ওই ‘শারদ পূর্ণিমা নিশি নির্মল গগন’ বাক্যবন্ধে! আসনে বসা হাসিহাসি মুখের লক্ষ্মী-নারায়ণের যুগল মূর্তি কী জানি কোন সে সুখের বার্তা ছুঁইয়ে দিত সে কচি অবোধ প্রাণে। পুজোর প্রসাদ, ফুল-চন্দন-ধূপের সুবাস সব মিলিয়ে অনাবিল ভালোলাগারই অনুভব।

এভাবেই কিছু বোধ, আচার, সংস্কার, রীতি-নিয়ম জমা হয়েছে মনের কোণে, হয়ত আমার মত অনেকেরই। সে বয়সে বাড়ির রীতি-নিয়ম মেনে নেওয়ার অভ্যাস ক্রমে দৃঢ় হয়। বাল্যকালে আমার মনেও এসব পুজো-পাঠ নিয়ে কোনও প্রশ্ন বা বিরূপভাব জাগেনি। আসলে বাল্যে বা কৈশোরে রবীন্দ্রজয়ন্তী বা দুর্গাপূজা, স্কুলের সরস্বতী পূজা বা বাড়ির জামাই ষষ্ঠী তথা অরণ্যষষ্ঠীর ব্রত বা বিপত্তারিণী ব্রত, নারায়ণপূজা বা শনি পূজা বা স্কুলের স্পোর্টস সে যেকোনও প্রকার উৎসব হলেই হল। সবেতেই মহানন্দে ঝাঁপিয়ে পড়া। আহা, পড়াশোনা বন্ধ! ফুল তোলো (চুরিও হতে পারে), চন্দন বেটে দাও, দুর্বা তোলো এটা করো ওটা করো — আনন্দ আর আনন্দ! জৈষ্ঠ মাসের অরণ্যষষ্ঠীর পুজোয় দাদুর শাগরেদ হয়ে সেই বটের ডাল, আমের ডাল, বাঁশের করঞ্চ ইত্যাদি নানা দ্রব্য সংগ্রহে লেগে পড়তাম, কালিপুজোয় কলাগাছ, চোদ্দশাক ঝোপজঙ্গল থেকে সংগৃহীত! একেবারে খাঁটি সে দ্রব্য। পাত পেড়ে প্রসাদ খাওয়ার জন্যে কলাপাতা জোগাড় —এমন নানা কাজে মহাব্যস্ত বাড়ির সব বাচ্চারাই ঠাকুরদার তত্ত্বাবধানে! আনন্দের আবহ গ্রামজুড়ে।

সময় বদলেছে, মানুষের চিন্তা-ভাবনাতে বদলও স্বাভাবিক। তাই বলে বাঙালির ব্রত-পার্বণে একেবারে ভাঁটা পড়ে গেছে এমনটা আদৌ নয় কিন্তু। সে গ্রাম, সে ষষ্ঠীতলা নেই ঠিকই কিন্তু পূজার উপাচার সাজিয়ে মায়েরা কালীবাড়িতে ভিড় করছেন এ দৃশ্য বিরল নয়। হলুদে ছোপানো ষষ্ঠীর ছয় ফেরতার সুতো হাতে বেঁধে, ঘাটের জল আর তালপাখার বাতাস নিয়ে ছেলে-মেয়ে-জামাইদের আমাদের চারপাশে দেখে এই অস্থির সময়ে আমরা খানিক স্বস্তি পাই বটে। সন্তান বা

এখন কথা হল সামাজিক পট পরিবর্তনের ফলে ঘরে-বাইরে নারীর অবস্থানও খানিক পাল্টেছে সে তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে বেশ পোক্ত ভূমির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা নারী এখনও পালন করেন এমনতর সব ব্রত, খুব সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও। সময়াভাবে হয়ত ঘরে নয় ঠাকুরবাড়ি গিয়ে পুজো দিয়ে আসেন। এতে কী মনে হয়? নিছকই সংস্কার? নাকি পরিজনের সুখ ও নিরাপত্তার চিরকালীন কামনা নারী মনের গভীরে শেকড় গেঁড়ে আছে, তারই ফলশ্রুতি এই ব্রত উদযাপন? লাল বা হলুদ সুতোর নিরাপত্তাবেষ্টনী বহু পুরুষ মানুষের কব্জি জুড়ে এখনও হামেশাই দেখতে পাই।

সন্তানতুল্যদের দীর্ঘায়ু ও নিরাপত্তা কামনা করেন পৃথিবীর সব মায়েরাই। ষষ্ঠীব্রত পালন শুধু ভোগের আয়োজন এমনটা নয়, নারীর দুর্বলতম স্থান, সন্তানের মঙ্গলকামনার ব্রতও বটে!

জ্যৈষ্ঠের প্রতি মঙ্গলবারে অপর এক ব্রত এখনও পালিত হতে দেখি — জয় মঙ্গলচন্ডীর ব্রত। এ ব্রত পুরোহিত নিয়ে করতে হয়। ‘মেয়েদের ব্রতকথা’য় এ ব্রতের নির্দিষ্ট নিয়মাবলী লেখা আছে। সুপুরি, ধান, দুর্বা, ফুল, পাকা আম, পৈতে, কাঁঠাল ইত্যাদি উপকরণ চাই। ব্রতশেষে ব্রতকথা পাঠ বা শ্রবণ করতে হয় এবং পুরোহিত মশাইকে সাধ্যমতো দক্ষিণা দিয়ে ফলার করাতে হয়। এই ব্রতপালনে কী ফল লাভ হয়? উত্তর হল যে রমণী এই ব্রত পালন করে তার কখনও জলে ডুবে, অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে বা অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু হয় না এবং সে হারানো বস্তু ফিরে পায়! এখানে বিশেষ কিছু প্রশ্ন উঁকি দেয় না আপনার মনে? সেই পুরাতন কালে অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয়ের ক্ষেত্রে পরমুখাপেক্ষী রমণীকুল দৈবীসহায়তা কামনায় এমনতর ব্রত পালনে যত্নশীল ছিলেন কেন? তাদের আত্মরক্ষার আকুলতার ছবিটিই কি বেশি ভেসে ওঠে না? ‘হারানো বস্তু ফিরে পাওয়া’র বিষয়টি কি পরনারী সংসর্গে লিপ্ত বা উৎসুক স্বামীটিকে ফিরে পাওয়ার ইচ্ছেকেই ইঙ্গিত করছে না? ভাববার বিষয় বৈকি।

এমনধারার আর একটি ব্রত বিপত্তারিণী ব্রত। আষাঢ়ের শুক্লা তৃতীয়া থেকে নবমী তিথির মধ্যে যেকোনও শনি বা মঙ্গলবারে এই ব্রত পালন করাই রীতি। এ ব্রতেও পুরোহিত দিয়েই করাতে হয়। ঘট, আমের পল্লব, নৈবেদ্য, ভোজ্য আর একটি চুবড়িতে ১৩টি আস্ত ফল, ১৩গাছা লাল সুতো, ১৩টি পান সুপুরি ইত্যাদি উপকরণ দিতে হবে। উপোস করে এ ব্রত পালন করতে হয়। পুরোহিতকে যথাসাধ্য দক্ষিণা ও ফলমূল ইত্যাদি দিতে হয়। পুজোর লালসুতো পুরুষেরা ডানহাতে ও মেয়েরা বামহাতে বাঁধবে। এই ব্রতের ফল কী? উত্তর হল বিপত্তারিণী ব্রত পালনে সংসারের সকল দুঃখ দূর হবে।

এখন কথা হল সামাজিক পট পরিবর্তনের ফলে ঘরে-বাইরে নারীর অবস্থানও খানিক পাল্টেছে সে তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে বেশ পোক্ত ভূমির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা নারী এখনও পালন করেন এমনতর সব ব্রত, খুব সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও। সময়াভাবে হয়ত ঘরে নয় ঠাকুরবাড়ি গিয়ে পুজো দিয়ে আসেন। এতে কী মনে হয়? নিছকই সংস্কার? নাকি পরিজনের সুখ ও নিরাপত্তার চিরকালীন কামনা নারী মনের গভীরে শেকড় গেঁড়ে আছে, তারই ফলশ্রুতি এই ব্রত উদযাপন? লাল বা হলুদ সুতোর নিরাপত্তাবেষ্টনী বহু পুরুষ মানুষের কব্জি জুড়ে এখনও হামেশাই দেখতে পাই।

সবশেষে আর একবার ফিরি সুহাসিনী আর কুমুদিনীর প্রসঙ্গে। বাল্যকালে উভয়কেই এইসব ব্রত পালন করতে দেখেছি সাগ্রহ-কৌতূহলে! তবে সারাজীবন নিষ্ঠাভরে ব্রত পালনের কোনও সুফল পেতে দেখিনি বহু সন্তানের জননী সুহাসিনীকে। দেখেছি তাঁর অসম্মানের দুঃখজর্জর শেষ পরিণতিও। আর বিপত্নীক কনিষ্ঠ পুত্রের কাছে কেটেছে কুমুদিনীর জীবনের শেষ পর্ব। সুহাসিনী কন্যাও শুনেছি তাঁর দাম্পত্যের প্রথম পর্বে কিছু কিছু ব্রত পালন করলেও বার্ধক্যজনিত কারণে কিংবা বিশ্বাসের ঘাটতিতে নিজেকে এসব থেকে সরিয়ে নিয়েছেন। তবে তাঁর কন্যাটি আধুনিকা হয়েও ঘরের কোণেই একটি-দুটি ব্রত উদযাপন করে নিজের নিয়মে। যেমন ষষ্ঠীব্রত। তরুণ পুত্রটি দূরে থাকে কর্মক্ষেত্রে, তার মঙ্গলকামনায় এই পুজোটুকু করতে যে ভাল লাগে!

সৌদামিনী রায়

শালবনে রক্তের দাগ

পুরোটাই মিথ্যে বলেছে লোকটা সন্দেহ নেই। রাঘবের এই বাড়িতে আমি অন্তত দশবার এসেছি! সবসময় ভেতরে ঢুকেছি, তা হয়ত না। কিন্তু বাড়ি ভুল করার মতো অবস্থা তো না আমার। এরা কে এবং রাঘব কোথায়? ফোন বের করে হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। রাঘবের আরেকটি নম্বর আছে আমার কাছে। সেই নম্বরে ট্রাই করে দেখছি। না, সুইচড অফ। ব্যাপারটা কী হল! রাঘবের সঙ্গে আমার দু'দিন আগেই চাপড়ামারিতে দেখা হল। অথচ দেখা হওয়ার পর থেকেই প্রায় বলা যায় রাঘব হাওয়া হয়ে গেছে! সাগরিকা রায়ের ধারাবাহিক থ্রিলার।

৪১

নিউজ চ্যানেলে দেখাচ্ছে আইভিল চা বাগানে একটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ ধরা পড়েছে। বাঘটিকে ধরার জন্য ৩ দিন ধরে বনকর্মীরা চা বাগানের ৭ নম্বর শ্রমিক লাইনে খাঁচা পেতে রেখেছিল। চিতা বাঘটাকে ধরে চিকিৎসার পরে গরুমারা অভয়ারণ্যে ছেড়ে দেওয়া হবে। রাঘবের ফোন এসেছে। ও নিউজটা দেখছে। ফোন করেছে —তোমার ওখানে তো উৎসব চলছে! যেখানে সেখানে বাঘ, ভালুক? বসে আছ হাত গুটিয়ে?

—কী করতে বল?

—জান না? সব মনে করিয়ে দিতে হবে নাকি? পাচার কর পাচার কর! আমি আসছি।

—এখনই না। তুমি কলকাতায় থাকো। আমি যাচ্ছি।

—আমি চাপড়ামারিতে এসেছি। হাসতে থাকে রাঘব —দারুণ কাজ পেয়েছি এবারে। পাশাপাশি বাঘ নিয়ে একটু খেলাধূলা করতে পারলে ভালই লাগবে।

—আমি যাচ্ছি তোমার সঙ্গে দেখা করতে।

—বেশ, চলে এস। অনেক কথা আছে। প্ল্যান করতে হবে বসে।

আমি ঝটপট ওর অ্যাড্রেস নিয়ে নিলাম। গাড়ি বের করে বেরিয়ে পড়লাম। চাপড়ামারি পৌঁছতে বেশিক্ষণ লাগল না। এরপর রাঘবের খোঁজ করলাম। একটি গ্রসারি শপের পাশের গলি দিয়ে বেরিয়ে ভগবতী বস্ত্রালয়ের জাস্ট পাশের টিনের চালওলা বাড়ির ওপরতলায় যাদব রজকের ঘর ভাড়া নিয়ে আছে রাঘব। কী কাজে এখানে এসেছে বলেনি। যাক, সেটা জানার ব্যবস্থা করে নিতে সময় লাগবে না।

রাঘব খুশি হল আমাকে দেখে —ঘরে বসি চল। কাজ কেমন চলছে বল!

ঘরে আসবাব বলতে একটি চৌকি। নীল সাদা ফ্লোরাল প্রিন্টের বেডকভারের ওপরে একটি তাকিয়া। সেটা টেনে নিয়ে বিছানার ওপর বসলাম। রাঘব বসল মুখোমুখি। ভ্রু নাচিয়ে বলল —বল বল প্রফেসর সাব। খুঁজছিলে কেন?

—আমার সঙ্গে এক জায়গায় যেতে হবে। চিলাপাতা ফরেস্টে।

—চিলাপাতা ফরেস্টে?

—ভুলে গিয়েছ চিলাপাতাকে?

—না, ওকে কি ভোলা যায়! হা হা হা! কত মজা হয়েছে ওখানে! তা তুমি ওখানে যাবে কেন? কেস আছে নাকি?

—কেস মানে ওখানে একবার যেতে ইচ্ছে করছে! ওখানেই আমি প্রথম মানুষ মেরেছিলাম। পিস্তল দিয়ে। সেই ড্রাইভারটাকে? মনে পড়ে?

—তাতে কী হল? সেখানে কী দেখতে যাবে?

—আমার মনে হচ্ছে ওখানে এমন কিছু আমরা রেখে এসেছি যা আমাদের পক্ষে ভাল না।

—কী রেখে এসেছি? ওসব মাথায় এল কেন এতদিন পরে?

অগত্যা ডিভিডির কথাটা খুলে বলতে হল রাঘবকে! কেউ একজন আছে, যে আমাদের সেই অপারেশন সম্পর্কে জানে।

—সে কে হতে পারে?

—জানি না। কোনও ধারণা নেই আমার। আমি একবার ওখানে যেতে চাই। কেন যেন মনে হচ্ছে ওই জায়গায় যাওয়া দরকার।

—তুমি কি সিমেন্টের স্ল্যাবটা নিয়ে ভাবছ?

—সবটাই ভাবছি রাঘব।

—তাহলে দু'দিন পরে প্রোগ্রাম কর। আর কিছু পাওয়া যাবে কিনা দেখ না! নাগরুর হাতে কিছু নেই?

—বেশ। কথা বলে নেব। এত তাড়াতাড়ি ঠিক হবে না। একটু সময় চাই।

আমাদের প্ল্যানটা কমপ্লীট করে চলে এলাম। সেবকের পাব-এ চলে গেলাম। অনেকটা সময় কাটালাম ওখানে। মাঝে মাঝে চেঞ্জ চাই। না হলে ব্রেনে জট পাকিয়ে যায়। লাইট ইন্স্ট্রুমেন্টের আমেজে মন ফ্রেশ লাগছে। আমি বেশি কিছু চাইনি জীবনে। একটা স্বচ্ছন্দ লাইফ স্টাইলে চলবো, ব্যাস! একটি উর্বশী এদিকে আসছে। নীল রঙের টপে রয়েছে কর্ডওয়ার্কের সঙ্গে হ্যান্ড কাট ফ্লোরাল আপ্লিক। নীলের দুটো শেড দারুণ ব্যালান্সড। ড্রেস নিয়ে আমি ভাবি। এটা হয়েছে রুক্মিণীর জন্য। ওর ড্রেস কালেকশন দারুণ ছিল। উর্বশী আমার দিকে তাকিয়ে এক চিমটি চিনি ছড়াল। ভারি মিষ্টি মেয়ে। ইশারায় ডেকে নিলাম। আজ দুজনে মন্দ হলে!

ঘণ্টা মেপে থাকল উর্বশী। আমিও চলে এলাম বাড়িতে। আজ গয়েরকাটার বাড়িতে থাকব। দুটো দিন এখানেই থাকি। পরশু রাঘবের সঙ্গে ফিরে যাব বাড়িতে। ওখান থেকে চিলাপাতায়।

ভোরে উঠে রাঘবকে ফোন করেছি। রাঘব ফোন রিসিভ করল না। ব্যাটা

ঘুমোচ্ছে। অপেক্ষা করে ফের ফোন করেছি। করেই চলেছি। আশ্চর্য! রাঘব কি কলকাতায় ফিরে গেল? সিওর সিম চেঞ্জ করেছে। কী কাজে এসেছিল কেই বা জানে! তাহলে কী করব? না, আমি কলকাতায় যাব আজই। ফ্লাইটে চলে যাব। রাঘবকে আমার দরকার। রাঘব কেন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করছে না জানি না। জানতে হবে।

ফ্লাইটে চলে এসে রাঘবের বাড়িতে যাচ্ছি। যে ভাবে হোক রাঘবকে নিয়ে কালই ফিরে যেতে হবে ডুয়ার্সে।

গলি দিয়ে ঢুকে রাঘবের বাড়ির সামনে এসে দরজায় নক করলাম। সেই মেয়েটি কি আছে এখনও? কোমরে রঙিন পুঁতির সরু চেইন ছিল। ভারি বুক, সরু কোমর আহা! আরেকবার সুন্দরীকে দেখা যাবে!

কেউ দরজা খুলল না। ফের নক করে ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম। ঠিক বাড়িতে এসেছি তো! এই তো তুঁতে রঙের দরজা। সামনে বালতি মগ। এক গাদা জল পড়ে আছে। ফের কড়া নাড়তে যাচ্ছি, দরজা খুলে গেল। একটি বয়স্ক বিহারি লোক ভ্রূ কুঁচকে মুখ বের করেছে —ক্যা হ্যায়?

—ক্যায়া হ্যায় মানে রাঘবকে ডাকুন। বলুন শিলিগুড়ি সে এক আদমি আয়া।

—রাঘপ? কৌন রাঘপ? ইঁহা কোই রাঘপ নেহি রহতা।

—মানে?

—হাঁ জি। ম্যায় ইঁহা একসাল সে রহতা হুঁ। রাঘপ কো নেহি জানতা। দরজা বন্ধ হয়ে গেল মুখের ওপর। আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম লোকটার কান্ড দেখে। কথা বলতে চায় না কেন?

পুরোটাই মিথ্যে বলেছে লোকটা সন্দেহ নেই। রাঘবের এই বাড়িতে আমি অন্তত দশবার এসেছি! সবসময় ভেতরে ঢুকেছি, তা হয়ত না। কিন্তু বাড়ি ভুল করার মতো অবস্থা তো না আমার। এরা কে এবং রাঘব কোথায়? ফোন বের করে হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। রাঘবের আরেকটি নম্বর আছে আমার কাছে। সেই নম্বরে ট্রাই করে দেখছি। না, সুইচড অফ। ব্যাপারটা কী হল! রাঘবের সঙ্গে আমার দু'দিন আগেই চাপড়ামারিতে দেখা হল। অথচ দেখা হওয়ার পর থেকেই প্রায় বলা যায় রাঘব হাওয়া হয়ে গেছে! যেন হাওয়ায় মিশে গেছে। যদি এমন হত, বিশেষ কোনও কাজে রাঘবকে কোথাও যেতে হয়েছে, সেটা যেভাবেই হোক আমাকে জানাতো ও। নিজের ঘরে অন্য লোক বসিয়ে পালাবে রাঘব? কার ভয়ে পালিয়েছে ও? নাকি রাঘবের পুরো অস্তিত্ব অস্বীকার করার চেষ্টা করা হচ্ছে? কারা করবে এমন? রাঘব কেন চাপড়ামারিতে গিয়েছিল আমি জানি না। ও বলতে চায়নি। সেখানে কিছু হয়ে গেল না তো? ডিভিডিতে রাঘবকে দেখা যায়নি। তার মানে আরেকটা রেকর্ডিং নেই এমন হতে পারে? সেখানে রাঘবের বিরুদ্ধে প্রমাণ রয়েছে নিশ্চয়। যদিও এসবই আমার ধারণা। হয়তো পুরোটাই রাঘবের একটা চাল। জীবনে কাজ কিছু কম করেনি। পাখির খাঁচায় করে জাল নোট নিয়ে এসেছে বাংলাদেশ থেকে। পশু, নারী যা পেয়েছে পাচার করেছে। আমি তো ওর কাছে শিশু। সেদিন গুলিটা চালাতে ও-ই বাধ্য করেছিল বলব না, প্রেরণা দিয়েছিল বলা ভাল।

আরেকবার দেখি। ফোন হাতে নিয়ে রাঘবের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কল করি। আরে, ফোন বেজে উঠল না? হ্যাঁ, ফোন বাজছে! রাঘব ফোন রিসিভ করেছে? আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম —হ্যালো হ্যালো রাঘব!

ওপাশ থেকে রিনিরিনে গলায় কে বলে উঠল - হ্যালো!

৪২

হ্যালো শব্দটা শোনার পরই লাইনটা ডিসকানেক্ট হয়ে গেল। আর কিছুতে লাইন পেলাম না। আমার মনে হল এখানে থেকে লাভ নেই। ফিরে যাওয়াই ভাল। ফিরে যাব ভেবে পা বাড়িয়েছি, দরজা ফাঁক করে বিহারি লোকটি দেখছিল আমাকে। আমি ফিরে তাকাতেই দরজা বন্ধ করে দিল। অদ্ভুত কান্ড চলছে তো! মন বলছে এখানে থাকা নিরাপদ নয় আমার পক্ষে। বাড়ি ফিরে যাওয়াই ভাল। সোজা আলিপুরদুয়ারে যাব। আর আমি নিজেই চিলাপাতায় যাব। কেউ কি আটকাতে চায় আমাকে? পারবে না। আমি যাবই। কে থাকতে পারে এসবের পেছনে? অনেকদিন ধরেই একটা চক্র চলছে। ব্যূহ ভেদ করে জানতে হবে কে আছে এসবের পেছনে। রাঘবকে গুম করা হয়েছে ,অথবা রাঘব নিজেই

সেদিন আমাকে মেরে ফেলতে ঢুকেছিল একটা লোক আর একটা মেয়ে। বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ে আমাকে বাধ্য করছিল আত্মহত্যা করতে! এত সহজে তো মেয়েটিকে ছেড়ে দেওয়া যায় না। নাঃ! মাথাটা গরম হয়ে গেছে। উঠে একটু হুইস্কি খাই। ঘুম হবে। উঠে সেলার থেকে হুইস্কি নিয়ে সবে বসেছি। টুক টুক টুক! দরজায় টোকা পড়তে শুরু হল।

লুকিয়ে আছে। যে কাজে ও চাপড়ামারিতে গিয়েছিল, সেই কাজের ভেতরেই ওর হাপিস হয়ে যাওয়ার কারণ লুকিয়ে আছে হয়ত।

ফ্লাইটে পরদিন চলে এলাম আলিপুরদুয়ারে। মন বিভ্রান্ত হয়ে আছে এটা অস্বীকার করতে পারছি না। রাতে ঘুম হল না। কেমন এক অস্বস্তি ঘোরাফেরা করে চলেছে মনে। ওয়াইন নিয়ে বসেছিলাম প্রিয় ব্যালকনিতে। একা একা কি এসব ভাল লাগে! রুক্মিণী আমাকে ব্ল্যাকমেইল করতে এসেছিল! কত সাহস! চলে যেতে বাধ্য হল। নাহলে আজ রুকুর সঙ্গে রাতটা কাটাতাম। রাতে নানা চিন্তায় ঘুম আসছিল না। দরজায় টোকা পড়ছিল। তন্দ্রা কেটে গেল। এতবড়ো বাড়িতে আমি ছাড়া কেউ নেই বলে বাড়িটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধ করে রেখেছি। কেউ ঢুকে টোকা মারবে, এমন সুযোগ কোথায়? অথচ টোকা পড়ছে এ তো সত্যি! কিছুক্ষণ কান পেতে শুনে গেলাম। নাঃ! ভুল শুনিনি! দরজায় টোকা পড়ছে! বাড়ির ভেতরে ঢুকে আমার বেডরুমের দরজায় নক করছে কে? আমি আস্তে উঠে বসলাম বিছানায়। আমার পিস্তলটা হাতে নিলাম। যে-ই আসুক, শুভ উদ্দেশ্যে আসেনি, এ বোঝাই যাচ্ছে! আমাকে কেউ ফোন করেনি। যদি সত্যি এতোটাই প্রয়োজন থাকতো, তাহলে আগে ফোন করতো। আচ্ছা! রাঘব নয়তো?

তাড়াতাড়ি করে নেমে পড়লাম। দরজার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম —কে? রাঘব?

—দরজাটা খুলুন স্যার। আমি শ্যামল স্যার।

স্থবির হয়ে গেলাম। শ্যামল কোথা থেকে এসেছে এখানে? পরপারের দূত দাঁড়িয়ে আছে দরজার ওপাশে!

পরদিন সূর্যের আলোয় সব ভ্রান্তি কেটে গেল। আমার বিভিন্ন দুশ্চিন্তার ফসল এই সব অনাহূত ঘটনা। আমি রাঘবকে নিয়ে চিন্তা করছি, ভয় পাচ্ছি। মন বলছে রাঘব আর নেই এই গ্রহে। কে ওকে ডেকে এনেছিল এই নর্থবেঙ্গলে ও বলেনি! সেটাই নির্দেশ ছিল নিশ্চয়। আর আমি যে রাঘবের কাছে গিয়েছিলাম, সেটাও তার বা তাদের নজরে পড়েছে! এরপর কি আমার পালা? ড্রয়ার খুলে লোডেড রিভলবার নিয়ে কাছে রাখি। ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে থেকে মরবো না। কিন্তু কোনও ভাবেই আড়ালে থাকা মেঘনাদকে খুঁজে পাচ্ছি না। অথচ সে আমার কাছে রয়েছে বলে আমি মনে করি। সরলা, শ্যামল, রুক্মিণী সত্যম কেউই নেই। স্পাইং করবে কে? একজন বাইরের লোক রাখিনি। আমি একা থাকি। টাকা খাইয়ে লোকগুলোকে কেউ হাত করেছিল আমার বিরুদ্ধে। নাহলে আমার সিকিউরিটি গার্ড অনিলের কী দরকার ছিল ওদের হাতে চলে যাওয়ার? সরলা মুখ খোলেনি। অনিলও খুলবে না। টাকার পাশাপাশি ওদের ভয় দেখানো হয়েছে। আপনজনের মৃত্যুভয়! একধাঁচের মৃত্যুভয়!

আজ খুব ভাল করে ক্লাস নিলাম। ছাত্রছাত্রীদের সব প্রশ্নের জবাব দিলাম। খোশমেজাজে ক্লাসগুলো নিয়ে বাড়িতে ফিরছি। ড্রাইভ করতে করতে মনে হল আচ্ছা, রাঘব কি নাগরুর সঙ্গে দেখা করেছিল? ওর পয়সার দরকার ছিল বলেই বারবার ধরা পড়া চিতাটার কথা বলছিল। আমাকে চিলাপাতা খুব টানছে। আজ না হোক কাল আমি যাব সেই জায়গাটা দেখতে।

গাড়ি গ্যারেজ করে এসে দাঁড়ালাম আমার বাড়ির লনে। চমৎকার ফুল ফুটেছে। একজন দেখাশোনার লোক চাই। আগে যে করতো, সে বড্ড বুড়ো হয়ে গেছে। মেয়ের কাছে চলে গেছে দু'মাস আগে। খুব হাঁপাচ্ছিল ইদানিং। একটা অ্যাড দেওয়া যায় লোকাল কাগজে। আজ বাড়িতে রান্না করব। নিজেই লেগে পড়লাম। চিকেনের পিস করছি, হাত থেকে চপারটা পড়ে গেল। তুলতে যাচ্ছি, কাউকে সরে যেতে দেখলাম কিচেনের জানালার পাশ দিয়ে। অদ্ভুত কিন্তু দাঁড়িয়েছিল সোজা দুপায়ে। কালো লম্বা মুখের অনেকটা ধনেশ পাখির মতো। এটা কী? কোনও জন্তু নয়তো? হলেও এতটা ওপরে উঠে আসবে কেমন করে? এটা কি জন্তু নাকি আমাকে ভয় দেখাতে চেয়ে মুখোশ পরে এসেছে? কিচ্ছু বিশ্বাস নেই সুভদ্র। এসব ক্ষেত্রে তুমি কী করতে? পিস্তলটা সামনে রাখো।

সেদিন যখন গয়েরকাটায় গিয়ে ছিলাম, থানায় গিয়ে সন্দীপের সঙ্গে দেখা করে এসেছি। সন্দীপ কোনও আশ্বাস দিতে পারেনি। ওই মেয়েটাকে খুঁজে পায়নি। তবে নজর রাখছে থানা। আমি এসব ধানাইপানাই গ্রাহ্য করিনি। এটাকে এলেবেলে কাজ বলে মনে করছে থানা? সেদিন আমাকে মেরে ফেলতে ঢুকেছিল একটা লোক আর একটা মেয়ে। বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ে আমাকে বাধ্য করছিল আত্মহত্যা করতে! এত সহজে তো মেয়েটিকে ছেড়ে দেওয়া যায় না। নাঃ! মাথাটা গরম হয়ে গেছে। উঠে একটু হুইস্কি খাই। ঘুম হবে। উঠে সেলার থেকে হুইস্কি নিয়ে সবে বসেছি। টুক টুক টুক! দরজায় টোকা পড়তে শুরু হল। চুপচাপ দরজার দিকে তাকিয়ে থাকি। পিস্তলটা হাতে নিয়ে রাখি। ফের শব্দ টুক! টুক! টুক!

রাতে বেডরুমে ঢুকতেই জানালার জীবটা উঁকি মারতে শুরু করেছিল মনের কোণে কোণে। কী ছিল

ওটা? সেটা নিয়ে অনেকক্ষণ ভেবেছি। তারপরে আবার দরজায় টোকা! আজ স্বপ্ন দেখছি না। পুরো সজ্ঞানে আছি। আচ্ছা, আজ দেখতে হবে কে এসেছে। এগিয়ে গিয়ে দরজার পাশে দাঁড়াই। জোরে হাঁক পাড়ি —কে? কে বাইরে?

টোকা দেওয়া বন্ধ হয়ে গেল। কেউ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল —স্যার! আমি শ্যামল! বড্ড যন্ত্রণা! আমি এক ঝটকায় দরজা খুলে পিস্তল তাক করি। এক গুলিতে তোর মাথা উড়িয়ে দেব। কিন্তু দরজার বাইরে হা হা করছে শূণ্যতা। এটা কী হল? ছুটে বারান্দায় বের হই। পটাপট একটা করে আলো জ্বালতে থাকি। পুরো বাড়ি জুড়ে ছোটাছুটি করতে থাকি। একবার সিঁড়ি বেয়ে নীচের ফ্লোরে যাচ্ছি, তো একবার ওপরে উঠে আসছি! লম্বা বারান্দা দিয়ে দৌড়ে দৌড়ে ঘুরছি। কে আছিস, সামনে আয়। মজা দেখাচ্ছি। আমাকে চিনিস না! প্ল্যান করে কেউ ভয় দেখাচ্ছে ভেবেছিলাম। কিন্তু যে মুহূর্তে টোকা পড়েছে, সেই মুহূর্তে দরজা খুলেছি। তাহলে এত তাড়াতাড়ি সে কোথায় যাবে? প্রতিটি দরজার মুখেই যেমন তালা মেরেছি, লক করেছি, তেমনি রয়েছে। তাহলে? কে এসেছিল? শ্যামলের ভুত এসে কান্নাকাটি করছে? এটা আমি বিশ্বাস করতে পারি? সারাজীবন যে লোকটা কাঁচা রক্তে স্নান করেছে, সে কি না একটা টুক টুক টোকা শুনে ল্যাদ খেয়ে পড়ে থাকবে! আজ বাদে আমি ফের চিতা চালান দেব। নখ-দাঁত উপেক্ষা করে চলি, আর আমাকে সস্তার ভয় দেখিয়ে বিরক্ত করা হচ্ছে?

মাথা ঠান্ডা করে ভাবতে বসি। ভূতফুত বিশ্বাস করি না। কেউ আমাকে হ্যারাস করছে। একটা ফাঁদ পেতে ওকে ধরে ডাক্তার বনানী চৌবের কাছে পাঠিয়ে দেব। কিডনি পাচার হয়ে যাবে। রক্ত পাচার হয়ে যাবে!

কুল কুল! আস্তে আস্তে হুইস্কিতে চুমুক দিতে থাকি। পেছনে সত্যি কি কেউ লেগেছে? আমার অপরাধের বোঝায় আমার মানসিক স্থিতি একটু নড়বড়ে হয়ে গেছে। ফিরে এস সুভদ্র। আগের জায়গায় স্থির হও। নতুন করে ভাবতে থাকো। একটা ডিভিডি তোমার জীবন উলটে দিতে পারে ?

৪৩

স্টেশনে লোকটাকে পেয়ে গেলাম। আজ নিয়ে তিনদিন ধরে খুঁজছি একে। আমাকে প্রথমে চিনতে পারল না। হাতে টাকা গুঁজে দিতে হ্যা হ্যা করে হেসে উঠল —বারে বা! লোক আপনি বড়ই ভাল দেখি!

—আরও দেব। তুমি বলতো, দুর্গাপাড়ার বাড়িটা মানে ঝুপড়িতে কে তোমাকে নিয়ে গিয়েছিল?

—দুর্গাপাড়া? লোকটা মিটমিট করে তাকাল —ওইখানে সরলা নিয়ে গেছিল গো। বলল —দুটো দিন থাকবি একটা মেয়েছেলের সাথে। লোকে জিজ্ঞাসা কল্লে বলবি বউ। আর কেউ যদি বলে কী কাজ কর? বলবি —জ্বর হয়েছে। কাজ কত্তে পারি না।

—কার কথা বলেছিল সরলা? কোন লোক?

—একটা বাবু লোকের কথা বলেছিল সরলা গো। আপনারই মতো বাবু লোক।

লোকটার হাতে একশো টাকার নোট গুঁজে দিয়ে চলে এলাম। জানা হল না সরলাকে নির্দেশ দিয়েছিল কে মেয়ে-জামাই সাজিয়ে ঝুপড়িতে রাখতে? কেন বলেছিল? যাতে সরলা রাতের বেলায় কার সঙ্গে দেখা করতে যায়, সে কথা প্রকাশ না পায়! আসল কথা ঢাকতে নকল কথার আমদানি হয়েছিল।

আমি টেক-স্যাভি। ডিজিটাল দুনিয়ার যন্ত্রপাতি, সফটওয়ারের খবর পেলেই হল। বাচ্চাদের গেম খেলি। আজ কিছুতে মন নেই। অনেক প্রশ্নের জবাব পাচ্ছি না। দরজায় টোকা কেন? শ্যামল কী করে ফিরে আসবে এই জগতে? মেয়েটা হাওয়ায় মিশে গিয়েছে? রাঘবের কী হল? জানি না! অঙ্ক মিলছে না!

আচ্ছা, সরলাকে কতদিন ধরে চেনে লোকটা? সরলা কি আগেও ওকে দিয়ে কাজ করিয়েছে? এখন কটা বাজে? রাত হয়েছে অবশ্য। তাতে কী? আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্টেশনের দিকে হাঁটতে থাকি। আজ বৃষ্টি নেই। স্টেশনের পুরো চত্বরে কত লোকজন! হইচই। হাঁটাহাঁটি, কুলি, প্যাসেঞ্জার। এখানে রাতের বেলায় লোকটাকে পাব কোথায়? একদিক থেকে অন্যদিকে ঘুরে বেড়াই। খুঁজতে থাকি। আশ্চর্য হই না। ওটা পাতাখোর। কোথায় কোন আড্ডায় জমে আছে, কে জানে! স্টেশনের পেছনের দিকে থাকতে পারে। পা বাড়াতে গিয়ে দাঁড়ালাম। ওদিকে বেশ অন্ধকার। এমনও হতে পারে কেউ আমাকে আড়াল থেকে লক্ষ্য করে চলেছে! অন্ধকারে সে আমার পিছু নিতে পারে!

অন্ধকারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। একতাল জমাট অন্ধকার কথা বলছে। আমার সম্পর্কে বলছে! পাতাখোরের গলা চিনেছি। সঙ্গে কে ছিল? ওরা আমাকে নিয়ে আলোচনা করছিল। পেছনে দাঁড়িয়ে ওদের দেখার চেষ্টা করি। দুটো ছায়া চলে যাচ্ছে। একজন কোলকুঁজো। অন্যজন লম্বা। কারও চেহারাই সামান্য বোঝা গেল না। কোনদিকে যাচ্ছে ওরা?

অন্ধকার ভারি অদ্ভুত। একবার টেনে নিলে আর বাইরে বের হতে দেয় না। কিছুতেই দেবে না। ওখানে আমাকে ডুবে যেতে হতে পারে। সুভদ্র, সামলে। অন্ধকারে যাওয়া ঠিক হবে না।

কিন্তু ফিরে যাব? মন বলছে লোকটার থেকে কিছু ইনফর্মেশন পাব। লোকটাকে পাব কোথায়? আজ ভুল করে পিস্তলটা নিয়ে বের হইনি। একা আমি আজ। নাঃ! মন টানছে না। ফিরে যাই। কাল আসব। দরকারে লোকটাকে বাড়িতে নিয়ে যাব।

আমি ফিরে চললাম। স্টেশন চত্বর ছাড়াতেই রাস্তাটা ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে। উলটো দিক থেকে হাজার হাজার গাড়ি ছুটে আসছে যেন। হেডলাইট জ্বালিয়ে ছুটছে গাড়ি। আমি ডান দিকের রাস্তায় নেমে যেতে থাকি। এদিকে অটো, রিকশা ইত্যাদি চলছে। এই আলো, এই অন্ধকার! আলো আর ছায়ার কাটাকুটি খেলা দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি। হঠাৎ মনে হল মোবাইল ভাইব্রেট করছে। কার ফোন? নম্বরটা অচেনা। সুইচ অন করতেই ফিসফিসে কথা শোনা গেল —সুভদ্র, পালাও। আমি রাঘব। তুমি পালাও। আমাকে খুঁজছে ওরা। আমাকে মেরে ফেলার জন্য এনেছিল। আমি পালিয়ে আছি। ওরা আসছে। কিছুই বুঝলাম না! রাঘব ফোন করে কী বলল? আমি ওকে ফোন করতে যেতে থমকে গেলাম। রাঘব বলল, ওরা আসছে। তাহলে ফোন রিং হলে ওরা শুনতে পাবে। রাঘব বিপদে পড়ে যাবে। ধরা পড়ে যাবে রাঘব। এখন আমাকে পালাতে বলেছে কেন? কার কাছ থেকে পালাব? অদ্ভুত তো! চাপড়ামারিতে রাঘবকে ডেকে এনেছিল মেরে ফেলার জন্য? আমি অন্ধকারে লুকিয়ে আছি। অন্ধকার দিয়ে বাড়িতে পৌঁছতে হবে। চারপাশে তাকিয়ে সাবধানে পা বাড়াই।

ভারি অন্ধকার! পা ফেলছি কোথায় বুঝতে পারছি না। এদিকে একেবারে আলো নেই। আমি কোথায় যাচ্ছি? রাস্তায় লোকজন নেই প্রায়। অটো, রিকশার প্যাঁক প্যাঁক, এসবের মধ্যে অচেনা লাগছে রাস্তাটা। এলাম কোনদিকে যে! এটা কি খেজুরডাঙা? এদিকে এলাম কী করে? অন্ধকারে বুঝতে পারিনি আসলে! একটু দাঁড়িয়ে থেকে চোখ সইয়ে নিলাম। দূরে দূরে আলো দেখা যাচ্ছে। আমি সোজাসুজি না গিয়ে উলটো পথে চলে এসেছি। খুব সাবধানে পা ফেলতেই গর্তে পা পড়ে গেল। উফ্, ব্যাথা লেগেছে। কিন্তু বেশি কিছু হল না। আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে হাঁটতে থাকি। পাশ দিয়ে লোকজন যাচ্ছে এখন। অনেকটা চলে এসেছি লোকালয়ের কাছে। কী করে যে এতটা দূরে চলে গিয়েছিলাম! ভুলভুলাইয়ায় পেয়েছিল আমাকে! হা হা হা! মন এমন বিক্ষিপ্ত থাকলে এই রকম হয়। মাথা ঠিকঠাক কাজ করছিল না। রাঘব ফোন করে কী বলে গেল বুঝতেই পারছি না। আমার পেছনে ফেউ লেগেছে এটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম অনেক আগেই। ফিনাইল বেচতে এসেছিল যেদিন মেয়েটা! কিন্তু কিন্তু আমাকে পালাতে বলছে কেন রাঘব? কোথায় পালিয়েছে ও? এভাবে হেরে যাব কার কাছে? কেন? আমার জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে চলে। মরতে ভয় নেই। কিন্তু প্রশ্নটা হল মরবো কেন? অথচ রাঘবের মতো বাঘা লোক বুঝে গেছে যে জীবন দুলছে! একটা সরু সুতোয় জীবন দুলছে। যে কোন সময় ছিঁড়ে যাবে দড়ি!

—আরে, লোকটা আমার কাছে এসেছিল। বলে কি না সরলা তোমাকে ওখানে নিয়ে গেল কেন? এই কথা শোনার জন্য টাকা দিয়েছে মাইরি! ভাবছি, সরলাকে নিয়ে এত ভাবছে কেন লোকটা? সেদিন গাড়ি চেপে এসেছিল দুর্গাপাড়ায়। আজ এসেছিল স্টেশনে। ভাবছি লোকটা সরলাকে নিয়ে এত ভাবছে কেন?

—সরলা মরে গেছে। লোকটা সেটা জানে?

—সেটা তো জানতে চাইনি।

—কাল আসবে লোকটা। তোকে খুঁজবে। তখন জানতে চাইবি, সরলা মরে গেছে, তুমি জানো? কী বলে শুনবি। লোকটা মেরে দিয়েছে সরলাকে। কিন্তু প্রমাণ নেই!

অন্ধকারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। একতাল জমাট অন্ধকার কথা বলছে। আমার সম্পর্কে বলছে! পাতাখোরের গলা চিনেছি। সঙ্গে কে ছিল? ওরা আমাকে নিয়ে আলোচনা করছিল। পেছনে দাঁড়িয়ে ওদের দেখার চেষ্টা করি। দুটো ছায়া চলে যাচ্ছে। একজন কোলকুঁজো। অন্যজন লম্বা। কারও চেহারাই সামান্য বোঝা গেল না। কোনদিকে যাচ্ছে ওরা? খেজুরডাঙার দিক থেকেই এল মনে হচ্ছে। কাল পল্টুকে ফোন করে আনতে হবে। পল্টু কাজ ভাল করে। পাতাখোর হয়ে এই পাতাখোরের সঙ্গে দোস্তি পাতাবে। খবর চাই আমার। একটা বড় কাজ করার সময় এসেছে। সাপের বাচ্চাকে বড় করে বিক্রি করেছি সেই ছেলেবেলায়। আমাকে খেলা দেখিও না। আমি রাঘব নই হে। দু'হাতে রক্ত মাখা আমার শখ। দেখ, সামনে এসে ভয় পেওনা! শালা পাতাখোর! কাল তোকে বলতে হবে তোর সঙ্গে কে ছিল!

৪৪

স্টেশনে গেলাম না। পল্টু কাজ শুরু করেছে। কিছু কথা

আদায় করে নেবে পাতাখোরের থেকে। আজ স্টেশনে আমার জন্য ওরা অপেক্ষা করে আছে। থাকুক। পল্টুকে বলেছি, পাতাখোরের কাছাকাছি যে বা যারা আসবে, মোবাইলে তাদের ছবি তুলে নিতে। পল্টু পারবে কাজটা। আমার শুধু অপেক্ষা করা ছাড়া কাজ নেই। ঘোর বর্ষা শুরু হল বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ। সারাদিন শুয়ে বসে থাকতে ভাল লাগে না। সিকিউরিটি এজেন্সিতে ফোন করলাম। একজন অলটাইম গার্ড চাই। ওরা অ্যাড্রেস নিয়ে রাখল আমার। ঘন্টা খানেকের মধ্যে গার্ড চলে আসবে। অভিজ্ঞ লোক চাই। এখন কাজ কিছু নেই। বাড়ির ভেতরে ঘুরেফিরে দেখছি। বাইরে অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ছে। দোতলা থেকে নেমে গ্রাউন্ডে এলাম। এই দিকটাতে মোটেই আসা হয় না। এত বড় বাড়ি! বসবাসের লোক নেই! নীচেও সার সার ঘর। অবশ্য লাইব্রেরিটা ব্যবহার করি। পেছনের দিকের ঘরগুলো বন্ধই থাকে। একদিন লোক লাগিয়ে সাফ করিয়ে রাখতে হবে। হুম, এই ঘরের দরজা ভেজিয়ে রাখা! তালা নেই! এই ঘরে কী আছে? মুখ বাড়িয়ে ঘরের ভেতরটা দেখতে গিয়ে অবাক হলাম। একটা জানালা, কপাট দুটো ভেজিয়ে রাখা নাকি? কী কান্ড! সাপ, ব্যাঙ যা খুশি ঢুকে পড়তে পারে। জানালার কপাট টেনে বন্ধ করে দিতে গিয়ে দেখলাম আরও অবাক কান্ড। জানালায় লোহার গরাদ ছিল আগে, সেটা খুলে ফেলা হয়েছে! পুরো জানালা গরাদবিহীন হওয়ায় হা হা করছে শূণ্যতা। এখান দিয়ে ইজি যে কেউ ঢুকে যেতে পারে! আমি তো এসব খেয়ালই করিনি। কে খুলেছে জানালার গরাদ? কেউ কি আসে এখান দিয়ে? যে-ই আসুক, সরলা-শ্যামল জানতো ওরা এই জানালার গোপন খবর। যে এসে দরজায় টোকা দিয়ে আমাকে ভয় দেখায় সে এই পথে আসে যায়! এতবড়ো ফাঁকি আমার অজ্ঞাত ছিল! সিকিউরিটি অবশ্যই চাই আমার। আসলে ভয় না পেলেও আক্রমণ হতে পারে ভেবে এই স্টেপ নিতে হল। যে কেউ বাড়ির ভেতরে ইচ্ছেমতো ঢুকে পড়ছে কীভাবে? এখন পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। আমার অনুপস্থিতিতে গরাদ ভেঙে ফেলা হয়েছে। এই ঘর একসময় বাড়ির যাবতীয় ব্যবহারের অযোগ্য জিনিসে ভর্তি থাকতো। পুরনো সাইকেল, আলমারি, ট্রাঙ্ক, পুরনো ম্যাগাজিন! মনে আছে আমার। দাদুর আমলের বাড়ি। তখন জানালায় লোহার গরাদের চল ছিল।

জানালাটা বন্ধ করে ছিটকিনি আটকে দিলাম। একটা কাঠের বাটাম আড়াআড়ি ভাবে আটকে দিয়ে জানালা একেবারে সিল করে দিতে হবে। কাঠ মিস্ত্রি ছিল, কী নামটা আমার কল লিস্টে আছে এই যে কাঠমিস্ত্রি সুবোধ! ফোন ধরেছে সুবোধের ছেলে। সে নিজেই কাজ করে। অ্যাড্রেস নিয়ে রেখে দিল। আমি বলেছি আজই আমার চাই কাজটা। আর আইডি কার্ড নিয়ে আসে যেন। বৃষ্টি ধরলেই আসবে বলল। সিকিউরিটিকে বলে রাখলাম মিস্ত্রি আসবে। ভোটার আইডি দেখে ভেতরে যেন ঢোকানো হয়। বাড়ির আনাচকানাচে দেখে, সার্চ করে স্বস্তি হল।

ঘড়ি দেখলাম একটা বেজে গেছে। বৃষ্টি থামার লক্ষণ নেই! এমন সময় ফোনটা এল। একটা অচেনা নম্বর। কিন্তু নম্বরটা সেভ না করলেও মনে পড়েছে। কাল এই নম্বর থেকে রাঘব ফোন করেছিল। কুইকলি ফোন রিসিভ করলাম। রাঘব! খুব দ্রুত কথা বলছিল রাঘব। যেন লুকিয়ে লুকিয়ে কথা বলছে। সুভদ্র! সুভদ্র! চিলাপাতা নিয়ে কথা আছে তুমি চলে আসবে চিলাপাতার কাছে কোথাও। আমি তোমার সঙ্গে ঘণ্টা পরে যোগাযোগ করে নিচ্ছি। ফোন কেটে দিল আমি কিছু প্রশ্ন করার আগেই।

ঘন্টা পরে মানে রাঘবের ভাষায় এক ঘণ্টা পরে। তাহলে এখনই বেরিয়ে পড়া যাক? আজ ডিনার হয়নি। চটপট কফি বানিয়ে ফ্লাস্কে ভরে নিলাম। কিছু বিস্কুট। বোতলে জল। জানি না হয়ত এগুলো রাঘবের লাগতে পারে। কিছু টাকাও নিলাম। কী অবস্থায় আছে রাঘব কে জানে। হয়তো ঝামেলা পেছনে লেপটে আছে। না হলে আমার বাড়িতে চলে আসতো ও। একবার রাঘবের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করলাম। হল না। সুইচড অফ। রাঘব কেমন আছে! ওকে আমার বাড়িতে এনে লুকিয়ে থাকতে সাহায্য করব। থাকুক এখানে। আমারও বল-ভরসা বাড়বে!

যাক, দেরি করব না। রেইন কোট গাড়িতে আছে এক সেট। গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করলাম। রাঘবকে ছাড়া আমার অনেক কাজ আটকে আছে। ফের দু'জনে মিলে যৌবন বয়সের মতো উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতে হবে। বড্ড মিইয়ে পড়েছি। ফের দাপিয়ে উঠতে হবে রাঘব! শম্ভুর অভাব খুব অনুভব করি আজকাল। রামদা শম্ভু!

উফফ! বৃষ্টি যেন আরও জেদ নিয়ে নামল। ওয়াইপার জল সেঁচে সেঁচে টায়ার্ড। উইন্ড স্ক্রিন জলে ধুয়ে যাচ্ছে বারবার। সামনের রাস্তা ঝাপসা ঠেকছে চোখে। সঙ্গে পিস্তলটা নিয়ে এসেছি। এমন দুর্যোগের দিনে লোডেড পিস্তল ছাড়া চলতে ফিরতে সাহস পাই না। একবার ছুঁয়ে নিলাম বুকের কাছে হাত ঢুকিয়ে। আছে সোনামনি। এই বর্ষায় রুক্মিণীকে মনে পড়ে ডিলিসিয়াস ডিশ ছিল একটা। একই অঙ্গে কত রূপের সাক্ষাৎ প্রমাণ। ও বুঝে গিয়েছিল সোনাপাচারের সময় ওদের ধরিয়ে দেওয়ার পেছনে আমারই হাত ছিল। সে কারণেই রুক্মিণী ব্ল্যাক মেইল করতে এসেছিল। ওর নিজের বলতে সত্যম ছাড়া কেউ নেই! একটি উর্বশী উধাও হয়ে গেল, দুর্ঘটনায় মারাই গেল, কেউ এল না খোঁজ করতে!

নাঃ! গাড়ির চাকা স্কিড করতে পারে! স্পিড কমিয়ে আনলাম। রাস্তায় লোকজন নেই। একজন কেউ বৃষ্টিতে ভিজে হেঁটে যাচ্ছে। বর্ষায় বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় একটা ছাতা নিয়ে বের হতে এত কী অসুবিধে কে জানে! মানুষ এখন আর কি এত গরীব আছে যে বাড়িতে একটিও ছাতা থাকবে না? হর্ন দিতে হল। রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলেছে লোকটি। বারবার হর্ন দিচ্ছি। শুনতে পাচ্ছে না নাকি? গাড়ি লোকটার কাছাকাছি এনে গাড়ি স্লো করলাম। ঘাড় ঘুরিয়ে গাড়ির দিকে তাকিয়েছে। জলে ঝাপসা কাচের ভেতর দিয়ে তাকিয়ে দেখি জল থেকে উঠে আসা মানুষটি এদিকে আসছে। কাচের মধ্য দিয়ে গলে গলে পড়ছে যেন। গাড়ির সামনে এসে দু হাত ছড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

মানে? আমি অবাক হয়ে গেলাম। এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে কেন? যেতে দেবে না? নাকি রাস্তা খারাপ বলে বারণ করছে? গাড়ি থামিয়ে বুঝতে চেষ্টা করছি লোকটা না, না, লোক তো নয়! একটি মহিলা! আমার রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে আছে একটি মহিলা! কেন? কে এ? গাড়ির জানালা খুলে জলের ভেতরে মুখ বাড়িয়ে দিয়ে দেখতে চেষ্টা করলাম কে এই মহিলা! বা, এর বক্তব্য কী। হয়তো লিফট চায়।

চেঁচিয়ে কথা বলতে হচ্ছে —কী হয়েছে? রাস্তা আটকে আছেন কেন?

মহিলা জবাব দিল না। রাস্তাও ছাড়ল না। পাগল নাকি রে? পুরুষ হলে না হয় একটা ব্যবস্থা নিতে পারতাম। কিন্তু মহিলা বলে কিছু তো করতেও পারব না! ধ্যাত তেরি! আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে! কোন পাগলির পাল্লায় পড়লাম! ওদিকে রাঘব আমার জন্য অপেক্ষা করছে! আচ্ছা, আমাকে আটকে দেওয়ার জন্যই কেউ কি মহিলাকে ইউজ করছে? রাঘবের কাছে আমাকে যেতে দিতে চাইছে না? মহিলাটি কেমন করে জানল যে আমি এখন এই রাস্তায় যাব? কে এই মহিলা?

(আগামী সংখ্যা সমাপ্য)

PACKAGE TOUR 2018

Silk Route Tour
(Siliguri to Siliguri)

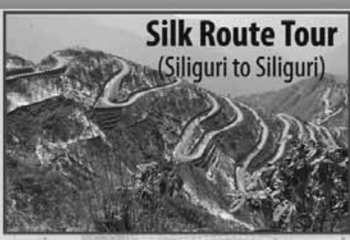

Date of journey 27/11/2018
2 Nights 3 Days
Rs 5200/- per head

Andamans Package Tour
(Port Blair to Port blair)

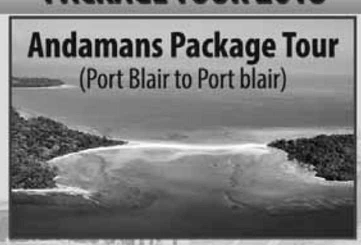

Date of journey 22/12/2018
7 Nights 8 Days
Rs. 18950/- (per head)

Kerala with Kanyakumari
(NJP to NJP)

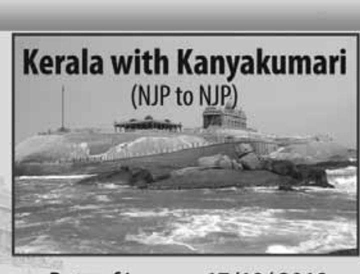

Date of journey 17/10/ 2018
14 Nights 15 Days
Rs.23600/-(per head adults)

HOLiDAYAAR

Siliguri Office: Haren Mukherjee Road, Hakimpara, Siliguri 734001 Ph: 0353-2527028, +91 9002772928
Jalpaiguri Off: Addaghar, Mukta Bhaban, Merchant Rd. Jalpaiguri 735101 Ph: 03561-222117, 9434442866
Cooch-Behar Office: Ph: +91 9434042969

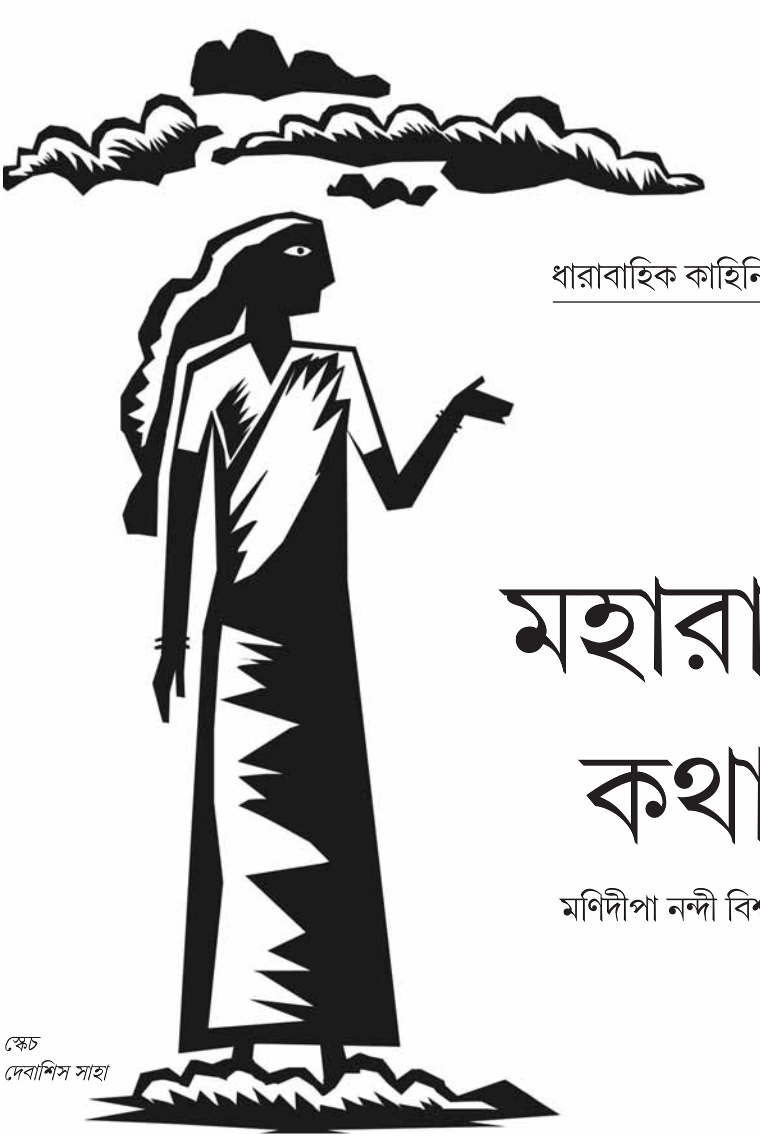

ধারাবাহিক কাহিনি। ১

মহারাণী কথা

মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস

স্কেচ
দেবাশিস সাহা

খোলা আকাশের নীচে দাঁড়ানো সে। গা গুলিয়ে উঠছে। অহর্নিশ মাথার ভিতর মেঘেদের আসা যাওয়া। গা ভরা জ্বর। অনেকদিন পর প্রাণখুলে অনর্গল ঝরনার মতো দুধ সাদা জলের বদলে সব কালো কালো অসহ্য যান্ত্রিক শব্দের মতো জলধারা। মনে হচ্ছে এ হচ্ছে কী! এসব কী! সে কি মানুষ! না কি মহাকাশে বিচরণ করা গ্রহান্তরের জীব। চারদিকে উষ্ণ কলস্রোত। অসংখ্য পাথুরে মাটি, গলনাঙ্ক উষ্ণ লাভার মতো। অজস্র টর্নেডো ঘিরে আছে। মাথার ভিতর এখনও উন্মত্ত উত্তাল দাপট।

না, কোনও অ্যান্টার্টিকা বা মেরু প্রদেশের দুরন্ত সীমায় সে বসে নেই, তবু ঝড়। উত্তাল সব। বেঁচে থাকাটাই অদৃশ্য কোন গোপন কালো বিষাক্ত চেরা জিভ ঢুকে পড়েছে ওর চৌহদ্দিতে। বেশ গুছনো ছিল সব। গুছিয়ে রাখা মাটিটা কেমন ঝুরঝুরে এলোমেলো হয়ে এল। প্রথমে বাড়ির খোলা খাঁচাটা শূন্য হল। পাখিটা আসা বন্ধ করল। ওর তৈরি করা জল, দানা দেওয়ার পাত্র শূন্য হল। একটু করে নেগেটিভিটি বাড়িটার খসে পড়া পলেস্তারার উপর দিয়ে ছড়িয়ে দিতে লাগল সন্তর্পণে তার প্রভাব।

ধীরে ধীরে টের পেল মানে কি! মানেটা হল এ বাড়ি ছাড়তে হয়েছে কর্মসংস্থানের জন্য। বদল আর বদল। বহু দরখাস্ত করেও কর্তৃপক্ষের মস্তিক এলেবেলে করা যায়নি। যায় না, সব কিছুরই তো নিয়ম আছে, কানুন আছে; সব থেকে বড় কথা হল, সে আজকাল বড় বেশি করে মনে করতে শিখেছে এই যে যা কিছু হচ্ছে ভালর জন্যই হচ্ছে, যা হবেই তা নির্ধারিতই ছিল। ...মা মেকং স্মরণং ব্রজ ...প্রতিদিন প্রাণায়াম আর গীতা অধ্যয়নের ফল কি না ও জানে না তবে এ বিশ্বাসে আনন্দ পায় ভারমুক্ত লাগে।

আসলে এই নতুন হওয়া দোতলা আর প্রায় বাইশ বছরের পুরনো একতলা ছেড়ে যেতে তার কি কম কষ্ট! একে তো মহিলা, সংসারকে আষ্টেপৃষ্ঠে নিজের করে রাখার চেষ্টা। গৃহকোণ থেকে বাহির, গেরস্তালী থেকে কর্মক্ষেত্র, সন্তান থেকে স্বামীটি একান্ত নিজস্ব, এ রান্নাঘরটিও আমার একার— একথা ভাবতে পারলে বেঁচে যায় কোনও মেয়ে বা নারী হয়ে ওঠা ব্যক্তিত্ব। কিন্তু সে তো প্রথম থেকেই নিজের ইচ্ছেতেই সব কিছুকেই প্রাণময় করে পঁচিশ ছাব্বিশ বছর ধরে সংসার ধর্ম আবার বহিঃপ্রাঙ্গণের কাজ কোনওটাই এতটুকু ছাড়তে পারেনি, এখন সব ছেড়ে এই যে গত কয়েক বছর ধরে একটু একটু করে ছেড়েছে এটা কী করে সম্ভব হয়েছে? বাড়ির অন্য তিন-চারটি মুখের সবটুকু বিরক্তি, মেনে না নেওয়া সব হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে যখন অন্য এক ভৌগোলিক অবস্থানে দাঁড়িয়েছে, ভাবতে পারেনি একটু একটু করে অবক্ষয় তৈরি হয়েই ছিল। শুধু কবর খুঁড়ে মোমবাতি জ্বালানো কাজটা সে করছে ভাবেনি তখন।

গলার কাছে দলা পাকিয়ে আসছে নীলচে যন্ত্রণা। পরিচিত মুখগুলো আর তার চেনা নয়, মনে হচ্ছে কত কোটি বছর আগের প্রাগৈতিহাসিক ডায়নোসর। স্থবির রামকিঙ্করের ভাস্কর্যের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য যার ভিতরে প্রতিচ্ছায়া ফেলবে না, সে যেভাবে বাইরে থেকে অসুন্দর মূর্তিগুলো দেখে, ঠিক সেইরকম অস্থিরযাপনে বাস করছে মহারাণী। এ নামটা কেন যে সাধ করে দিয়েছিলেন কর্তাবাবা সে জানে না। কর্তাবাবা মানে ঠাকুরদাদা। আসলে বংশের ঘিয়ের প্রদীপ তাঁর ছেলেরা পাঁচজন। একজন চম্পার অভাব ছিল, মেজ ছেলের ঘরের চম্পাফুলের রঙের মেয়েটার মুখ দেখে কর্তাবাবা নিজের গলার সোনার চেনখানা খুলে পরিয়ে দিয়েছিলেন আর গাল ছুঁয়ে ডেকেছিলেন 'মহারাণী'। ব্যস্, সারা বাড়ি সবুজ ঘাসে ঘাসে তোর্সার জলে ঢেউ উঠেছিল। কোনও আকাশবাণী কি শোনা গিয়েছিল সে জন্মলগ্নে! মা বলতে পারেন... কেমন গল্পকথার মতো মায়ের গল্পের সঙ্গে ছবি মিলিয়েছে সেদিনের ফ্রকপরা মেয়ে। — হুঁ রে ...মনা, আমি দেখলাম জানিস ঠাকুরবাবা বেরিয়ে যেতেই আকাশের রামধনুর তীরের ফলার একটু আলো যেন তোর মুখে পড়ল। ... মাথার কাছের ঢাউস ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম ঠিক বারোটা। ...আর কে যেন বলল 'ও তো রাজরাণী হবে বাবা ...দেখবেন, আপনের ছেলেরা যা পারে নাই ও একাই করবে নে তা। কর্তাবাবার সামনে ও কে! মা দরজার ফাঁক দিয়ে দেখেছিলেন রুদ্রাক্ষ গলায় যোগেশ দাদাকে। যে কি না সংসারে থেকেও উদাসীন সন্ন্যাসীর মতো ঘোরে ফেরে কত কথাই যে বলে...। কর্তা বাবার সে দিনের কুড়ি টাকা বক্শিস মায়ের চোখে খুব বেশি মনে হলেও কর্তাবাবার খুশি দেখে মন নেচে উঠেছিল; মেয়ে জন্মানোর অভিশাপ তো শুনে শুনে কান পচে উঠেছিল মায়ের। খুব ভয়ে ভয়ে পোয়াতি অবস্থা কাটিয়েছে। কাজে কোনও গাফিলতি নেই। সেই নবদ্বীপে মামা বাড়িতে জন্মেছিল সোহাগিনী, মহারাণীর মা। সেই জন্য কথাবার্তায়, আচার-আচরণে এতটুকু বাঙাল টান ছিল না তার। মেয়ে জন্মানোর আগে রূপ যেন সোনা ঝরা হয়েছিল বেশি রকম। ঠাম্মাও পাঁচ ছেলে গরবে গরবিনী বটে তবু মায়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলতেন, লক্ষ্মীই হবনে এবার। ...মা লজ্জায় লাল তখন।

পেটের ভেতর খলরবলর। এদিক থেকে ওদিক। পোক্ত নাড়ী আরও পাকাপোক্ত হতে থাকে দশমাস দশদিন ধরে। সোহাগিনী কয়লাগুড়োয় ভাতের মাড় ঢালে, সকালে তুলে রাখা গোবর খানিকটা ঢেলে দেয়। মাখাতে থাকে মনের আনন্দে উঠোনের একপাশে। ঠাম্মা তখন কাপড় কাচা বালতি হাতে কুয়োর পাড়ে ধুপ ধুপ সেরে স্নান করার চেষ্টা করছে। কুয়োর পাড়ের ঘেরা জায়গাটা বাথরুম। খানিক শেওলা ধরেছিল। দেয়ালে নোনা দাগ, সে বছর সোহাগিনীর পেট হওয়ার পরেই রাজীব লোক ডেকে পরিষ্কার করিয়েছে। সোহাগিনী এত সুখেও কষ্ট পায় যেন। পুরুত ব্রাহ্মণ বাপের গুণের মধ্যে ছিল সোজাসাপ্টা শক্ত রূপ আর একবগ্গা ব্রাহ্মণত্বের বড়াই। এ বাড়ির বিপরীত ছবি দেখেছে সতের বছর ধরে সোহাগিনী নিজের বাড়িতে। পুরুত বাপের খাওয়ার থালাখানা ছিল বিরাট কাঁসার। ঝকঝকে মুখ দেখা যায় এমন সোনার মতো। একহাত ঘোমটায় সোহাগিনীর মা থালা সাজিয়ে দিয়ে পাখা হাতে নিয়মমাফিক প্রতিদিন বাতাস করতেন। ফর্সা টকটকে ব্রাহ্মণ পতি তখন হয়ত খাওয়ার পাত থেকে একটু সরিয়ে দেবতা নিবেদন

সেরে আচমন করে গোল করে গুছিয়ে তোলা ভাত ভেঙে মুখে দেবেন। আর একেবারে শেষপাতে দই। চাই-ই চাই। এক আধদিন দম্বলের কমতি হলে দই না পড়লে মা থাকত আতঙ্কিত, যদি ব্রাহ্মণ অসন্তুষ্ট তো বিশ্রী চিৎকার চেঁচামেচি। গুষ্টিখানেক ছেলেমেয়ের সামনেই গায়ে হাত দিতে দ্বিধা করবে না চক্রবর্তী। সোহাগিনী বড় মেয়ে। দরজার কোণে দাঁড়িয়ে এ বিনষ্টি দেখেছে। জমিদার তো নয়, এত দেমাক কেন রে বাবা! মাঝে মাঝে বাবার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আঙুল তুলতেই মায়ের করুণ মুখ সব ভুলিয়ে দিত। কত কষ্ট করে ওই বামুনের পাতের ঘি টুকু জোগার করতে হত মাকে সব ছেলেমেয়েদের ফাঁকি দিয়ে সে তো আর কেউ না জানুক সোহাগিনী জানে। ওদের দিনহাটার ডাবগ্রামে মহারাজ নরনারায়ণ সেবা কেন্দ্রে পুরোহিত গিরি করে আর সেরেস্তায় খাতা লিখে সোহাগিনীদের ভালই কেটে যেতে পারত, মাকে এত কষ্ট করতে হত না যদি জন্মনিয়ন্ত্রণ আইনটা বহু আগে বলবৎ হত। সোহাগিনীর পর জন্মেছে অন্তত আরও ন'জন। মাঝে দু'জন মারা গেছে আঁতুড়েই। মাকে কপালে হাত ঠেকাতে দেখেছে সোহাগিনী। যেন মরে বাঁচিয়ে দিল তারা। টলটল করে উঠেছে মায়ের দু'চোখ শুধু। একরাত না পেরোতেই আবার টলমল পায়ে উঠে দাঁড়িয়েছে সেই নবদ্বীপের আহ্লাদী মেয়ে। নিজের বাড়ির বহু আদর বহু যত্ন লেগে ছিল সুনন্দার শরীরে। এখন সংসারের জিন টেনে যায় ব্রাহ্মণের সাধ মেটায় আর ছেলেমেয়ের কাঁথা বদলায়। শুধু মাঝে মধ্যে উদাসীন দুপুরে ছেলেমেয়ে ঘুমোলে এক টুকরো কাগজ বা পুরনো ক্যালেন্ডারের পিছনে পোড়া কয়লা, হলুদ, নীল আর রক্তজবা কিংবা সবুজ পাতা রগড়ে তার রঙে কাগজ রাঙাত সুনন্দা। ছোট্টবেলা থেকে সোহাগিনী দেখেছে মায়ের হাতে আঁকা মহাদেবের জটা থেকে গঙ্গা নেমে আসছে। কখনও হাঁসেরা চড়ে বেড়াত স্বচ্ছ জলের উপর দিয়ে। সে সব সময়কার বহুজনের ঘরের দেওয়ালে টাঙানো 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে' তুলোয় আঁটা সেলাই করা কাচ বাঁধানো বনেদী বাড়ির দেওয়ালে পুরনো হয়ে আসা ছবির তুলনায় এ ছবি যে অন্যরকম বুঝতে পারত সোহাগিনী।

(২)

গুলগুলো একের পর এক পাকিয়ে চলেছে সোহাগিনী। একটু পর স্নান সারতে হবে। শাশুড়ি মা আর সে খেতে বসে কত গল্পে যে সন্ধে লাগাবে। এর এক মাধুর্য খুঁজে পায় সোহাগিনী। ছোটখাটো চেহারার সুন্দরী শাশুড়ি ঠাকুরণ যখন তাঁর স্কুলের গল্প বলেন সে গল্প ফুরোতে চায় না। সোহাগিনী চোখ বন্ধ করে সিনডেরেলার কুমড়োর চমৎকার গাড়িটাকে দেখতে পায় আর শাশুড়ি মা-কে মনে হতে থাকে অল্পবয়সিনী সিনডেরেলা। যাকে নিয়ে যেতে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়ায় টানা মখমলী গাড়ি।

সোহাগিনীর গুল দেওয়াও শেষ, পেটের ভিতরটা পাকিয়ে ওঠে। একধার থেকে অন্যধারে গড়িয়ে গেল যেন কে! ওর মুঠিবদ্ধ হাতের স্পর্শ নেয় হাত ছুঁয়ে।... কে তুই আমার! দুলাল না দুলালি... আঠারোর মেয়েটা বাঁ হাতের পরিষ্কার তেলো বুলিয়ে নেয় কাপড়ের উপর দিয়ে বড় যত্নে বড় আদরে।

রোদে পেতে রাখে কাঠের তক্তা দুটো। সন্ধের আগেই ঝরঝরে হয়ে উঠবে। কাল তোলা উনুনের আগুন হবে গনগনে। আগুন কমে এলেই আরও একটু ঠুসে দেবে নিজের হাতে বানানো ঝরঝরে শুকিয়ে ওঠা গুল।

রান্না, কাপড় সেদ্ধ সব ঝপঝপিয়ে শেষ। বুকের মধ্যে শুধু স্বপ্ন ইমারত ভবিষ্যৎ, ভবিষ্যতের সোনালি রাস্তার। রাতের ঘেরাটোপ আর মাটির মেঝের বাঁশের বেড়ার দেয়ালে ভালবাসা নেমে আসে পারিজাত ফুলের মতো। এ নামটা শুনেছে মায়ের কাছে মানে সুনন্দার কাছে। কচিকাঁচা ভাইবোনগুলোর সঙ্গে যখন বড় তক্তপোষে রাতের অন্ধকারে কুপির আলোয় পরপর কাহিনির পর কাহিনি শুনত চোখের সামনে ছবি হত অজস্র আলো-ছায়ার ঠাকুরদেবতা, সামনের বড় কুলগাছের ছায়া ছায়া কালো ভূত আর রাতভোর বৃষ্টিতে নৌকোর ভেসে যাওয়ার ছবি। সে নৌকোয় কে যেন... সোহাগিনী একা! না না বাবা! শিউরে উঠত সোহাগ। মাকে জড়িয়ে ধরে নরম মলিন রং চটে যাওয়া কাপড়ে

সোহাগিনীর গুল দেওয়াও শেষ, পেটের ভিতরটা পাকিয়ে ওঠে। একধার থেকে অন্যধারে গড়িয়ে গেল যেন কে! ওর মুঠিবদ্ধ হাতের স্পর্শ নেয় হাত ছুঁয়ে।... কে তুই আমার! দুলাল না দুলালি... আঠারোর মেয়েটা বাঁ হাতের পরিষ্কার তেলো বুলিয়ে নেয় কাপড়ের উপর দিয়ে বড় যত্নে বড় আদরে। বুকের মধ্যে শুধু স্বপ্ন ইমারত ভবিষ্যৎ, ভবিষ্যতের সোনালি রাস্তার। রাতের ঘেরাটোপ আর মাটির মেঝের বাঁশের বেড়ার দেয়ালে ভালবাসা নেমে আসে পারিজাত ফুলের মতো।

মুখ লুকোতো সে, ছোটভাই ভারী নেওটা— 'ভয় করছে দিদি' বলেই কোলে ওঠার চেষ্টা করত। দুরু দুরু বুক সোহাগিনী কল্পিত ভূতের দিকে বুড়ো আঙুল তুলে বলত— 'ভারী তো ভূত! এই কলা...' দিদিকে ভারী সাহসী ভেবে নিয়ে কচি ভাইবোনেরাও কাঁচকলা দেখিয়ে কুপির আবছা আলোর বিপরীতে ছায়া ফেলত।

সোহাগিনী আর ওর শাশুড়ি মায়ের খাওয়া শেষে সকড়ি হাতেই এঁটো বাসন কুয়োর পাড়ে নিয়ে যেতে যেতে মন খারাপের চোখের জল বুকের ভেতর ঠেলে দেয়। ...শাশুড়ি মা তখন গলা তুলেছেন, '...সাবধানে যাও বউ, পা ভারী, তাও পথ্থম বার। দেখিস।' ...আবার বলত, —এ বাড়ির উঠোন। ক'দিন হল, কাজের বউ রাখা হয়েছে। তোর্সার চরের বসতি থেকে কাজ করে দিয়ে যায় নিরো। ছলবলে স্বভাব। আর কাজে কম্মে ভালই। তবু ঘরের দাওয়া সোহাগিনীই মুছে নেয়। শাশুড়ি মা সেটুকু পর্যন্ত নিরোকে পা বাড়াতে দেবেন না।

আজকাল কেন যেন মায়ের কথা, ভাইবোনগুলোর কথা ঘুরঘুরুনি মাথার ভিতর। এখন মাঝে মাঝেই রাতের বেলা ভরা বর্ষায়, প্রবল ঝড়ে বা শীতের উষ্ণ ওমে রাজীবের বুকের ভেতর মুখ ডুবিয়ে সুখ নামের পাখিটা মুখ বাড়াতে চায়। আর ঠিক তখনই ছেঁড়া চটের দরজাটা চোখের সামনে ঝুলতে থাকে। এক অস্থায়ী ইঁটপাতা বাথরুম তৈরি হয়েছিল বাড়ির উঠোন প্রান্তে রাস্তার কাঁচা নালার কাছাকাছি। সেখানে দরজা একখানা ভাঙা টিনে তৈরি হয়েছিল বটে, সোহাগিনীরা অনেক ভাইবোন। ব্যবহার কুয়োর জল, লোহার বালতি সব নিয়ে কসরতে একদিন কী করে যেন উধাও হল সে ভাঙা টিন। সে ভাঙা টিনেও চোখ রাখলে এক ভাই কিংবা বোন ইচ্ছে করলেই ভেতরটুকু দেখে নিতে পারত, সে লজ্জার আবরণটুকু ওদের হাতেই তুলে দিয়ে ওরা প্রকৃতির সাড়া মিটিয়েছে। না তেমন অসভ্যতায় পড়তে হয়নি, তবু সোহাগিনী সেই মাসের চারটে দিনের বেধড়ক কষ্টের দিন ক'টায় বামুন পুরোহিতের নজর এড়িয়ে মা পুরনো ধুতি পরিচ্ছন্ন করে রাখতেন সে সব হাতে তুলে দিয়েছিলেন একবারই। ওই কাপড়ই মহার্ঘ বস্তু করে নিজস্ব কুলুঙ্গীতে তুলে রাখত সোহাগিনী, সোহাগিনীর পরের তিন চারজনও একই পথের অনুসারী।

এই করেই তো বসন্ত এসেছিল পল্লবে হিল্লোলে, শরীরের আনাচকানাচে। ঠিক তখনই দিনহাটায় কোচবিহার ডাবগ্রামের নাট্যদল নাটক করতে এল, কী অদ্ভুত! এতদিন যাত্রাই দেখেছে, এমন নায়কোচিত অভিনয় তো কারো দেখেনি। এ শহরের নাটকের দল যেখানে ঘাঁটি গেড়েছিল, তার আশপাশ চৌহদ্দি সোহাগিনীদের বন্ধুরা ঘুর ঘুর জোটবাঁধা আবার বুকের মধ্যে কুটকুট কামড়। সন্ধে লাগার আগেই ঘরে ফিরতে হবে। ...সোহাগিনীর মন বাইরেই পড়ে থাকে। এবার কলেজে পা দিয়েছে। পুরোহিত বামুন বড় মেয়ের বিয়ের নামও করেন না। বরং পরের বোনেদের নাম ধরে ধরে এপাড় ওপাড় থেকে সম্বন্ধ জুটিয়ে এনে সুনন্দাকে চাপ দেয়। সুনন্দা ফিরে তাকায় না সে সবে। কেন! সোহাগ কলেজে পড়ছে বলে ওকে দিয়ে ইনকামের ধান্ধা তোমার। হরি ঘোষের গোয়াল তুমিই তৈরি করেছ, তুমি সামলাবে। বামুন পুরোহিত এখন আর তেড়ে যাওয়ার সাহস পায় না। একদিকে মেয়ে সোহাগ অন্যদিকে বড় ছেলে সুমন্ত দাঁড়িয়ে পড়ে। তবে পরের ভাইবোনগুলোর লেখাপড়ায় তেমন মন নেই। কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হন কি বামুন! মনে হয়নি কখনও সোহাগিনীর।

বাইরে বিদ্যুতের ঝলক। একটু পর জোর আওয়াজ ঘরের ভিতর, বিদ্যুতের আলো ঢুকে পড়ে ফাঁক ফোকর দিয়ে। পুরনো আমলের ধারার বেড়া বেশ পোক্ত। তবু ভেজা ছাঁট কখনও বিছানা ভিজিয়ে দেয়। সোহাগিনী জাপটে ধরে আছে রাজীবকে। চোখ বন্ধ। কানের পাশে রাজীবের হাতের স্পর্শ ওকে ভরসা দেয়, মুখ ফুটে বলতে পারে না। ...বড় যন্ত্রণা, পেটের ভিতর এপাশ থেকে ওপাশ..., চিনচিনে ব্যথা শুরু হয়েছিল সন্ধের চা বানানোর সময়ই, উঁচু পিঁড়ি বানিয়ে দিয়েছে রাজীবের ডেকে আনা কাঠমিস্ত্রী। ওখানে বসেই শাশুড়ি মায়ের কুচিয়ে রাখা আনাজপাতি টুকরি ভরে আলাদা বাসনে জলে চুবিয়ে রেখে গেছেন তিনি।— দেখ বৌমা, তোমার মুখ যেন কেমন শুকনো লাগতিছে, বেদ্না উঠলি ডাকবা অনে। রাজীবরে বইলা রাখছি হাসপাতাল কিসে যাবা তার ব্যবস্থা কইর‍্যা রাখছে ও। ...ওর কি আর খ্যাল নাই! ও সোনার টুকরা আমার বুইঝ্যালা! লজ্জায় মাথায় ঘোমটা আরও একটু ভাল করে টানে সোহাগিনী।

আর হ্যাঁ। ওই রাতই ওই রকমই দুর্যোগের রাত। সোহাগিনীর যন্ত্রণার রাত। যে ব্যথা ওষুধে কমে না সোহাগিনী জানে। রাজীবের ঘুমন্ত মুখটায় বড় মায়া। সারাদিন কল কারখানা আর লেবার খাটিয়ে বাবুটি ঘরে ফেরে। সন্ধে থেকে শাশুড়ি মায়ের ফাইফরমাশ, সোহাগিনীর জন্য ওষুধ কিংবা অসুস্থ কর্তাবাবার সবটুকু দায় যেন রাজীবের একার, তাই খুঁচিয়ে তোলে না ও'কে, ইচ্ছে করে না।

(ক্রমশ)

সাপ হাতির চৌহদ্দি থেকে কবে যেন পালালাম বইয়ের দুনিয়ায় !

ছোট একটা রেলস্টেশন। খুব নির্জন না হলেও জমজমাটও নয় তেমন। ট্রেন যখন থামে তখনই একটু চনমনে হয়ে ওঠে চারপাশ। স্টলদুটো চা, কেক, বিস্কুট বিক্রিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। স্টেশনমাস্টার দ্রুত পায়ে চলাফেরা করেন প্ল্যাটফর্মে। দু চারজন যাত্রী ট্রেনে চড়ে। নামেও দু চারজন। তারপর কু ঝিক ঝিক আওয়াজ তুলে ট্রেন দিগন্তে মিশে যাওয়া মাত্র আবার ঝিমিয়ে যায় স্টেশন। একজন কুলি হয়ত সতরঞ্চি পেতে উদাস চোখে বসে থাকে। কৃষ্ণচূড়ার তলার সিমেন্টের বেঞ্চের তলায় সুখে নিদ্রা যায় নেড়ি কুকুরের তিনটে ছানা। আনমনে ফুল ঝরায় বুকুলগাছটা।

ওয়েটিং রুমের পিছন থেকে শুরু হয়েছে নাতিপ্রশস্ত রাস্তাটা। রাস্তাটা বাঁক নিয়ে চলে গিয়েছে বহুদূর, সেই গুদামঘর পর্জন্ত। এই রাস্তার পাশেই সার বাধা কোয়ার্টার। ঢালু টিনের ছাদ, লাল রঙা দেওয়াল, সামনে প্রচুর গাছ, আতা, শিউলি, টগর। সব মিলিয়ে ঠিক যেন শিশুর ড্রয়িং খাতা থেকে তুলে আনা বাড়ির ছবি। রোজ দুপুরে ওই রাস্তা দিয়ে ছুটতে ছুটতে আসত যে মেয়েটা লাল ইউনিফর্ম গায়ে, ঘরে ঢুকেই স্কুলব্যাগ দমাশ করে নামিয়ে রেখে ছুটে যেত পিছনের উঠানে পোষা টিয়াকে খাবার দিতে, তাকে আমি বিলক্ষণ চিনি। আর পড়ন্ত বিকেলে তুমুল হুল্লোড় তুলে দাড়িয়াবান্দা বা ট্রেন ট্রেন খেলে তেষ্টায় জেরবার হয়ে দৌড়ে ঘরে ঢুকে মাটির কুঁজো থেকে জল গড়াতে গিয়ে কুঁজো ভেঙে ফেলা কাঁচুমাচু মুখের মেয়েটা বা তারাভরা আকাশের তলায় ঘাসজমিতে চেয়ার পেতে বসা বাবার কোলের কাছে গুটিসুটি মেরে বসে গল্প শোনা মেয়েটাও যে স্বপ্নে ডাক পাঠায় এখনও। তার ছোট্ট অঞ্জলিতেই গচ্ছিত আমার ফেলে আসা বেলা, আমার মেয়েবেলা।

পাপড়ি মেলার সময়টা বড় রোমাঞ্চকর। ফুলের জন্য। মানুষের জন্যও। সে যেন এক বহুবর্ণ, নানা আকৃতির মুক্তো দিয়ে গাঁথা সাতনরি হার। সময় নামক দস্যু ছিঁড়ে দিয়েছে সে হার কবেই। ছড়িয়ে গিয়েছে মুক্তো, হারিয়েও গিয়েছে কতক। তবু যে কয়টা মুক্তো খুঁজে পেতে বুকের কাছে ধরতে পারি তার সংখ্যাও কিছু কম নয়। গুনতির কথা যদি ছেঁড়েও দিই, রূপে রঙে সৌরভে তারা অতুলনীয়। অন্তত আমার কাছে।

মেয়েবেলার দিকে ফিরে তাকালে প্রথমেই যার কথা আসে তিনি আমার বাবা। নাতিদীর্ঘ, কৃষ্ণবর্ণ শান্ত একটি মানুষ। ওইরকম রূপবান আরেকটি মানুষ আর চোখে পড়ল না। লোকে জানে মানুষটি গম্ভীর। কিন্তু আমি জানি চশমার পুরু কাঁচের আড়ালে ঝিকিয়ে ওঠা চোখে রয়েছে অপার কৌতুকবোধ, স্নেহস্নিগ্ধ মনের প্রকাশ। দুধ সাদা ধুতি পাঞ্জাবিতে শোভিত, আদ্যন্ত পাঠমুখী একটি মানুষ। ছেলে মেয়েকে পুস্তকমুখী করতে মফঃস্বল থেকে ঘন্টা দেড়েকের জার্নি করে নিয়ে আসছেন শিলিগুড়ি বইমেলায়। প্রতিবেশীদের বাঁকা কথা, চোরা হাসি উপেক্ষা করে মেয়েকে উৎসাহ দিচ্ছেন পাঠ্যসূচী বহির্ভূত পাঠে। যেটুকু আজ আমি তারই তো অবদান। অতুলনীয় সেন্স অফ হিউমারের অধিকারী মানুষ ফটো তুলতে গেলেই বলতেন, আমার কালার ফটো তুলে লাভ কী? আমি তো এমনিতেই ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট। ঠিকই। ধবধবে পোষাকের মতই অমলিন অন্তর। সাদা তো বটেই। আর অকালে চলে গিয়ে আমার মেয়েবেলার ওপর কালো পর্দা টেনেও তো দিয়ে গেলেন।

হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম। একটা মফঃস্বল শহরের গল্প। নীলকান্তমনির মত দারুণ ঝলমলে একটা আকাশ ঝুলে থাকত মাথার ওপর। দূষণ নামক দস্যুর এত আক্রমণ তো ছিল না সে সময়। সবুজ ধ্বংস করে নগরায়নের ভূতও তখন সওয়ার ছিল না মানুষের মাথায়। তাই চারপাশে পান্নাসবুজ রঙ ঝলসাত। তখন

দামালপনা বন্ধ করতে অভিনব ব্যবস্থা নিলেন বাবা। সঞ্চয়িতা নিয়ে এসে বললেন, রোজ একটা করে কবিতা মুখস্থ করে রাখবে। আমি সন্ধে বেলা এসে পড়া ধরব। প্রথম প্রথম বিরস মুখে পড়তাম। তাড়াতাড়ি মুখস্থ করেই খেলতে যেতে হবে তাই খুঁজে খুঁজে ছোট কবিতা বের করতাম। তারপর কবে যে গ্রস্ত হলাম, কবে যে হাত থেকে তীর ধনুক খসে পড়ে সব সময়ের সঙ্গী হল বই, তা নিজেও টের পাই নি।

বর্ষা এবং শীত, দুইয়েরই প্রাবল্য ছিল সাঙ্ঘাতিক। তেমন বর্ষা তো এখন আর নামে না। আকাশের ছাদ ফুটো করে মুষলধারায়, লাগাতার সাতদিন, দশদিন। যদিও ঢালু জমিতে জল দাঁড়ায় না তেমন, তবু নিচু জায়গা জুড়ে জল থইথই, অস্থায়ী পুকুরই জেগে ওঠে যেন। আমাদের প্রথম প্রথম মজা লাগত। স্কুলে যাওয়া নেই। সকাল বিকাল নামকাওয়াস্তে একটু বই নিয়ে বসলেই হল। তারপর সারাদিন ছুটি। তখন তো বাবা মায়েরা ছেলেমেয়ের পড়া নিয়ে বাতিকগ্রস্থ থাকতেন না। তবে পরের দিকে একঘেয়ে লাগত। বাইরে বেরোনোর জো নেই। দৌড়াদৌড়ি করার উপায় নেই। কাঁহাতক আর ঘরে বসে থাকা যায়। সব চেয়ে বেশি দুর্ভোগ হত মায়ের। উনুন জ্বলে না ভালোমত। ভেজা কাঠ। ভেজা কয়লা। ঘরে আনাজপাতি, মাছ সবই বাড়ন্ত। বাজার যাবে কে ওই বৃষ্টিতে? বাড়ির লোকদের সামনে রেঁধে বেড়ে সাজিয়ে দিতে হবে তো তাকেই। খিচুড়ি আর ওমলেট লাগাতার খেয়ে খেয়ে জিভে চড়া পড়ে যেত। রাতে মায়ের পাশে ঘন হয়ে শুয়ে টিনের চালে বৃষ্টির ধারাপাত শুনতে শুনতে আশা করতাম, কাল নিশ্চয়ই বৃষ্টি থেমে যাবে। রোদ উঠবে ঝলমলিয়ে। কিন্তু কোথায় কী? সকালে উঠেও দেখতাম কালচে আকাশ থেকে অঝোর ধারায় নেমে আসছে জল, ঘরের মেঝেতে ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন্নো, বারান্দায় উঠে এসেছে ব্যাঙ, পোকা, কখনও কখনও সাপও।

হ্যাঁ সাপ। মানুষ তখন সাপ ব্যাঙ পোকা মাকড় সবাইকে নিয়েই সংসার করত। ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্সের কথা জানত না মানুষ। শুধু এটুকুই জানত বোধহয় পৃথিবীটা সবারই। নিতান্ত দায়ে না পড়লে কেউ কাউকে বিরক্ত করত না। কোয়ার্টারের সামনের রাস্তাটা দিয়ে খানিকটা গেলেই বাঁ দিকে নিচু একখন্ড জমি। সেখানে একটা শিবমন্দির। মন্দিরের পাশের বুনো ঝোপগুলোতে অজস্র সাপের আনাগোনা। সবাই জানত। কিন্তু কাউকে খুব একটা দুশ্চিন্তা করতে দেখিনি। নিত্য পুজার পুরোহিত আসত মন্দিরে। সোমবার করে কিছু ভক্তরাও। শিবরাত্রিতে তো উপচে পড়ত ভিড় মন্দির চত্বরে। আমি শুধু ওই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকতাম। যদি চোখে পড়ে যায় হিলহিলে কোনো শরীর! সাপের ভয় ছিল আমার ভীষণ। শুনেছিলাম, কোথায় যেন কার পায়ের তলায় সাপ এসে শুয়েছিল রাতে। সে লোক পা নাড়াতেই সাপ বিষ ঢেলে দেয়। রাতে ঘুম ভেঙে গেলে ভয়ে কাঠ হয়ে শুয়ে থাকতাম। যদি পায়ের কাছে শুয়ে থাকে সাপ!

সাপের কথায় একটা ঘটনা মনে পড়ল। যদিও শোনা কথা। দাদা তখন বছর চার পাঁচেকের হবে। একদিন সকালে বাবা বাড়ির সামনের চত্বরে বসে কাঠ চ্যালা করছেন। দেখাদেখি দাদাও করবে। রান্নাঘর থেকে ছোট্ট দা নিয়ে সেও এদিক ওদিক কোপ দিয়ে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ বাবার সামনে এসে বলল, তোমার কাঠ তো ফোঁস করে না, আমার কাঠ কেন করে? বাবার হাত থেকে দা খসে পড়ল, মানে? দাদা তখন হাত তুলে বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে দেখাতে লাগল, এই যে। ফোঁস করল, আর এমনি এমনি করে চলে গেল। বাবা চিৎকার করে বললেন, বলিস কী? কামড়েছে তোকে? দাদা তখন ঘাবড়ে গিয়ে একবার বলছে কামড়েছে। একবার বলছে কামড়ায়নি। বাবা সঙ্গে সঙ্গে দাদাকে কোলে তুলেই ডাক্তারের কাছে দৌড়ালেন। ডাক্তার চোখ টেনে দেখে

বললেন, না কামড়ায়নি।

সাপ নিয়ে আরও কত গল্প। প্রতিবেশী জ্যেঠুরা দেশের বাড়ি গিয়েছেন। তার খালি কোয়ার্টারে বাবা গিয়ে শোবেন। ছিচকে চোরের আনাগোনা ছিল খুব। রাতে ঘর ফাঁকা রাখা যেত না। তাই কেউ বাইরে গেলে প্রতিবেশী কাউকে বলে যেত রাতে শুতে। তা বাবা রাতে খেয়েদেয়ে টর্চ হাতে নিয়ে রওনা দিয়েছেন। একটু পরেই ফিরে এসে উত্তেজিত গলায় মাকে ডাকলেন। মায়ের আতঙ্কিত স্বর শোনা গেল। একটু পরেই লোকের ভিড় বাড়তে লাগল। কী ঘটনা? বাবা দরজা খুলে ঘরে ঢুকতেই যাবেন, হঠাৎ পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখেন, প্রকান্ড শরীর গুটিয়ে শুয়ে আছেন সর্প মহারাজ। ভিড় জমতে লাগল জেঠুর কোয়ার্টারের সামনে। কেউ বলছে উফফ, দারুণ বেঁচে গিয়েছেন। দারুণ বিষাক্ত এই সাপ। কামড়ালে আর দেখতে হত না। কেউ বলছে, ভাগ্যিস বারান্দার আলোটা জ্বালা ছিল। নাহলে তো ঘাড়ের ওপরই গিয়ে পড়তে হত। কেউ লাঠি নিয়ে এগোতে চাইছে তাড়ানোর অভিপ্রায়ে। কেউ আবার তাকে আটকাচ্ছে, না না। তাড়া খেয়ে যদি ঘরের ভিতর খাটের নিচে কি চালের ওপর সেধোয় তবে আরো বিপদ। কেউ বা বলছে শুকনো লংকা পুড়িয়ে ধোঁয়া দিতে। সাপ পালিয়ে যেতে পথ পাবে না। এইসব নানা মুনির নানা মতের মধ্যে আমি প্রাণপনে সাপটাকে দেখার চেষ্টা করে যাচ্ছি। কিন্তু কোথায় সাপ? সবাই দেখছে আর আমিই দেখতে পাচ্ছি না। ওই তো দুধাপ সিঁড়ি উঠেই বারান্দা, পাল্লা খোলা দরজা, দরজার সামনেই মোটাসোটা গোল পাপোশ, খাটের পায়া, কাঠের আলমারির একাংশ। এটুকুই তো দেখা যাচ্ছে। সাপ কই? সবাই কী দেখে তবে উত্তেজিত হচ্ছে? আরেকটু ভালো করে দেখব বলে সামনে এগোতেই দাদা পিছন থেকে টেনে ধরল, কোথায় যাচ্ছিস? আমি বললাম, সাপ দেখতে। সাপ কই রে? দাদা মাথায় টোকা দিয়ে বলল, ওই তো সাপ। চোখে দেখিস না নাকি? আমি তখন বুঝলাম, পাপোশ বলে যেটাকে মনে করছি সেটাই আসলে গুটিয়ে থাকা মহারাজ।

সাপ যখন হল, হাতির গল্প হয়ে যাক। মাঝেমাঝেই খবর পাওয়া যেত জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে হাতির দল তছনছ করে দিয়েছে ধানক্ষেত, ভুট্টাক্ষেত। জঙ্গলের কাছাকাছি গ্রামের কলাবাগানে প্রাণভরে ডিনার সেরে হেলেদুলে বিদায় নিয়েছে। গভীর রাতে দুমদাম ক্যানেস্তারা পেটানোর আওয়াজ শুনে ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে কতবার। কখনও সখনও দলছুট হাতি লোকালয়েও ঢুকে পড়ত। আমাদের শহরেও। কোয়ার্টারের সামনের রাস্তাটাই পছন্দসই ছিল তাদের। তাদের আবির্ভাবের খবর আগেই পাওয়া যেত। কুলিরা চিৎকার করে বলে যেত, হাতি আ রাহা হ্যায়। বাচ্চালোগকো অন্দর লিজিয়ে। দুরুদুরু বক্ষে আমরা অপেক্ষা করতাম জানালার পাশে, দরজাটা একটুকু ফাঁক করে। তারপর আসতেন তিনি। ধুসর পাহাড়ের মত শরীর নিয়ে, শুঁড় দোলাতে দোলাতে ধীরেসুস্থে হেঁটে যেতেন। নেড়ি কুকুরগুলো তারস্বরে চেঁচাত পিছন পিছন দৌড়াতে দৌড়াতে। কিন্তু তিনি গ্রাহ্যই করতেন না। এখন বুঝি, কেন হাতি চলে বাজার, কুত্তা ফুঁকে হাজার, প্রবাদটার জন্ম হয়েছে।

বাজারে একটি ষাঁড় ঘুরে বেড়াত প্রবল বিক্রমে। শিবের বাহন বলে মারোয়াড়ী ব্যবসাদারদের থেকে প্রভূত খাতির পেত। ফলে লাড্ডু, পরোটা, সবজি খেয়ে খেয়ে শরীর যেমন প্রকান্ড হয়েছিল, তেমনি বেড়েছিল মেজাজ। একে তাড়া করে নর্দমার ধার ঘেসে দাঁড় করিয়ে দেয় তো বাজারফেরত একজনের ব্যাগ থেকে কচি মূলো টেনে নির্লিপ্ত মুখে চিবাতে থাকে। মূর্তিমান ত্রাস হয়ে উঠেছিল সে। তারপর একদিন শোনা গেল, আমাদের কোয়ার্টারের পিছনের যে হাইওয়ে, তার পাশের নয়ানজুলিতে পড়ে আছে সে আহত। কী হল? কী হল? প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেল, হাইওয়েতে তার সঙ্গে মোলাকাত হয়েছিল হাতির। মানুষকে ভয়ে দেখিয়ে শিববাহনের আত্মবিশ্বাস এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে হাতিকে আক্রমন করার দুঃসাহস দেখিয়ে ফেলে। হাতি কিছুই করেনি। শুধু সামনের পা দিয়ে সামান্য টোকা দিয়েছিল মাত্র। তাতেই শিববাহন গড়াতে গড়াতে নয়ানজুলিতে গিয়ে থিতু হয়েছিল। সুস্থ হয়ে আবার বাজারে ফিরছিল সে। আর সে বিক্রম নেই। ভারী শান্তশিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ভাঙা শিঙ আর খোঁড়া পা নিয়ে পরাজিত রাজার মতই মনমরা হয়ে থাকত।

বাঘের গল্পও আছে। তবে প্রত্যক্ষ করিনি। কোয়ার্টারের পিছনে হাইওয়ে। তার পিছনে চা বাগান। চা বাগান থেকে অনেক মেয়েই আমাদের স্কুলে পড়তে আসত। তাদের মুখেই শুনতাম, চা বাগানের নালায় লুকিয়ে থাকত চিতাবাঘ কচি ছানা নিয়ে মাঝেমাঝেই। বনদপ্তর মস্ত খাঁচা নিয়ে এসে ধরে নিয়ে যেত। দেখার ইচ্ছা হত সেই পর্ব। তবে মায়ের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে সে ইচ্ছা আর পূরণ করতে পারিনি।

আমাদের ছিল মর্নিং স্কুল। সকাল ছয়টায় স্কুল বসত। ছুটি হত এগারোটায়। ফলে সারাটা দুপুর ছিল নিজের অধিকারে, দামালপনা করার, কল্পনার ঘোড়া ছোটানোর। প্রিয় খেলা ছিল তীর ধনুকের খেলা। বাঁশ আর দড়ি দিয়ে নিজেই বানিয়ে নিতাম তীর ধনুক আর সেটা কাঁধে নিয়ে সারা দুপুর চলত অভিযান। মেয়েকে মেয়েলি বানানোর জন্য বাবা কিনে আনতেন বাহারি ডল আর সেই ডল গাছের ডালে বসে থাকত আমার টিপ প্র্যাকটিশের চাঁদমারির ভূমিকায়। মা চেঁচাতেন, এমন অনাসৃষ্টি মেয়ে কে দেখেছে! বনেবাদারে, বাঁশবনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোনদিন সাপের কামড়ে মরে পড়ে থাকবে, না হলে ভূত ধরবে। আমি তো শুনছিই না। আমি যে তখন সেনাপতির ষড়যন্ত্রে রাজ্যহারা রাজকুমার হয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছি, না হলে শিকারী হয়ে হরিণের পিছু ধাওয়া করে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছি গাছের ছাওয়ায়।

এই দামালপনা বন্ধ করতে অভিনব ব্যবস্থা নিলেন বাবা। সঞ্চয়িতা নিয়ে এসে বললেন, রোজ একটা করে কবিতা মুখস্থ করে রাখবে। আমি সন্ধে বেলা এসে পড়া ধরব। প্রথম প্রথম বিরস মুখে পড়তাম। তাড়াতাড়ি মুখস্থ করেই খেলতে যেতে হবে তাই খুঁজে খুঁজে ছোট কবিতা বের করতাম। তারপর কবে যে গ্রস্ত হলাম, কবে যে হাত থেকে তীর ধনুক খসে পড়ে সব সময়ের সঙ্গী হল বই, তা নিজেও টের পাই নি।

আসলে ফেলে আসা দিন তো একটি পুষ্পময় বৃক্ষ। সামান্য ঝাঁকুনিতেই ঝরে পড়ে অজস্র ফুল গায়ে মাথায়। কূট সময় তেতো দিন কি আর ছিল না? অবশ্যই ছিল। প্রথম অপমানের স্মৃতি, প্রথম বঞ্চনার অনুভব, চোখের জলে ভেসে যাওয়া দিন আছে বৈকি। তবে এতদিন পর সবই মধুর ঠেকে, সকলই নবীন, সকলই বিমল। আলো হয়ে লেগে আছে সিন্দুকের ডালায়, কুচো কুচো পাপড়ি যেন সৌরভে আকূল। এইসব নিয়েই আমার মেয়েবেলা।

শাশ্বতী চন্দ

বড় গল্প

অশরীরী রিং টোন

তনুশ্রী পাল

গলিটার শেষপ্রান্তের ঘুটঘুটে অন্ধকারের দিকে চেয়ে বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল আমার! যাঃ খুব ভুল হয়ে গেছে, বেরোনোর সময় তাড়াহুড়োয় নীচতলার বারান্দার সুইচটা অন করা হয়নি। স্টেশনে যাবার তাড়ায় একদম ভুলে গেছি। টোটো এসে দাঁড়িয়ে ছিল; আমার বর সুতপন দিনকয়েকের জন্য কলকাতায় গেল। আমি ওকে সি-অফ করতে গিয়েছিলাম। আসল উদ্দেশ্য ছিল স্টেশনের পাশেই শ্যামলের স্টল থেকে দুটো ম্যাগাজিন কেনা; আর রিমার বাড়িতে গিয়ে একটু আড্ডা দিয়ে আসা। রিমা আমার সহকর্মী, ভাইরাল ফিভারে পড়েছিল, ক'দিন স্কুলে যায়নি। স্টেশন রোডে বড় রাস্তার ওপর ছিমছাম চারতলার ফ্ল্যাটবাড়ির দোতলায় ওর একার সংসার। ডিভোর্স হয়ে গেছে অনেকদিন। একটাই মেয়ে ওর, ব্যাঙ্গালুরুতে পড়ে। গোমড়ামুখো আর খবরদারি স্বভাবের সুতপনের জন্য আমাদের বাড়িতে তেমন খোলামেলা আড্ডা জমে উঠতে পারে না। তাই ঘুরেফিরে রিমার ওখানেই; গল্পে গল্পে কখন রাত এতটা হল টেরই পাইনি। ছিপছিপ করে বৃষ্টি! 'দ্যাখ, রাত কতটা হয়ে গেল। বলবি তো, ঘড়ির দিকে দেখিনি।'

রিমা বলে, 'ছাতা নিয়ে যা, টর্চ আছে? নাকি থেকে যাবি আজ?'

'না, না, ফাঁকা বাড়ি রাখা যাবে না, পাশের বাড়ির ওরাও নেই। ছাতা টর্চ কিচ্ছু লাগবে না। পাঁচ মিনিটে পৌঁছে যাব। একটু বৃষ্টি, একটু অন্ধকার, ফাঁকা বাড়ি, নতুন ম্যাগাজিন, পূর্ণ স্বাধীনতা; প্রশ্নবোধক চিহ্নটি কু ঝিক্‌ঝিক্ কলকাতা। এরকম ঝিরঝির বৃষ্টি আমার খুব পছন্দ জানিস।'

'আহারে স্বাধীনতার আনন্দে ভেসে বেপথু হয়ো না কবি। কী যে পাগলামি করিস। ছাতা নিবি না, ভিজবি! সত্যি, আমি কেন কবিতা লিখতেই পারি না! ঘরে পৌঁছে সব ভাল করে তালাটালা লাগিয়ে দিস। তোদের গলিটা যেন কেমন! শহরের মধ্যে থেকেও একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপ!'

'ঠিকই বলেছিস। আচ্ছা চলিরে। তোর আলুর চপ দারুণ লাগল। কাল রোববার, পরশু দেখা হচ্ছে, টা টা।' হালকা বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে আমি গুণগুণ করছিলাম, সেই ছোটবেলায় শেখা গানের কলি, 'দামিনি দমকে ডর মোহে লাগে', খুব ভাল লাগছিল হাঁটতে। ফুলস্পিডে দু'-একটা বাইক, ছোট গাড়ি চলে গেল পাশ দিয়ে। ফোনটা দু'বার রিং হয়েই থেমে গেল! থাক বাড়ি গিয়ে দেখব, কার ফোন। সুতপন কাল সকালে শেয়ালদায় নেমে তবেই 'পৌঁছে গেছি' সংবাদ দিয়ে একবার ফোন করবে! আর ছেলের তো নিজে থেকে শুধু কুশল সংবাদ জানবার জন্য ফোন করবার অভ্যাসই নেই। আমিই রোজ ফোন করি।

রোমান্টিক একটা ভাব নিয়ে এতটা এসে, গলির শেষ প্রান্তের অন্ধকারটা কেমন একটা 'ব্যাড ফিলিংস' তৈরি করে দিল। শুনশান গলি; মিউনিসিপ্যালিটির একটা টাইম কল আর তিনটে লাইটপোস্ট আছে এই পথটুকুতে। মাঝের খুঁটির আলোটা নষ্ট হয়ে আছে সপ্তাহ দুয়েক, শুধু এ মাথাটার আলোটাই কেমন বিষণ্ণ হলদে আভা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে! সত্যি রিমা ঠিকই বলেছে গলিটা যেন সারা শহরের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে একলা একটা অদ্ভুত রহস্যের জাল ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আসলে এই পুরো জায়গাই এককালে রায়েদেরই ছিল। নানা শরিকে ভাগ হয়ে টুকরো টুকরো জমির মালিক হয়েছে এক একজন; আর নিজের নিজের সুবিধে মতো বিক্রিও করেছে। আমরা যেমন খানিকটা কিনে বাড়ি করেছি, তেমনই এ গলির নতুন বাড়িগুলোর সবাই বহিরাগত। রায়েদেরও সে রমরমা আর নেই; চা-বাগান, জমি-জিরেত সবই বিক্রি হয়ে গেছে। নতুন যে ক'টা বাড়ি হয়েছে এখানে, কারো সঙ্গেই সে দহরম মহরম নেই আমার। ওই কেমন আছেন? ভাল আছেন? আর দেঁতো হাসির সম্পর্ক। আর সবথেকে আশ্চর্য, এ গলির নবাগত বাসিন্দারা কেউই বারান্দার লাইট জ্বালিয়ে রাখে না, অদ্ভুত সব! গলিটার শেষমাথায় আর ডান ধারে এখনও রায়েদের বাড়ির ভগ্নাবশেষ, পড়ে আছে কয়েকটি থাম, শ্যাওলা ধরা ইটের স্তূপ, আধভাঙা দেওয়াল। দিনের আলোয় সে সব দেখে দেখে গল্পের প্লট মাথায় এলেও রাতে, বিশেষ করে জ্যোৎস্না রাতেও আলো-ছায়ায় কেমন সব মূর্তি তৈরি হয়! কে যেন সাদা শাড়িতে দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। ইটের পাঁজার ওপর কারা যেন বসে। সত্যি

এখন আমরা ভাবি, উফ্ কবে জায়গাটুকু বিক্রি হয়ে নতুন বাড়িঘর উঠবে! এ গলিতে নাকি সেই একাত্তরের ডামাডোলে একজন ভালমানুষ পুলিশকে কারা কুপিয়ে কুপিয়ে খুন করেছিল। উফ্, আজই আবার এইসব শোনা কথাগুলো মনে পড়ে যাচ্ছে আমার। পার্স থেকে গ্রিলের চাবিটা হাতে নিয়ে জোড়ে জোড়ে পা চালাই। ডান ধারের রায় বাড়ির ভাঙাচোরা ভুতুরে অস্তিত্বের কথা মনে করতে চাই না। ঘাড় নিচু করে মাটির দিকে চেয়ে হাঁটা লাগাই। এধারে গলির দু'-পাশ মিলিয়ে গোটা সাতেক বাড়ি তারপর ছোট্ট কালভার্টের পরেই বাঁ ধারে পরপর রতনবাবু ও আমাদের বাড়ি। রতনবাবু সপরিবারে দিন তিনেকের জন্য মাথাভাঙায় গেছে ভাগ্নির বিয়ে উপলক্ষ্যে। এদের বাড়ি ঘেঁষা খুব পুরনো একটা কাঁঠালগাছ আছে। প্রাতঃভ্রমণে গিয়ে পাশের গলির এক মাসিমার কাছে একদিন শুনেছিলাম, 'কি গো, রায়েদের জমি কিনে বাড়ি করছো? ভয়-টয় লাগে না? গলিটা তো ভাল না। এক পুলিশ খুন হয়েছিল ওই ছোট কালভার্টের উপরে। আর একটা কাঁঠাল গাছ আছে না? ওখানেও তো একটা বৌ ফাঁসি দিয়েছিল। আমরা তো ওই গলিতেই ঢুকি না।' অদ্ভুত তো, বিরক্ত হয়েই বলেছিলাম, ' না মাসিমা ওসব ভয়-টয়ের কিছু নেই। অনেক ক'টা নতুন বাড়ি হয়েছে তো। আসুন একদিন আমার বাড়ি, দেখে যান। ভাল লাগবে।' মাসিমা কেমন এক রহস্যময় হাসি হেসে বলেছিলেন— 'থাকো মা, ভাল করে স্বামী-পুত্র নিয়ে সংসার করো। অসুবিধে না হলেই ভাল।' কালভার্টের কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ মনে হল সামনে কেউ হেঁটে যাচ্ছে সাদা শাড়ি পরে। শরীরটা কেমন ভারি হয়ে শিউরে উঠলো আমার! একি, আজ এই মুহূর্তে এ কে? এ গলির শোকাবহ ঘটনাগুলো মনেই বা পড়ল কেন? আমি তত ভীতু মহিলা তো নই বরং অ্যাডভেঞ্চারাস আর কৌতূহলী মানুষ বলেই ভাবি নিজেকে। কিন্তু সামনে কে? আমাদের বাইরের গেটটা খুলেই ঢুকে পড়ল যেন। বুকের ভেতরে ধক্ধক্ করে শব্দ হচ্ছে, হৃৎপিণ্ডটা মনে হল গলার কাছে উঠে এসেছে! শরীরের সমস্ত শক্তি জড়ো করে আমি চিৎকার করতে চাই, 'কে? কে ওখানে?' কিন্তু গলা দিয়ে স্বর ফোটে না। কেমন করে যেন কালভার্টটা পেরিয়ে লাইট পোস্টের কাছে গিয়ে, হাতড়ে হাতড়ে সুইচটা পেয়েই টিপে দিই। হলদে-রঙা আলোটা দু'-একবার মিটমিট করে জ্বলে ওঠে, আলো ছড়ায়। উফ্ কেউ কোথাও নেই; মনের ভয় ছাড়া কিচ্ছু না। আমার বড় পিসিমা বলতেন, ভূত, প্রেত, দত্যি-দানো কিচ্ছু না। দুই পাইয়ার থিকাই মাইয়া মানুষের বেশি ভয়! ওই বৃষ্টি, অন্ধকার, রায়েদের ভাঙাবাড়ি, এই কালভার্ট আর ওই কাঁঠালগাছ সব মিলেমিশেই আমি আজব দৃশ্য দেখলাম! সাদা শাড়ি পরা মহিলা আগে আগে হেঁটে আমার বাড়িতেই ঢুকে পড়ল। রিমাকে গল্পটা বলতে হবে। চাই কি স্টাফরুমেই বলব ওই সাদা শাড়ির ভূত বা পেত্নির গল্প! সবাই জানুক হ্যালুসিনেশন কাকে বলে। একবারও রায়েদের ওই অলক্ষুণে ভাঙাচোরা খণ্ডহরের দিকে না তাকিয়ে, বাইরের গেটের তালা লাগিয়ে দিই। ঝিরঝিরে বৃষ্টির বেগ ক্রমে বাড়ছে! সত্যি কী কাণ্ড করেছি আজ, ঘরে বারান্দায় কোথাও একটা আলোও জ্বালিয়ে যাইনি! পনেরো বছরের অভ্যাস তাই রাস্তার যেটুকু আলো ছিটকে এসে বারান্দায় পড়েছে তাতেই তালা-টালা খুলতে অসুবিধা হয় নি।

আলো জ্বালতেই ঝলমল করে চারিধার, বুকের মধ্যে জমে ওঠা ভার এক মুহূর্তে উধাও। সারা শরীর ভিজে গেছে বৃষ্টিতে, হালকা একটু শীতবোধ হচ্ছে! নীচতলার তালা-টালা বন্ধ করে বসার ঘরের আলোটা জ্বালিয়ে রেখেই দো-তলার সিঁড়ি ভাঙি, আসলে বাড়ি তো একসময় জমজমাট ছিল। ছেলে থাকত, শাশুড়ি মা থাকতেন। ছেলে কলকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়ছে, ফিজিক্স নিয়ে, সেকেন্ড ইয়ার চলছে। আর শাশুড়ি মাও ওপারের যাত্রী হয়েছেন বছর দুয়েক হল। প্রায় একই সঙ্গে বাড়িটা বড্ড ফাঁকা হয়ে গেল। যে ছেলেকে ছেড়ে একটা দিনও থাকবার কথা ভাবতেই পারিনি কখনও আজ দ্যাখো তাতেও অভ্যস্ত। প্রতিদিন অবশ্য একবার করে কথা বলা চাই-ই; ম্যাসেঞ্জারে- হোয়াটসঅ্যাপেও ছবি, মজার জোকস বা প্রয়োজনে মেসেজ চালাচালি হয় নিত্যদিন। সুতপনও প্রায় প্রত্যেক মাসেই কলকাতায় যায়। ছেলের সঙ্গে দেখা করে আসে, অফিসের কাজ থাকলে সেটাও সেরে আসে। ইদানিং ফাঁকা বাড়ির স্বাধীনতা বেশ চেটেপুটে উপভোগ করি। দু'-চারটে গল্পও লিখেছি এমন বাড়ি ফাঁকা থাকবার কালে। ধীরে ধীরে সে লোভ বাড়ছে টের পাই। 'লেখক, কবিকে শত ভিড়ের মাঝেও মনে মনে একা হতে হয়, তবেই না লিখতে পারবে।' এরকম সব উপদেশ দিতেন যিনি, তিনিও চলে গেছেন ক'বছর হল; তাঁর সব লেখাপত্তর আর সম্পাদকের টেবিল ফেলে রেখে। তবে ওনার ওই উপদেশ খুব অপছন্দ ছিল আমার। কী বুঝবেন উনি, একজন কর্মরতা বিবাহিত মহিলার ঘরে-বাইরের দু'পাশের বিপুল চাপ। তার মধ্যে লেখার তীব্র আকাঙ্খা!

২

ঘরটা কি আজ বেশি ঠান্ডা? নাকি ভেজা জামাকাপড়ের জন্য? কাপড় পাল্টে, চায়ের জল চাপিয়ে ছোট টাওয়েলটা দিয়ে মাথাটা ঘষতে থাকি। ঘরের মধ্যে কেমন চাপা একটা গন্ধ টের পাই। ওহো! আজ সন্ধে দেওয়াও হয়নি। থাকগে, গন্ধটা তাড়ানোর জন্য সামনের ব্যালকনির কাচের দরজার একটা পাল্লা খুলে দিই। হু হু করে ভেজা হাওয়া ঘরে ঢুকে সেন্টার টেবিলের ওপরে রাখা খবরের কাগজগুলো সারা মেঝেময় ছড়িয়ে-টড়িয়ে ছত্রখান করে দেয়। ঘন কালো মেঘে ঢাকা আকাশের উত্তর-পূর্বে কোণে ঝলসে ওঠে বিদ্যুতের আঁকাবাঁকা রেখা। আমি রায়েদের ভিটের দিকে তাকাবার সাহস পাই না; দরজা খোলা রেখে চায়ের ট্রেটা নিয়ে সেন্টার টেবিলে রেখে টিভি আর কম্পিউটারের কানেকশনগুলো খুলে দিই। মনে হল মোবাইলে রিং হচ্ছে। ওহ্ সেটা তো হ্যান্ড পার্সটা থেকে বের করাই হয়নি। তাই আওয়াজটা মৃদু। আসবার সময় রাস্তাতেও দু'-বার রিং হয়েছিল মনে পড়ল। এখন এই বৃষ্টিবাদলের রাতে আবার কে? রিংটা থেমে গেল। মোবাইল, চায়ের কাপ সব নিয়ে আরাম করে ডিভানটায় বসি।

চায়ে চুমুক দিয়ে মোবাইলটা বের করতে গিয়ে মনে হল— নেট ঘাঁটা যাবে না বেশিক্ষণ, নেট প্যাক প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। কিনতে ভুলে গেছি। ওয়াই-ফাই চলবে না। নেট কানেকশন খুলে রেখেছি। জগতের সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘন অন্ধকারের রাতে একা দূরদ্বীপবাসিনী আজ। মাঝে মাঝে আমি তো এমনটাই চাই; এমনই স্বেচ্ছাধীন থাকতে চাই তো! লিখতে চাই, পড়তে চাই, ভাবতে চাই, গলা ছেড়ে গাইতে চাই। আজ এই বৃষ্টি আর অন্ধকারের রাতে কবিতা পড়ব। আর বিছানায় শুয়ে 'আনক্যানি' বলে যে বইটা লাইব্রেরি থেকে এনেছি সেটা পড়ব। ফ্রিজ থেকে খাবার বের করা, গরম করা, খাওয়া, বাসনধোয়া, রান্নাঘর পরিষ্কার করা— এসব সময় নষ্ট করা কাজের ধারে কাছেই যাব না। হিং ফোড়ন দেওয়া রিমার আলুর চপ সত্যি দারুণ ছিল, আজ এই মুহূর্তে সুগন্ধি গরম চা প্রাণ জুড়িয়েছে। আর কিছু চাই না আজ। খুব জোরে বাজ পড়ল কোথাও। দমকা ভিজে হাওয়া কেমন একটা আঁশটে গন্ধ নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল! হাওয়াটা শীতল। দোতলার ব্যালকনি গ্রিল ঘেরা বলেই, কাচের দরজাটা খুলে রেখেছিলাম। দরজাটা বন্ধ করার জন্য এগোতেই আবার ঝলসে ওঠে বিদ্যুৎ আর রায়েদের খণ্ডহরের ইটের স্তূপের ওপর মনে হল একটা সাদা কাপড় পরা লোক দাঁড়িয়ে। ধুস্, দরজা বন্ধ করে ভারি পর্দাটাও টেনে দিই। যত্তসব মনের ভূত!

ঠিক এসময় আবার মোবাইলটা বেজে উঠল ধাতব সুরে। একটানা বাজতে থাকল। হাতে তুলে ছোট্ট স্ক্রিনে ফুটে ওঠা নামটা দেখেই কয়েক সেকেন্ডের জন্য দম বন্ধ হয়ে গেল; একি? আবার? আজই? নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগে আমার। আজ কি অমাবস্যা? আজ যে বাড়িতে আর জনপ্রাণীও নেই, এক্কেবারে একা আমি— সেটা কি অন্য কোনও ভুবন থেকে দেখতে পাওয়া যায়? মোবাইল কানের ওপর চেপে ধরে আস্তে করে উচ্চারণ করি 'হ্যালো'। যথারীতি ওপারে কেউ কোনও কথা বলে না। কিন্তু সেই অদ্ভুত এক ধ্বনি তরঙ্গ ক্রমাগত আশ্চর্য তীক্ষ্ণতায় কানের ভেতর দিয়ে মস্তিষ্কের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করতে থাকে! জড় পদার্থের মতো মোবাইল কানে চেপে দাঁড়িয়ে থাকি। এই নিয়ে তৃতীয়বার। আওয়াজটা জোরালো গর্জনের মতো ক্রমে বিপুল হতে থাকে; কোনও একটি মানুষের কণ্ঠস্বর নয়। মনে হচ্ছে সাউন্ডপ্রুফ একটা বিশাল হল ঘরে হাজার হাজার লোক একই সঙ্গে কথা বলছে। খুব উচ্চগ্রামে নয়; অজস্র নারী-পুরুষ কী যেন বলছে। শব্দগুলো কানের ভেতর গুণগুণ করে ঢুকে আসছে কিন্তু আলাদা করে সে শব্দের অর্থ বোধগম্য হচ্ছে না। এই দূরাগত ধ্বনি, স্ক্রিনে ভেসে ওঠা নাম্বার আর নামটা দেখেই সারা শরীরের রক্ত প্রবলবেগে ধেয়ে এসে আমার মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষের মধ্যে জমাট বেঁধে গিয়েছিল। ফোনটা কেটে দিতেই আবার রক্তসংবাহী নালির পথ ধরে তারা যথাস্থানে ফিরে যেতে শুরু করল।

কে? কী হচ্ছে এটা? কেনই বা এমন? কীভাবে? কিচ্ছু বোধগম্য হয় না। উনি কি কিছু বলতে চান? কী বলতে চান? নাকি ওনার বাড়ি থেকে অন্য কেউ? বৌদি

এসময় আবার মোবাইলটা বেজে উঠল ধাতব সুরে। একটানা বাজতে থাকল। হাতে তুলে ছোট্ট স্ক্রিনে ফুটে ওঠা নামটা দেখেই কয়েক সেকেন্ডের জন্য দম বন্ধ হয়ে গেল; একি? আবার? আজই? নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগে আমার। আজ কি অমাবস্যা? আজ যে বাড়িতে আর জনপ্রাণীও নেই, এক্কেবারে একা আমি— সেটা কি অন্য কোনও ভুবন থেকে দেখতে পাওয়া যায়? মোবাইল কানের ওপর চেপে ধরে আস্তে করে উচ্চারণ করি 'হ্যালো'।

তো রোগ জর্জর অবস্থায় বিছানাবন্দি শুনেছি। কোথাও কোনও হট্টমেলার মধ্যে গিয়ে বৌদি আমাকে ফোন করতে চাইবেনই বা কেন? আলাদা করে আমার কথা কি আর বৌদির মনে আছে? না থাকবার কথা! কী করব বুঝে উঠতে পারি না। কেমন এক শীতার্ত হাওয়া ঘরের মধ্যে ঘুরপাক খায়, সেই ধূপকাঠির গন্ধ নাকে এসে ধাক্কা মারে। আমি তো ধূপ জ্বালাইনি! কড়াৎ করে একটা বাজ পড়ে ধারেকাছেই। এতক্ষণে পুরো সম্বিত ফেরে আমার।

সন্ধে থেকে বুকের মধ্যে বুগবুগিয়ে ওঠা আনন্দের ভাবটা একটা ফোন কলই যেন ব্লটিং পেপারে শুষে নিয়েছে। কে যেন... কী যেন... আমি তাকে চিনতামই তো! কিন্তু এমনকি সে গভীরতম হৃদয়ে মনের সম্পর্ক যা কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূর থেকে... পরলোক থেকে এভাবে নিজ অস্তিত্বের জানান দিতে পারে? আজকের এই সময়ে বসে বিশ্বাস করা যায়? মাথাটা ভার ভার লাগে। প্রায় ঠান্ডা হয়ে যাওয়া চা কেমন বিস্বাদ মনে হল! এক লাইনও কিছু লেখা হয় না। কোনও গানও মনে পড়ে না। অমিতাভ দা খুব গান ভালবাসতেন। তিস্তা পাড়ে হাঁটতে গিয়ে উনি বলেছিলেন, 'যখন লেখা আসবে না তখন প্রিয় কবিতা পড়বে। নিজেকে শোনাবে। যখন জীবনের দুঃসহ কষ্টগুলো কালো মেঘের মতো ছেয়ে যেতে চাইবে হৃদয় আকাশ, তখন গাইবে। নিজের আত্মার, মনের, খুব যত্ন নিতে হয় পর্ণা জানো তো। গাও, একটা গান শোনাও দেখি।'

আমি তো গান তেমন জানি না, অমিতাভ দা, তবে গান শুনি। অনেক গান শুনি। গুণগুণ করি, লিখি দু'-চার লাইন। সত্যি মনের ভার অনেকটাই কেটে যায় আর আপনাদের মতো গুণি মানুষের সঙ্গ, এত সুন্দর কথা... ভালই লাগছে আবার এই বেঁচে থাকা।

'গুণি-টুনি নই ভাই। সারা জীবন কথা বেচেই তো আমার রুটি-রুজি। তোমরা যে আমার মতো বুড়ো মানুষের সঙ্গে মিশছো, মনের কথা বলছ— এই যে একবার বলাতেই আমার সঙ্গে হাঁটতে চলে এলে। এ আমার কত বড় পাওয়া তুমি বুঝবে না সুপর্ণা। জীবনের প্রান্তবেলায় এসে তোমাদের সঙ্গ পাওয়া, নতুন নতুন লেখা শুনতে পাওয়া— এসবই সারা জীবন ধরে আমার সাহিত্য সেবার পুরস্কার মনে করি। আমার দুর্বল হার্ট বিশুদ্ধ অক্সিজেন পায় বুঝলে। গাও সুপর্ণা, মনের মেঘ কেটে যাবে।'

তিস্তা বাঁধের পাথরের ওপর আমরা পাশাপাশি বসেছিলাম। ছলছল করছিল তিস্তার জল। ফুরিয়ে আসা বিকেলের আলোয় পুব আকাশেও রঙের আভা ছিল। পাখিরা বাসায় ফিরছিল। সেই মন কেমন করা সন্ধ্যায় গেয়েছিলাম— 'রাখতে যদি আপন ঘরে, বিশ্বস্বরে পেতাম না ঠাঁই/ দু'জন যদি হত আপন/ হত না মোর আপন সবাই'। পুরোটা গাইতে পারিনি; চোখে জল এসে পড়েছিল, গলা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। ওনার দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারছিলাম উনি আমার দিকেই চেয়ে আছেন, স্থির। তবে ওই মোটা কাচের হেভি পাওয়ারের চশমার আড়ালে ওনার চোখদুটো আমি কোনওদিন দেখতে পাইনি।

'অতুলপ্রসাদ, কী গান আহা! ওনার জীবনটা জান তো! বেদনাদীর্ণ হৃদয়ে লেখা এ গান। কষ্টগুলো ছিল বলেই এমন সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল, তাই না। বিরাট বিশ্ব, মানুষের কত কত কষ্ট; সেখানে একটা মানুষ অবিশ্বাসী হলেই জীবনে বেঁচে থাকার মানে ফুরিয়ে যায় নাকি? বিশ্বাস ভেঙে গেলে কষ্ট হয়; তীব্র কষ্ট হয় ঠিকই কিন্তু জীবন তো অনেক বড়। এই যে কলম সবাই কি পায়? ঈশ্বরে যদি বিশ্বাস করো তবে জেনো তিনিই কাউকে কাউকে নির্বাচন করেন। হাতে কলম তুলে দেন, সেই কলমকে আঁকড়ে বাঁচতে শেখো। সংসার থাকুক সংসারের মতো; সন্তান আছে, তাদের প্রতিও দায়বদ্ধ থাকতে হয়, কর্তব্য করে যেতে হয়। কিন্তু কলমকেই সবচেয়ে আপন, সবার বড় বন্ধু বলে জেনো।'

চলুন উঠি, অন্ধকার হয়ে আসছে। পাথুরে রাস্তা আপনার হাঁটতে কষ্ট হবে। মনে থাকবে আজকের সন্ধেটা। খুব মনে থাকবে আমার জানেন। মনটা হাল্কা হল। 'আমারও, আমি ভাবলাম বুড়ো মানুষের প্রস্তাবে তুমি রাজি হবে কি না এখানে আসতে। ভাল গলা তোমার, সুন্দর গাইলে তো!'

ওনার হাত ধরে পাথুরে বাঁধের রাস্তাটুকু পাড় করে নিচে পাকা রাস্তায় নেমে এসেছিলাম। তারপর রিক্সা ধরে একেবারে ওনার বাড়ির সামনে সাবধানে নামিয়ে দিয়েছিলাম। আমার তরফ থেকে সবটাই ছিল বরিষ্ঠ, পণ্ডিত মানুষটির প্রতি শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভালবাসা। তার বেশি কিচ্ছু নয়। কিন্তু... এই ফোন... এই নাম... স্ক্রিনে ভেসে ওঠা এই নম্বর...!!!

৩

বড্ড অস্বস্তি হচ্ছে! ওপরের বসার ঘরের, ডাইনিংয়ের, কিচেনের, বাথরুমের ছিটকিনি ভাল করে লাগিয়ে দিই। লাইট জ্বালিয়ে সিঁড়ি ঘরের গ্রিল আর কাঠের দুটো দরজাও বন্ধ করে দিই ভাল করে। কেন যে একটা অস্বস্তি ঘুরপাক খাচ্ছে সারা শরীর জুড়ে। প্রথমবার তো নয়, আগেও থেকেছি কয়েকবার একাই এ বাড়িতে। এমনটা হয়নি কখনও; একটা খারাপ লাগা— আনক্যানি ফিলিংস! ডাইনিং কাম ড্রয়িংয়ের সব লাইট জ্বালিয়েই রাখি, নিচের বসাবর ঘরেও আলো জ্বলে! আমি কি ভয় পাচ্ছি? ওই ফোন কলটা স্বস্তি দিচ্ছে না একেবারে। মনের খুশি খুশি ভাবটা উধাও হয়ে গেছে। উনি চলে যাবার পর, এই তৃতীয়বার ওই নম্বর থেকে ফোনটা এল। মাস পাঁচেক আগে রাত আটটা নাগাদ নির্দিষ্ট নম্বরটা থেকে কল এসেছিল। সুতপন তখন সান্ধ্য আড্ডায় বাইরে। সেবারেও ঘরে একা ছিলাম।

থরথর করে কেঁপে উঠেছিল আমার সারা শরীর, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছিল। কাঁপা হাতে ফোনটা তুলে কানে চেপে, 'হ্যালো— উচ্চারণ করেছিলাম খুব আস্তে করে। ওপাশ থেকে কেমন এক নিশ্বাসের শব্দ আর বিচিত্র সে গুঞ্জনধ্বনি; যেন একটা বিশাল বদ্ধ হলঘরের মধ্যে বসে হাজার হাজার নারী পুরুষ কথা বলছে, ডাকছে কেউ কাউকে। শব্দগুলোর অর্থ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না ...!

দশটা নাগাদ সুতপন বাড়ি ফিরেছিল যথারীতি। খেয়েদেয়ে, সিগারেট টেনে, খানিক টিভি দেখে, খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে বিছানায় গেছে। কিন্তু চেষ্টা করেও এই ফোনকলটার কথা বলতে পারিনি সুতপনকে। যেমন বিগত দশ বছর ধরে দিনের ভয়-ভাবনা-উদ্বেগ বা কোনওরকম আবেগের কথাই আর বলি না। পরদিন স্কুলে রিমাকে বলেছি— জানিস, সেই ফোনটা কাল রাতে আবার এসেছিল। 'কোনটা? ওহ্! কিছু বলছিল? আশ্চর্য তো।'

উহুঁ, প্রথমদিনের মতোই। তুইও তো শুনেছিলি। প্রবল গুঞ্জনের আওয়াজ, কেউ কিচ্ছু বলছে না। খুব ভয় পেয়েছিলাম কাল।

'আশ্চর্য, কী হচ্ছে ব্যাপারটা? খুব অদ্ভুত কিন্তু! একবার কলব্যাক করে দেখেছিস? হয়ত ওটা এখন বাড়ির অন্য কারও হাতে আছে। হয়ত কোনও ছোট বাচ্চার হাতে গেছে। কলব্যাক করে দেখিস তো।'

দোতলার ফাঁকা লাইব্রেরিতে চলে গিয়েছিলাম আমার অফ পিরিয়ডে। নম্বরটা টিপতে গিয়েই হাত কাঁপছিল, বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ! সত্যি যদি ফোনটা রিসিভ করে খুব আন্তরিক এক কণ্ঠস্বর বলে ওঠে, 'কেমন আছ পর্ণা। অনেকদিন পর তোমার গলা শুনতে পাচ্ছি। অপেক্ষায় থাকি তো; ফোন কর না কেন? বল কী লিখলে নতুন।' ... নাঃ কিচ্ছু নেই। যান্ত্রিক নারী কণ্ঠ বলছে 'দিস নাম্বার ডাজনট এক্সিস্ট'। নিশ্চিন্ত হবার মরিয়া চেষ্টায় আমি বারবার ওই নির্দিষ্ট নাম্বারে ফোন করি বারবার একই উত্তর দেয় যান্ত্রিক কণ্ঠ। হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। ভারি নিশ্চিন্ত বোধ করি। তরতর করে নেমে যাই স্টাফ রুমে। হাল্কা আর ফুরফুরে লাগছে। ক্লাস থেকে এলে রিমাকে জানাই— শোন, দিজ নাম্বার ডাজনট এক্সিস্ট বলছে। বেশ ক'বার ফোন করেছি। একই এনাউন্সমেন্ট। আশ্চর্য না, বলতো!

'সত্যি রে, কী জানি ক্রশ-কানেকশন হয়ে যাচ্ছে নাকি!' বছর খানেক হল জয়েন করেছে, ফুটফুটে চেহারার ইংরেজির কমলিকা বলে ওঠে হেসে হেসে, 'কী ব্যাপার গো তোমাদের? ফিসফিস করছ দু'জনে, ফোন-টোন আসছে? মাঝরাত্তিরে? আমি একটু একটু শুনতে পাচ্ছি কিন্তু। বল না গো কী ব্যাপার। শুনি একটু।'

পাশের টেবিল থেকে ম্যাথসের পল্লব বলে ওঠে, 'হুম আমিও একটু একটু স্মেল পাচ্ছি সুপর্ণাদি, রিমাদি! তবে ফোন-টোন আসা অস্বাভিক কিছু নয়। রাগ কর না, এখনও আরও কয়েক বছর তোমাদের কাছে হঠাৎ মাঝরাতে বা বর্ষার দুপুরে, বসন্তের সন্ধ্যায় ফোন আসবে বলেই আমার গভীর বিশ্বাস।'

'ওমা! পুঁচকি ছেলে এত কথা জানে। দ্যাখো কাণ্ড, অঙ্কের অজস্র সংখ্যার ভেতর এত রস! কবিতা লিখছ নাকি পল্লব আজকাল? লেখো, আমি একশভাগ তোমায় সমর্থন করব।' বলি আমি।

আমার কথায় কমলিকা একটু ব্লাশ করে। পল্লব আর কমলিকাকে নিয়ে আমরা একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রজাপতির নিবন্ধ মার্কা কথা বলি, স্টাফ রুমে। একটু একটু করে ওরাও হয়ত এগোয় পরস্পরের দিকে। মুখে কিছু স্বীকার করে না! এর আগে এই স্কুলে আর একটি এমন আনন্দময় ঘটনা ঘটেছিল। সে প্রায় বছর কুড়ি আগে; আমি তখনও এখানে জয়েন করিনি। কমলদা আর জয়াদি। সুখি দম্পতি, তাদের দুটি ছেলে একটি মেয়ে এই স্কুলেরই ছাত্র। বড় দুটি পাশ করে বেরিয়ে গেছে, ছোট মেয়েটি এখানেই নাইনে পড়ে। কমলিকা বলে, 'পর্ণাদি, রিমাদি— কথা ঘোরালে হবে না। বল নইলে কিন্তু হেড স্যারকে গিয়ে নালিশ করব। তদন্ত কমিশন বসিয়ে দেবেন উনি। তখন বুঝবে।' খুব হাসাহাসি হয়। আমি রোল কলের খাতাটা তুলে নিয়ে ইলেভেনের ক্লাসের দিকে যেতে যেতে বলি, 'হায় যদি তেমন সুসংবাদ দিতে পারতাম, খুব খুশি হতাম রে! কিন্তু বসন্তের কোকিল কোথাও ডাকেনি, শুধুই ভৌতিক কল বাছারা ভৌতিক কল!'

৪

ফুরফুরে মন নিয়ে ক্লাসে গিয়েছিলাম। মনের সব উদ্বেগ, ভয় কোথায় উড়ে গিয়েছিল

হাসাহাসি আর ঠাট্টা-তামাশায়। সামান্য একটা ফোন কল নিয়ে খুব বেশি বেশি ভাবছি নাকি? মোবাইল তো একটা যন্ত্রই, আর সে যে হরদম এ ধরনের ভুলভাল নানা কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলে, সে কথা কে না জানে? তারপর মাস পাঁচেক একদম চুপচাপ; এ ধরনের কোনও ঘটনাই ঘটেনি। যথারীতি প্রাত্যহিকের রুটিন ব্যস্ততায় ভুলেই গিয়েছিলাম এই আজব ইন্সিডেন্টের কথা। এক্কেবারে মাথা থেকেই বেরিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু আজ? আবার? সেই অস্বস্তিকর ফোন কল! দেড় বছর আগে প্রয়াত একটা মানুষের ফোন! আর ফোনের ওপ্রান্তে অদ্ভুত শ্বাস-প্রশ্বাস আর বিপুল গুঞ্জন ধ্বনি! এই অন্ধকার বৃষ্টির রাত, বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো এই বাড়ি আর একদম একা এই আমি। আলোগুলো জ্বলতেই থাকে, এক বোতল জল নিয়ে বেডরুমের ছিটকিনি আটকে দিই। বিষয়টা থেকে মনকে সরিয়ে নিতে চাই। ‘স্কিন কেয়ার’ নামে একটা কিট উপহার দিয়েছিল আমার লন্ডনপ্রবাসী পিসতুতো বোন মিতুল গত পুজোয়। সুদৃশ্য বক্সটা খুলে ছোট বড় নানা মাপের কৌটোগুলোর গায়ে লেখা নির্দেশিকা পড়ি। মিতুল বলেছিল, ‘তোর স্কিন কিন্তু ম্যাড়ম্যাড়ে হয়ে গেছে। তোর চেহারার, স্কিনের জেল্লা কিন্তু আর নেই রে দি-ভাই। এটা ব্যবহার করে দ্যাখ্। রাতে শোয়ার আগে জাস্ট পনেরো মিনিট সময় দে। দেখবি চেঞ্জটা। রেগুলার ব্যবহার করে দ্যাখ্। পরের বার আবার নিয়ে আসব।’ ব্যবহার পদ্ধতি পড়ে পড়েই ক্লান্ত লাগে। থাক গে কাল থেকে শুরু করব। কটন বল লাগবে, সামান্য গরমজল আরও নানা ফ্যাচাং। আজ পড়াটুকু তো হল। ঘুম আসবে না এমনিতে, গতকাল এসে পৌঁছানো আমার খুব প্রিয় একটা লিটল ম্যাগাজিন হাতে নিয়ে, বালিশে মাথা দিয়ে চোখ বন্ধ করে খানিকক্ষণ চুপ করে শুয়ে থাকি। ক্লান্ত আর বিপর্যস্ত মনটাকে গুছিয়ে নিতে চাই। আসাম থেকে প্রকাশিত পত্রিকাটির জবরদস্ত সম্পাদকীয় ভারি পছন্দ আমার। বরাক উপত্যকার প্রেক্ষাপটে একটা ধারাবাহিক উপন্যাসও পত্রিকাটিতে থাকে। বেশ লাগে। আমার একটা কবিতাও আছে এ সংখ্যায়। পত্রিকায় চোখ বোলাতে গিয়ে কখন ঘুম এসে গেছে। হাত বাড়িয়ে কোনওরকমে বেড সুইচটা অফ করে গভীর ঘুমে তলিয়ে যাই।

জানি না রাত কত তখন, কেমন একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখে সার শরীরে একটা অস্বস্তি নিয়ে ঘুমটা টাল খেয়ে যায়। স্বপ্নে দেখলাম কেমন এক শুনশান জায়গা, এধারে-ওধারে অল্পকিছু নির্মীয়মান বাড়িঘর। খুব ছুটে ছুটে আমি যেন কোথায় পালাতে চাইছি! রাস্তার ধারে কাঁটা ঝোপটোপের পাশে একটা গভীর ড্রেনের মধ্যে যেন কীভাবে উল্টে পড়ে গেলাম। সারা জামাকাপড়ে গায়ে-মাথায় কাদায় মাখামাখি। চেষ্টা করেও নিজে উঠতে পারছি না... বৃত্তাকার একটা ভিড় ঝুঁকে পড়ে আমা দেখছে কিন্তু কেউ হাত বাড়িয়ে টেনে তুলছে না! আমার খুব কান্না পাচ্ছে... সাহায্য চেয়ে চেয়ে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি, কেউ এগিয়ে আসছে না। ঘুম ভাঙার ঠিক আগের মুহূর্তে মনে হল, কেউ যেন মাথার বালিশটা ধরে আস্তে আস্তে টানছে। হাত বাড়িয়ে সুইচটা টিপতেই ঘরটা হেসে ওঠে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর-বিছানা। কোথাও কাদামাটি ময়লা-আবর্জনার চিহ্নমাত্র নেই। মাথার বালিশও ঠিকঠাক। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে, অনেকটা জল খেয়ে ফেলি ঢকঢক করে। ঘড়িতে রাত দুটো। ঘুম কি আর আসবে চট করে? পত্রিকাটি হাতে নিয়ে পাতা ওল্টাই। দু'-চার পাতা পড়তে পড়তেই চোখ জড়িয়ে আসে। হাত থেকে একপাশে পড়ে যায় বইটা। ঘুমিয়েই পড়ি। ঘুমের মধ্যেই মনে হয় আবার কেউ বালিশটা ধরে আস্তে আস্তে টানছে। ঘুমোতে দিতে চাইছে না যেন। আঁকড়ে ধরি বালিশটাকে, ঘুম ভেঙে যায়। লাইট কে অফ করল? লাইটটা জ্বালিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম না? সুইচের দিকে তাকিয়ে দেখি সে তো অন করাই, তাহলে? ঘড়িতে ভোর পাঁচটা, দু'-একটা পাখি ডাকছে হাল্কা সুরে। উঠে পড়ি বিছানা ছেড়ে, দরজার ছিটকিনি খুলতে গিয়ে ডান ধারের সুইচবোর্ডের দিকে চোখ চলে যায়। অবাক হয়ে দেখলাম, এখানে সুইচটা অফ করা। আমি কি ঘুমের ঘোরে উঠে এসে এখানে সুইচ অফ করেছি? কই, মনে পড়ছে না তো একদম। আশ্চর্য! কী যে সব হচ্ছে উল্টোপাল্টা। কেমন এক অস্বস্তি নিয়ে বিছানা ছেড়েছি। ভাল ঘুম হয়নি সারা রাত, বারবার চটকে গেছে। আর যতসব দুঃস্বপ্ন! চোখে মুখে জল দিয়ে চায়ের জল চাপিয়ে একে একে সব দরজা-জানালা খুলে দিই। ঘরে এসে হুটোপুটি খায় ভোরের মিঠে হাওয়া, দু'-একটা পাখির ডাক। শরীর মন বেশ চাঙ্গা হয়ে ওঠে। চা বানিয়ে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়িয়ে চারধারটা চোখ বোলাই। আকাশ আড়মোড়া ভাঙছে। কাল রাতের অঝোর বৃষ্টিতে স্নান সেরে গাছপালা কেমন শুদ্ধ সতেজ হয়ে উঠেছে। পুব আকাশে মৃদু রঙের আভা। মনে হল ছাদে যাই, আরও অনেকটা দূর দেখা যাবে।

ঘুম ভাঙার ঠিক আগের মুহূর্তে মনে হল, কেউ যেন মাথার বালিশটা ধরে আস্তে আস্তে টানছে। হাত বাড়িয়ে সুইচটা টিপতেই ঘরটা হেসে ওঠে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর-বিছানা। কোথাও কাদামাটি ময়লা-আবর্জনার চিহ্নমাত্র নেই। মাথার বালিশও ঠিকঠাক। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে, অনেকটা জল খেয়ে ফেলি ঢকঢক করে। ঘড়িতে রাত দুটো। ঘুম কি আর আসবে চট করে? পত্রিকাটি হাতে নিয়ে পাতা ওল্টাই।

ছাদের দরজা খুলতে গিয়ে আর একবার ঝটকা লাগল। কাঠের দরজাটা হাঁ করে খোলা! গ্রিলের দরজাটা যথাযথ। এ আবার কী? কাল রাতে সিঁড়ির লাইট জ্বালিয়ে নিজের হাতেই তো দুটো দরজাই বন্ধ করে গেলাম। তবে?

কাল রাতে ঘুমের মধ্যেই যেন ছাদে কেমন সব শব্দ পেয়েছি। ঢক ঢক করে একটা শব্দও হচ্ছিল তো! তাহলে হাওয়ার ঝটকায় কাঠের দরজার ছিটকিনি খুলে গিয়েছিল আর দেওয়ালের সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছিল? আশ্চর্য এমন তো হয়নি কোনওদিন!

ছাদে দেখি কয়েকটা ফুলের টব উল্টে পড়েছে, ভেঙেওছে। ঝাঁটা, খুরপি নিয়ে কাজে লেগে পড়ি। সেসব শেষ করে বেশ জোরে জোরে খানিকক্ষণ হাঁটি, জগিং করি। মনের শরীরের ঝিমোনো ভাব কেটে যায়। রায়েদের ভাঙাচোরা ঘর-বারান্দা ইটের স্তূপের দিকে চেয়ে ভয় নয়, কেমন মায়া হয়। সত্যি তো এককালে কত রমরমা ছিল এ বাড়ির, সারা জেলায় এদের কত নাম যশ। আর আজ এক খণ্ডহর মাত্র! দশ-শরিকের হাতে পড়ে অসহায়ভাবে শেষদিন গুনছে। কত মানুষজনে ভরা ছিল এদের বিশাল বাড়ি, আজ সব ছত্রখান। সত্যি কোথায় যায় মানুষেরা মৃত্যুর পর? কোথাও তো, কোনও চিহ্নই থাকে না আর! নীচে এসে সকাল সকাল স্নান সেরে, ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দিতে গিয়ে দেখি দেশলাই নেই। সুতপনও নেই যে ওর ঘর খুঁজলেই পাব। থাক, পরে গ্যাসের উনুন থেকে জ্বালিয়ে নেব। লেখার টেবিলে এসে বসি। লেখা তেমন কিছুই হয় না। ভুলে যেতে চাইলেও কাল রাতের কিছু দৃশ্য-ঘটনা ঘুরে-ফিরে মনে পড়তে থাকে। ন'টা নাগাদ শান্তাদি যেন আমায় শান্তি দিতেই আসে। ঘরদোরের কাজ সেরে রান্না বসায় আর তার প্রতিদিনের রোজনামচা আউরে যেতে থাকে।

এগারোটা নাগাদ রিমা ফোন করে, কিরে কেমন কাটল তোর রোমান্টিক, স্বাধীনতা দিবস আর রিমঝিম বৃষ্টিধোয়া প্রথম রাত। কী লিখলি? আজ যাবি একটা জায়গায়?

—তোকে আমি ফোন করতামই। কাটল প্রথম রাত, নো রোমান্টিকতা, নো কবিতা। বল কোথায় যাবি?

আর প্যারেন্টদের নাকি দেখাই উচিত। যাবি?

—ঠিক হ্যায়, চল যাই। আর একটা কথা আছে তোর সঙ্গে জানিস। তোকে না বলে শান্তি নেই। দেখা হলে বলব। ক'টায় বেরোবি?

আমি একটু আগে বেরিয়ে এটিএমে যাব। মেয়েকে টাকা ট্রান্সফার করব। যে আগে পৌঁছাবে, সে টিকিট কাটবে। ঠিক আছে?

ওকে ম্যাম।

৫

সারাদিন নানা কাজে সময় কাটে। প্রতিদিনের মতই শান্তিদি সব কাজ সেরে দুপুর দুটো নাগাদ চলে যায়। কালকের কেনা ম্যাগাজিনগুলো নিয়ে বিছানায় একটু গড়িয়ে নিই। ঘুমঘুম পায়; সুতপন ফোন করে। সন্ধেয় ছেলের সঙ্গে দেখা হবে জানায়। মেসেঞ্জারে ছেলেকে কৌশিকী চক্রবর্তীর গাওয়া একটা গানের ভিডিও পাঠাই। ছেলে একটা হাসিমুখের ইমেজ আর খানিক বাদে পাঠায় পিট সিগারের ‘ডাউন বাই দ্য রিভার সাইড’ গানের ভিডিও। ‘হার্ড রক আমি নিতে পারি না বাবু, রাগ করিস না। এটা মাইন্ড সেট-আপের বিষয় রে। আমাদের মন, চোখ, কান একটু আগের তো— বয়সের ব্যাপার। রস গ্রহণ করতে না পারলে মজাও আসে না— বুঝে দেখিস।’ বলেছিলাম ছেলেকে তো তারপর থেকে মিউজিক ভিডিও পাঠালে, হয় ইনস্ট্রুমেন্টাল নয়ত পুরনো ফোক বা ক্লাসিক মিউজিক ভিডিও পাঠায় সে। তবে আমাদের দু'জনেরই খুব পছন্দের অনুষ্কা শংকরের সেতার। মিউজিক আর গল্পের বই দুটোই ছেলের খুব প্রিয়।

চারদিকে দিনের আলো ঝলমল করলেও সারা বাড়িতে লাইট জ্বালিয়ে পৌনে চারটায় সেজেগুজে বেরোই। এ গলিতে মিউনিসিপ্যালিটির খুঁটির সঙ্গেই সুইচ ঝুলিয়ে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। রাস্তার আলো জ্বালিয়ে দিই। রিমা দেখি টিকিট কেটে দাঁড়িয়ে। খুব ভাল লাগল ‘হামি’। বাচ্চাদের আদৌ নয় বড়দের জন্য এ ছবি। অভিভাবক আর শিক্ষকদের জন্য— মনে হল আমাদের। হল থেকে বেরিয়ে মিক্সড ফ্রায়েড রাইস আর কাশ্মিরী আলুর দম অর্ডার দিই ‘লহর’ নামের আমাদের পছন্দের রেস্তোরাঁয় বসে। প্রথমে দু' কাপ কোল্ড কফি চেয়ে নিই আমরা।

'হ্যাঁ বল, কী বলতে চেয়েছিলি।' —রিমার চিন্তিত চোখ দুটো আমার সারা মুখে ঘুরে বেড়ায়। খুব সিরিয়াস আর দায়িত্বশীল মেয়ে রিমা আমি জানি। শুধু নিজের মেয়েরই নয়, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল ওকালতিতে ব্যর্থ ওর বড়দা, তার ছেলেমেয়ের পড়াশোনার খরচের অনেকটাই সামলায়। বন্ধুদের জন্য যে কোনও সাহায্যে একপায়ে খাড়া। স্কুলের দুঃস্থ ছেলেমেয়েদের জন্যও অনেক কিছুই করে ও। আমার ফুটিফাটা দাম্পত্যের কার্য-কারণ জানে। আমার লেখালেখির চেষ্টাটুকুকে খুব উৎসাহ দেয়। সম্ভব হলে যায়ও দু'-একটা সাহিত্যসভায় আমার সঙ্গে। সুতপনের বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই আমার লেখালেখি নিয়ে। বরং মাঝেমধ্যে ওর বাঁকা ব্যাঙ্গাত্মক মন্তব্য শুনে মনে হয়— সত্যি কি এই উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীটিকে সুশিক্ষিত বলা যায়? নাকি আমার লেখালেখি নিয়ে ওর অবহেলার ভঙ্গিটির পেছনে কোনও গোপন ঈর্ষা কাজ করে?

কী রে বল, কী ভাবছিস? চুপ করে আছিস কেন? রিমা ভ্রু কুঁচকে আবার জিজ্ঞেস করে। কোল্ড কফিতে চুমুক দিয়ে বলি— কাল একটা অদ্ভুত রাত কেটেছে জানিস! আমাদের গলির শেষমাথাটা সেই ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। লাইট-টাইট জ্বালিয়ে আসিনি কাল, তায় বৃষ্টি। কেমন একটু ভয় পেয়ে গেলাম, বুঝলি। রায়েদের ওই ভাঙাচোরা ঘরবাড়ি দেখলে এমনই কেমন অলুক্ষুণে লাগে। তাতে কালকে অত অন্ধকারে...

আমার কথা শেষ করতে না দিয়েই ও একটু রেগেমেগেই বলে ওঠে, তোকে আমি বলেছিলাম থেকে যা। শুনলি না। ছাতা, টর্চ নিতে বললাম— তা ও নিলি না। সত্যি তুই কী রে? চারদিকে কতরকম যাচ্ছেতাই কান্ডকীর্তি হচ্ছে। চারমাস বয়স থেকে আশি বছর— কোনও মেয়ের বিন্দুমাত্র নিরাপত্তা আছে? এবারে এইসব রাত-বিরেতে একা একা ঘোরাফেরা দয়া করে বন্ধ কর তুই। অঘটন একটা ঘটে যেতে পাঁচ সেকেন্ডও লাগে না, বুঝলি। তোর বরের বিন্দুমাত্র চিন্তা আছে তোর জন্য? না আর কারুর আছে?'

—তুই তো আছিস। ওর রাগ কমানোর জন্য বলি। সে অন্ধকারে আমার আগে আগে হেঁটে যাওয়া সাদা পোষাকের মহিলা, লাইটের সুইচ অফ হওয়া, বালিশ ধরে কেউ টানছিল সে অস্বস্তিকর অনুভব বা ছাদের কাঠের দরজাটা হাট করে খুলে থাকা এসব আর কিছু ওকে বলি না। জানি ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়বে ও। আমায় একা বাড়িতে থাকতে দিতে চাইবে না। কিন্তু এতবড় একটা কোলাহলমুখর শহর, কত গাড়ি-টাড়ি, লোকজন, ভিড়ভাট্টা সেখানে নিজের বেঘোরেই হয়ত ওসব ঘটেছে তার ওপর একটা অন্যরকম অন্য জগতের ছায়া সেঁটে দিতে চাই না। কিন্তু ফোন কলটার কথা তো ওকে বলতেই হবে। একদম প্রথম দিনের কথাটা মনে আছে; মানে যেদিন অদ্ভুত মুহূর্তে এই রহস্যময় কলটা এসেছিল। সেদিন সে মুহূর্তে আমার সঙ্গে রিমাই ছিল। কী আকস্মিক আর কী ভয়ংকর ছিল সে মুহূর্ত। অদ্ভুত আতংকে কেঁপে উঠেছিল আমার সমস্ত সত্ত্বা!

—শোন না, কাল রাতে আবার সে নম্বর থেকে ফোন কল এসেছিল জানিস!

কী? আবার? অমিতাভদার নম্বর থেকেই? কী আশ্চর্য! সত্যি? কী বলছিস? কিছু কথা হল, নাকি সেই অদ্ভুত গুণগুণ শব্দই হচ্ছিল?

—হুম, ওই নম্বর থেকেই। হ্যালো, হ্যালো বললাম তো। কোনও আওয়াজ নেই। শুধু অদ্ভুত সেই গুঞ্জন। তারপর লাইন কেটে দিলাম।

একবারই এসেছিল ফোনটা? নাকি বারবার? বুঝতে পারছি না। বিএসএনএল-এর নম্বর না?

—হুম, একবারই। খুব অস্বস্তিকর জানিস তো। ভাল লাগছে না আমার। একটা মৃত মানুষ কীভাবে ফোন করতে পারে?

আচ্ছা, আমাদের তিনতলার ফ্ল্যাটে শিবব্রতবাবু আর কণিকা দুজনেই বিএসএনএল-এ চাকরি করে জানিস। এবার একটু পাত্তা লাগাতে হবে তো এদের দিয়েই! আগে একটু খোঁজ নিয়ে দেখি। কী বলিস? ক'বার হল রে এই নিয়ে? প্রথমবার আমি তোর সঙ্গে ছিলাম। একা থাকলে সেদিন তোর কী যে হত। তোর চোখমুখের যা অবস্থা হয়েছিল! বাব্বা।'

—এই নিয়ে তৃতীয়বার। প্রথমবার তো সেই রাস্তার মধ্যে। তার মাস আটেক পর দ্বিতীয়বার। স্কুলে তোকে বলেছিলাম না! কমলিকা, পল্লব ওরা ছিল স্টাফরুমে। মনে আছে তোর? আর কাল রাতে, প্রায় মাস পাঁচেক পর আবার। বেশি রাতে নয় কিন্তু। তোর বাড়ি থেকে ফিরে একটু ফ্রেশ-ট্রেশ হয়ে– ধর সাড়ে ন'টা, দশটা হবে।

তুই ভয় পেয়েছিস না? কাল ওরকম একা বাড়িতে। ফোন করতে পারতিস আমায়।

—না ভয় পাইনি; ওই তোর খারাপ লাগছিল। অনেক কথা মনে আসছিল।

'শিবব্রতবাবুকে দিয়ে ওদের অফিস থেকেই কল লগটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। নম্বারটা লিখে নেব;ওনাকে দেব। তুই একটা কাজ করবি তারপর; নম্বরটা ডিলিট করে দিবি তোর মোবাইল থেকে। বেশ রেখে দিয়েছিস শুধু শুধু!

—হ্যাঁ ঠিক বলেছিস। একদম ডিলিট করে দেব। এতদিন কেন করিনি, সেটাই আশ্চর্য!

লহরের খাবার আমাদের দুই বন্ধুরই খুব পছন্দের। আরাম করে ধীরে সুস্থে রাতের খাবার শেষ করি আমরা।

তুই বোলপুর যাবি বলেছিলি না, নেক্সট মানথে? কবি সম্মেলন না সেমিনার কী আছে যেন তোর?

—হ্যাঁ, কবিতা উৎসব। যাব, কথা দিয়েছি। হলদিবাড়ি সুপারে টিকিটও কেটে রেখেছি। বোলপুর যেতে আমার সবসময়ই ভাল লাগে। পয়সা-কড়ি থাকলে ছোট্ট একটা বাড়ি বানিয়ে নিতাম আর চাকরি শেষে ওখানেই শিফট করতাম।

ভাল আইডিয়া। চল একটু পান খাই, সুবোধদার দোকানের মিষ্টি পান। হ্যাঁ শোন, ভাল কথা বললি খোঁজ করিস। যদি সেকেন্ড হ্যান্ড বাড়িও পাওয়া যায় শান্তিনিকেতনে দুজনে মিলে কিনে নেব। বানপ্রস্থের দিনগুলো ওখানেই আনন্দে কাটাব আমরা। কী বলিস!'

—একদম খুশি খুশি কেটে যাবে শেষের সে দিন ক'টা। ছেলেমেয়েদের কাঁধের বোঝা হব না। যখন ডাকবে বেবি-সিটিংয়ে, তখন গিয়ে ছানাপোনাদের দেখভাল করে বড়-টড় করে দিয়ে আসব। কী বলিস?

বাবা তুই তো অনেকটা ভেবে নিয়েছিস। আর তোর বর? সুতপনদা তার নার্সিং করতে হবে না?

—অ কেষ্টঠাকুর! এর মধ্যে ও যদি কোনও গোপিনীর গলায় ঝুলে পড়ে তবে তো নো চিন্তা। ভাল মাইনে পায়, প্রচুর পেনশন পাবে। চেহারা-টেহারা এখনও বেশ ভাল। কলকাতায় ফ্ল্যাট, ধূপগুড়িতে পৈতৃক বাড়ি। সমস্যা কী? সুপাত্রই তো।

ওই আনন্দেই থাক। গোপিনীদের ঠেকা পড়েছে, তোমার বুড়ো বরকে বিয়ে করতে যাবে! প্রমোশনের সিঁড়ি— ব্যস, ওখানেই লক্ষ্য। শার্টের বোতাম খুলে বুকে একটু মুখ ঘষে দিল, ক্লিভেজ দেখিয়ে বসের নোট-টোট নিল। তারপর বেশ ক'টি উইকএন্ড ট্যুর। বুড়ো তো হাবুডুবু— প্রেমের জোয়ারে। উপহারে-হীরের দুল, কানের ফুল মায় একটা ফ্ল্যাট বাড়ি-টারি। প্রমোশন, ট্রান্সফার। টা টা বাই বাই... আর যেন না দেখা পাই।

ওর কথার ধরনে হো হো করে রাস্তার মধ্যেই হেসে ফেলি আমি। আশপাশের দু'-চারটে লোক ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়। পুরো রাস্তাটাই আমরা হেঁটে ফিরতে থাকি।

হাসছিস কী? মিথ্যে বলেছি? এমন গুডি গুডি কবি বউ। তার ভাল মাইনে, নিজের বাড়ি— বিদ্রোহটুকু শুধুই কবিতার ছত্রে, গল্পের চরিত্রের মনে। বাকি তো চমৎকার মানিয়ে চলিস। লক্ষী পতিমে একটি। তার বৃদ্ধ বয়সের বেডপ্যান তোমারেই পোস্কার কত্তি হবে বন্ধু।

—বলিস না আর। ভাবতেই কেমন লাগে। আবেগহীন, প্রেমহীন একটা সম্পর্ক... তায় বুড়ো বয়সে তার সেবা? সম্ভব? একটা পছন্দের গোপিনীকে নিয়ে চলে গেলেই পারত। যবে থেকে এসব কীর্তি আমি জেনেছি— তা-ও বছর বারো তো হয়েই গেল। ঢুকু ঢুকু জল না খেয়ে, পুকুরে নেমে ডুব দিতে দোষ কি ছিল? এককথায় ডির্ভোস দিয়ে দিতাম। খোরপোষও চাইতাম না। ভালবাসতাম রে একেই। আশ্চর্য!

নিজেও তো এগলি না। কেঁদে-কেটে অস্থির হয়ে প্রেশার-ট্রেসার দুনিয়ার রোগ বাঁধালি। দুনিয়াটা এইরকমই পর্ণা, যে যত সহ্য করে, তাকেই তত কষ্ট দেয়।

—আসলে ওই থানা-পুলিশের চক্কর, টাকা-পয়সার শ্রাদ্ধ। কোর্টে-মোর্টে ঘোরাঘুরি, এসব করলে করতে পারতাম। আমার ছেলেটা ডিপ্রাইভ হত। বাবাকে পেত না। ছেলের সঙ্গে তো সম্পর্ক সুতপনের ভালই। মাইনেপত্তর উকিলের পিছনে ঢাললে, কী করে বাড়িঘর করতাম, কী করে ছেলেকে মানুষ করতাম! আমার মা-বাবাকেও অনেকটাই দেখতে হয়েছে আমার জানিস তুই। আর সুতপন কোনওদিন গায়ে হাত তোলেনি, এটাও ঠিক। তর্জন-গর্জন বাঁকা কথা অনেক রকমের ট্রিটমেন্ট ওর। জাস্ট অসহ্য। মাঝে মাঝে মনে হয় ছেলে তো বুঝদার হয়েই গেছে। পাশ-টাশ ঠিকই করবে, চাকরিও পাবে, আসল কঠিন সময়টা হাত ধরে পার করে দিয়েছি। এখন দূরে কোথাও গিয়ে নিজের মতো থাকি— শুধু কতগুলো বইখাতা সঙ্গে নিয়ে, শান্তিনিকেতনে চলে যাই। মাঝে মাঝে কী যে কষ্ট হয়! একই ছাদের তলায় এভাবে থাকা... কী যে যন্ত্রণার... উফ্‌ফ।

শোন একটা কথা বলব? অমিতাভদা কিন্তু তোর কষ্টটা বুঝতেন; খুউব ভালবাসতেন তোকে। তাই ওপারে গিয়েও শান্তি পাচ্ছেন না। ফোন করছেন নাকি কে জানে সেজন্যই! মৃত্যুর পর হয়ত মানুষের কণ্ঠস্বর হারিয়ে যায়। আসলে শরীরই তো থাকে না, তাহলে তার বাগযন্ত্রই বা থাকবে কী করে?

—কী ভাট বকছিস? সুতপনের সঙ্গে আমার শীতল সম্পর্ক নিয়ে কখনও ওনার সঙ্গে আলোচনা করিনি আমি। তবে বুঝে নিতেন অনেক কিছুই! যেমন আমাকে একবার অনুরোধ করলেন, তিস্তার ওধারে হাঁটতে গেলাম। গান শোনালাম, অনেক বিষয় নিয়ে কথা হল। তখন একবার বললেন, 'পর্ণা তোমাকে একটু বুঝতে চাইছিলাম ভাল করে। সুন্দর, শিক্ষিত, সুখের জীবন তবুও তোমার লেখায় এত যন্ত্রণা কেন?

এত নীল রং, এত কান্না, ক্ষোভ কেন? তাই তোমার সঙ্গে একটু নির্জনে সময় কাটাব ভাবলাম। তোমার কবিতার বইটা পড়ে আমার একটু জানতে ইচ্ছে করছিল— সুবেশা, সুন্দরী, সভা-শোভন, হাস্যমুখি মেয়েটির কবিতার চরণ বড্ড কাতর, যন্ত্রণাক্লিস্ট! আড়াল করে রাখা অন্দরমহলটি দেখতে চাইলাম।'

কবিরা তো দার্শনিকই হন। তোর লেখা পড়েই উনি হয়ত তোকে বুঝেছিলেন রে পর্ণা। এমন ফুটফুটে চেহারা, সে এমন রাগী কবিতা লেখে কেন? তার খোঁজ করছিলেন, হয়ত আশংকা করতেন তোর এই ক্রোধ কোনও অঘটন না ঘটিয়ে ফেলে। তাই হয়ত আগলে আগলে রাখতে চাইতেন। তোকে ভালই বেসেছিলেন। তুই হয়ত ওনার জীবনের সর্বশেষ প্রেমিকা, পর্ণা।

—কী জানি, তবে আমার তরফ থেকে শ্রদ্ধা আর ভাললাগাটুকু ছিল। উনি এখানে মেয়ের কাছে এলে, আমার বাড়িতে প্রত্যেকবার দেখা করে যেতেন। ফোন করতেন। পর্ণা আমি তোমার শহরে এসেছি— জানাতেন। যতদিন একা হাঁটাচলা করতে পারতেন, এসে পড়তেন হাসিমুখে। সাদা পায়জামা পাঞ্জাবী, কাঁধে কাপড়ের একটা ঝোলা। এককাপ লিকার চা, একটা বিস্কিট— ব্যস, এটুকুই আপ্যায়ন। দেড়-দু'ঘণ্টা গল্প হত, আড্ডা হত। নতুন লেখা শুনতেন, আরও বেশি বেশি করে লিখতে বলতেন। সমালোচনা করতেন, কী কী বই আমার পড়া উচিত সেসব নির্দেশ দিতেন। উনি এলে আমিও খুব খুশি হতাম— এত খ্যাতিমান গুণি লেখক আলোচক সম্পাদক, দ্যাখো আমার মতো সামান্য অখ্যাত একটা মানুষের কাছে লেখা শুনতে চাইছেন— এরকম ভাবতাম। ভাগ্যবান মনে করেছি নিজেকে। তবে ওনার সমালোচনার ভাষা বড্ড তীব্র আর কঠোর ছিল। সবটা ঠিক নিতে পারতাম না। ভেতরে ভেতরে রেগে উঠতাম, বিরক্ত হতাম। পরের দিকে এড়িয়ে যেতাম। ফোন করলে বলতাম, 'খুব খাতা দেখার চাপ অমিতাভদা'। কখনও বলতাম, 'আচ্ছা আমি যাব, আপনার মেয়ের কোয়ার্টারে দেখা করে আসব। এখন তো বাইরে আছি।' হয়ত বুঝে নিয়েছিলেন আমি এড়িয়ে যাচ্ছি। জানি না। কিন্তু এখন এভাবে এসব ফোন-টোন খুব আশ্চর্যের!

আমরা গলির মাথায় দাঁড়িয়ে কথা বলি আমি আর রিমা। আজ আকাশে মেঘ থাকলেও বৃষ্টি নামেনি। হয়ত রাতের বেলা নামবে। গলির ওমাথার আলোটাও জ্বলছে।

ওনার তোকে লেখা চিঠিগুলো তো তুই পড়িয়েছিস, তাতেই বুঝতাম তোর জন্য ওই প্রান্ত বয়সে ওনার একটা টান তৈরি হয়েছিল। খুব গভীর টান। নইলে ওই বয়সে পৌঁছে— চোখের সমস্যা, হার্টের সমস্যা নিয়েও তোকে চার পাতা, পাঁচ পাতা ভরে উনি অত অত চিঠি লিখতে যাবেন কেন বল? কী অপূর্ব ভাব আর ভাষা সে সব চিঠির। আমার খুব ভাল লেগেছিল। সত্যি অনেক উঁচুদরের পণ্ডিত মানুষ ছিলেন কিন্তু।

—হুম, তখন সংসার, ছেলে, শাশুড়ি, সুতপনের ব্যবহার, স্কুল, খাতার চাপ, ছেলের টিউশন, বাড়ির লোন-টোন সব নিয়ে এমন মানসিক অবস্থায় ছিলাম— এসব বিষয়ে তত গভীর মনযোগ দিতেই পারিনি। ইচ্ছেও হয়নি। মাঝেমধ্যে লিখছি এখানে-ওখানে ছাপা হচ্ছে ওতেই সন্তুষ্ট। ওনার এ বাড়িতে আসা সুতপন পছন্দ করত না একেবারে— 'তোমার গুণমুগ্ধ বুড়ো নায়কবাবু এসে পড়েছেন, যাও এবারে ঘণ্টা তিনেক স্তুতি শোনো'— এরকম আলটপকা কথাবার্তা বলত ও। খুব খারাপ হয়ে যেত মনটা। শুধু উনি কেন— কোনও কবি, লেখক, সম্পাদক, আমার বন্ধু-বান্ধব, বাপের বাড়ির লোকজন এখানে আসুক সেটা সহ্য করতে পারে না এখনও। নিজে কি সৎ থাকতে পেরেছে দাম্পত্যে? চিন্তা করে দ্যাখ্। সেই মধ্যযুগীয় স্বামীগিরি আমার ওপর। মুখে কিছু না বলে এই যে এতগুলো বছর ধরে বেডরুমটা আলাদা করে নিয়েছি— এটাই আমার তরফ থেকে ওর জন্যে শাস্তি। নিজের ঘরে বসে ইচ্ছে মতো দু'-চার লাইন লিখতে তো পারছি।

রাতে বৃষ্টি হবে দ্যাখ্, কালো হয়ে আছে সারা আকাশ। একটাও তারা দেখা যাচ্ছে না। ক'দিন থাকবি এবার শান্তিনিকেতনে? কত তারিখে যাচ্ছিস?

—ও ফিরছে শুক্রবার, গরমের ছুটি শুরু সামনের সোমবার থেকে। ওদিনেরই টিকিট কাটলাম। তোকে বলেছি।

হ্যাঁ, আমি দাঁড়িয়ে আছি, তুই যা। ঢুকে তালা দিয়ে দে। পাশের বাড়ির ওরা আসেনি?

—না, কাল না পরশু যেন আসবে। আসবি না বাড়িতে? ও দাঁড়িয়ে থাকে গলির মাথায়। বলে, না, আজ না, তুই যা। জামা-কাপড় আয়রন করব। কালকের জন্য সবজি কেটে রাখব। মেয়েকে ফোন করব। ইনকামট্যাক্সের কাগজ-পত্র গুছিয়ে রাখব। তুইও গুছিয়ে নিস। ছুটির আগে সব জমা দিতে হবে। নোটিশে সই করেছিস তো।

ও দাঁড়িয়ে থাকে গলির মাথায়। আমি এগোই। একী বাইরের ছোট গেটটা খোলা? কেউ এসেছিল নাকি? তালা-টালা লাগিয়ে দি। সিনেমাটা ভাল করেছে। কোনও আঁতলামি নেই— সিনেমার সহজ ভাষায় দর্শকের কাছে পৌঁছনো। বেশ হয়েছে। ভ্যাপসা গরম, দোতলার ব্যালকনির দরজা খুলে দিই। কাল রাতে ভাল ঘুম হয়নি, আজও মেলা বক্‌বক্ করলাম। দুজনের সব গল্পই দুজনে জানি। জীবনের ভাঙচুরের গল্প; মেঝেয় জমে থাকা ধুলো আবর্জনার কথাও জানি, ওপরে সুদৃশ্য কার্পেটটা লোকে দেখে। আমরা কে জানে কেন সে কার্পেট সরিয়ে রেখে মুখোমুখি বসি। দুঃখ বেটে নিই। হয়ত ক্ষতয় প্রলেপ পড়ে!

ইকনমিক্সে তুখোড় রেজাল্ট করা মেয়ে, একটা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের টিচার, ভাল মাইনেপত্তর। একটা বাচ্চার মা। যার বাবা ছিলেন জেলার, সেই রিমার গায়ে হাত তুলতো ওর বর। হাত কেন শুধু বেল্ট-ফেল্ট দিয়েও মারদোর করত ওর বর বিমলেন্দু। ভালবেসে বিয়ে করেছিল ওরা। মা আর দিদির নালিশ শুনে বউয়ের গায়ে হাত তোলা, গালাগাল দেওয়া কিছুই বাকি রাখেনি। পুরো মাইনের টাকা শাশুড়ির হাতে তুলে দিয়েও শান্তি নেই। মারের দাগ লুকোতে পুরো হাতা আর পিঠ ঢাকা ব্লাউজ পরেছে তখন রিমা। আদরের মেয়ের এই হেনস্থা ওর বাবাকে বেশিদিন দেখতে হয়নি; হঠাৎ স্ট্রোক হয়ে মারা গেলেন। এক বছরের মেয়েকে কোলে নিয়ে দু'বছরের বিয়ে থেকে মুক্ত হয়েছিল রিমা আইন-আদালত করে। বাবার মৃত্যুই মনে হয় ওর সম্বিৎ ফিরিয়েছিল! সিঁটিয়ে যাওয়া বোধ আর চেতনার জগতে আলোড়ন জেগেছিল। 'মিস ম্যাচ' হতেই পারে সেজন্য সারাটা জীবন মরে মরে বেঁচে থাকে কেউ? শিক্ষার আর অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হওয়ার তবে মূল্য কী?

শোন একটা কথা বলব? অমিতাভদা কিন্তু তোর কষ্টটা বুঝতেন; খুউব ভালবাসতেন তোকে। তাই ওপারে গিয়েও শান্তি পাচ্ছেন না। ফোন করছেন নাকি কে জানে সেজন্যই! মৃত্যুর পর হয়ত মানুষের কণ্ঠস্বর হারিয়ে যায়। আসলে শরীরই তো থাকে না, তাহলে তার বাগযন্ত্রই বা থাকবে কী করে? কবিরা তো দার্শনিকই হন। তোর লেখা পড়েই উনি হয়ত তোকে বুঝেছিলেন রে পর্ণা। এমন ফুটফুটে চেহারা, সে এমন রাগী কবিতা লেখে কেন?

৬

অনেকটা সময় ধরে স্নান সারি। ভারি আরাম হয়। ট্যাক্সের কাগজ-পত্র কাল হবে খন। ছেলেকে ম্যাসেঞ্জারে লিখি আজ 'হামি' দেখলাম, বাইরে খেলাম। ভাল আছি। তুই? খানিকবাদে উত্তর আসে 'ফাইন, আমি আর বাবাও বাইরে খেলাম'। আজও ড্রয়িং কাম ডাইনিংয়ের আলো জ্বালিয়ে রাখি। বোতলে জল ভরতে গিয়েই রিং শুনতে পাই। মোবাইলটা বাজছে! আমার হাতটা কেঁপে ওঠে; অনেকটা জল মেঝেতে পড়ে যায়। সিঁড়ির আলোও জ্বালিয়ে দিই। ক'বার রিং হয়ে থেমে যায়। আজ ফোন ধরব না। চুল আঁচড়ে, মুখে ক্রিম মেখে ফোনটা হাতে নিয়ে অফ করব ভেবেও করতে পারি না। খুলে দেখি কাবেরী দি। বাব্বা! যাক্, নিশ্চিন্তের শ্বাস পড়ে আমার। খুব ভাল গল্প লেখেন। খান চারেক উপন্যাসও আছে ওনার। কল ব্যাক করি, দু'বার রিং হতেই ধরেন, 'কী ব্যাপার ঘুমিয়েছিলে? ঘুম ভাঙালাম?'

—না, না কি যে বলো? রাত দশটা মোটে, এত তাড়াতাড়ি ঘুমোই না গো আমি। ও ঘরে ছিলাম। ধরতে ধরতেই কেটে গেল। কী খবর বল; কী লিখছ, কেমন আছ? এখন কোথায়? আলিপুরদুয়ার না শান্তিনিকেতন। কাবেরী দি বলেন, 'শান্তিনিকেতনে। তুমি আসবে না? একবার এখানে আমার বাড়িতে এসে তোমার থাকার কথা, মনে আছে তো? এবার এলে আমার কাছে থাকবে।'

এমনিতে খুব হাসিখুশি মানুষ কাবেরী দি। আজ কেমন বিষণ্ণ আর গলাটাও ভাঙা ভাঙা লাগল।

—তোমার কি শরীর খারাপ নাকি গো? গলাটা যেন কেমন লাগছে। জ্বর-টর নাকি? একাই আছ ওখানে? আমি তো গরমের ছুটিতেই যাচ্ছি। সামনের সোমবারে যাব, হলদিবাড়ি সুপারে। মনসুন ঢুকেছে, বৃষ্টিও হচ্ছে তো ওখানে।

হ্যাঁ, ও আচ্ছা। আমার এখানেই উঠবে কিন্তু। কোনও কথা শুনব না। এবারে আর মেসে যাবে না। সোজা এখানে তোমার গরীব দিদির বাড়িতে। বেশিরভাগ সময় আমি একাই আসি। মাঝে মধ্যে তোমার দাদাও আসেন সঙ্গে। এবারে আসেননি। বর্দ্ধমানে গেছেন, ছেলের কাছে। খুব যত্ন করে অনেক গাছ লাগিয়েছি এ বাড়িতে জান? জায়গার যা দাম, মাত্র আড়াই কাঠা জায়গা। এ বাড়িটা আমি দাঁড়িয়ে থেকে বানিয়েছি। ছোট্ট কিন্তু খুব সুন্দর। এসে দ্যাখো, থাকো। যদি খুব খারাপ লাগে চলে যেও তোমার মেসে, আমি না করব না।

কাবেরীদির আন্তরিকতায় আমি অবাক হয়ে যাই। কতটুকু আর চেনাজানা।

বইমেলার স্টলে আলাপ, তারপর কয়েকটা সাহিত্যসভায় দেখা হয়েছে মাত্র। নিজে এগিয়ে এসে কথা বলেছেন। কার কাছে শুনে আমিই একবার ঠাট্টা করে বলেছিলাম, শান্তিনিকেতনে গেলে তোমার বাড়িতেই উঠব এখন থেকে। মেসে-টেসে উঠব না আর। সেটা মনে রেখে দিয়েছেন। কত আন্তরিকভাবে নিমন্ত্রণ করছেন! সত্যি দু'-চার লাইন কীইবা লিখেছি, তাতেই কত ভাল মনের মানুষদের সঙ্গ পাই, ভালবাসা পাই। জীবনে পাওয়ার যন্ত্রণা, দীর্ঘশ্বাস কোথায় উড়ে যায়!

—ঠিক আছে কাবেরীদি। যাব তোমার ওখানে। ভাল থেক তুমি। ফোন কেটে দিই কিন্তু ওনার গলায় এত বিষাদ কেন? এত কষ্ট কেন? কত হাসিখুশি মানুষ! হালকা নীল ল্যাম্প জ্বালিয়ে, মশারি টাঙিয়ে অনেকটা জল খেয়ে শুয়ে পড়ি। ঘুমিয়েও পড়ি কখন যেন! হঠাৎ মনে হল কেউ বালিশটা ধরে টানছে। বেশ জোরেই টানছে, আমি আঁকড়ে ধরি বালিশটাকে! খানিক বিরতি দিয়ে আবার মনে হল, বালিশটা আমার মাথার নিচ থেকে নিয়েই ছাড়বে! স্বপ্ন দেখছি না জেগে আছি বুঝতে পারি না। উফ্, হাত বাড়িয়ে বেড সুইচ টিপি। কেউ কোথাও নেই! কী যে সব বিভ্রম! রাত তখন দুটো! সুইচ অফ করে ঘুমিয়ে পড়ি। সেই অস্বস্তির ঘুম! ভোররাতে সেই বিশ্রী স্বপ্নে ঘুম ভাঙে। একটা লাল মাটির এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা দিয়ে ছুটছি, পেছনে কারা যেন তাড়া করেছে। চারদিকে নির্মীয়মান কতগুলো বাড়ি। হোঁচট খেয়ে একটা ড্রেনের মধ্যে পড়লাম— আর সারা গায়ে-মাথায় শাড়িতে কাপড়ে থকথকে লালচে কাদার মাখামাখি হয়ে আছে। একটা ভিড়ের বৃত্ত আঙুল দিয়ে আমাকেই দেখাচ্ছে। কিন্তু এত কান্নাকাটি কাকুতি-মিনতি করছি তবু কেউ সাহায্যের হাত বাড়াচ্ছে না। কাদা থেকে তুলছে না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকি আমি, আর ঘুম ভেঙে যায়। ঘড়িতে ভোর পাঁচটা। একই স্বপ্নের পুনরাবৃত্তি! আজকের স্বপ্নে পথ আর কাদামাটির রং কেমন আগুনে-লাল মনে হল!

ভোর ভোর বিছানা ছাড়ি। কেন দু'দিন ধরে এই একটা স্বপ্নই দেখছি? সব দরজা জানালা খুলে দিই। হঠাৎ মনে হল আমি না কাল সব আলোগুলো জ্বালিয়ে রেখে গিয়েছিলাম। অফ্ করল কে? অদ্ভুত তো! ব্যালকনির বেতের মোড়াটায় ধপ করে বসে পড়ি। রাতে বৃষ্টি হয়ে গেছে; বেশ ভেজা ভেজা হাওয়া, দু'-একটা পাখি ডাকছে। কিন্তু আমার মাথার মধ্যে কেমন সব তালগোল পাকিয়ে যায়! সামনে রায়েদের ভাঙা দালানকোঠায় আলো-ছায়ার খেলা! আমি কি খুব তাড়াতাড়ি সব ভুলে যাচ্ছি?

৭

সকালের চা আর কাগজ একসঙ্গে শেষ করে স্নান সেরে নিই। ট্যাঙ্কের কাগজপত্র গুছিয়ে, পুজোটুজো সেরে নিই। সত্যি ক'দিন ধরে সব এলোমেলো— সন্ধেই দেওয়া হচ্ছে না। ধূপকাঠি ফুরিয়েছে, ঠাকুরঘরে দেশলাইও নেই! হঠাৎ মনে পড়ল, যে ধূপকাঠি আমার বাড়িতে নিষিদ্ধ, তার স্মেল হালকা হলেও পাচ্ছি বিকেলে-সন্ধেয়! হুঁ পাচ্ছি তো! ব্যাপারটায় আর মনযোগ দেওয়া গেল না। স্কুল আছে। ফ্রিজের খাবার বের করে গরম করে নিই। কাল রাতের খাওয়া বাইরে হল, তাই সব জমেই ছিল। শান্তিদির কাছে চাবি থাকে, ও সময় মত এসে নিজের কাজ সারবে। চাবি দিয়ে বেরিয়ে পড়ি। বুবুলের জেরক্সের দোকান, সবে খুলেছে। ও হেসে বলে, 'দাও, ক'পাতা? তোমার বাস ক'টায় যেন?' —এগারো পাতার মতো, দু'কপি করে করিস সব পাতা। আছে এখনও বিশ-পঁচিশ মিনিট। লেখাগুলো কাল পাঠাব একটা পত্রিকার দপ্তরে। আমার স্কুল, বাসে মিনিট চল্লিশের পথ। এ শহর থেকে ক'জন টিচার ওই স্কুলে যাতায়াত করে; ছেলেরা সব বাইকেই যায়। বন্ধ-টন্ধ হলে আমাদের লিফট্ও দেয়। রিমা আমার আগের স্টপেজে ওঠে, ডেইলি প্যাসেঞ্জারদের দু-একটা বাঁকা কথা শুনেও রোজই জায়গা রাখে আমার জন্যে। আজও যথারীতি। ওকে জিজ্ঞেস করি, তুই মিমির ওখানে কবে যেন যাচ্ছিস? ফ্লাইটে তো?

—হুম, বালুরঘাটে দুদিন থাকব। মায়ের শরীরটা ভাল থাকছে না। তারপর কলকাতায় দিদির ওখানে একদিন, পরদিন সকালে দমদম থেকে। পুরো ছুটিটা মেয়েটার সঙ্গে থাকব। ফিরব ট্রেনে। স্কুল খোলার দুদিন আগেই চলে আসব।

—তুই না থাকলে একটু ফাঁকা ফাঁকা লাগে রে।

—খেয়েছে, বলিস না আর, শুনলে লোকে লেস্‌বি বলবে।

—ছাড় তো, ছেলেরা যে জ্ঞান হওয়ার পর থেকে ছেলেদের সঙ্গেই ওঠা-বসা পান-ভোজন ফুর্তি-ফার্তা করে আজীবন। তো ওদেরকে হোমো-টোমো বলি আমরা? আসলে এসব সমাজের তৈরি করে দেওয়া মাউন্ড সেট্। হু হু করে বাস ছোটে। রাতে বৃষ্টি হলেও, এখন চড়চড়ে রোদ আর বাসের মধ্যে ভিড়, ভ্যাপসা গরম!

—কী বলতো, আমরা মানে ধর আমাদের মতো কিছু মেয়েরা ব্যতিক্রম। সংসার নামের প্রতিষ্ঠানে ঠিকঠাক আঁটাতে পারলাম না নিজেদের। মেয়েদের মধ্যে ইমোশানটা বেশি, তাই না? প্রেমে, স্বামীতে, সন্তানে একটা আত্মবিলোপকারী প্রবণতা কাজ করে। ক্ষমা করে দেওয়া। সংসারটা টিকিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা। আমরা তেমনটা নই। তাই সমাজের স্বজনদের বাঁকা কথা আর নিজস্ব গোপন একাকীত্ব— এই আমাদের ভবিতব্য! ভালো, সংসারি, প্রেমিক, অনুভবি ছেলেরা কি আর নেই? আছে তো। দুভার্গ্য আমাদের, তেমন পুরুষ আসেনি জীবনে। নির্বাচনে ভুল ছিল আমার। আসলে পারিবারিক শিক্ষা ভালো না হ'লে ছেলেপুলে ভালো হয় না। স্মার্ট-লুক, বেশ গায়, দু'-চারলাইন কবিতা বলে, আড্ডায় ঝকঝকে বুদ্ধিদীপ্ত কথা, ভালো চাকরি—সবটাই তো বাইরের সজ্জা। বিমলেন্দুর মা। সেই গয়নাগাটি, শপিং, পোশাক-আশাক, পারিবারিক কূট-কচালী, মিথ্যে কথা, লোভ—অশিক্ষিতই তো! ছেলে তো এসব দেখে এমন পরিবেশেই বড় হয়েছে। গোবরে পদ্মফুল ফোটে না রে! উহুঁ ফোটে না। বিমলেন্দুর বাইরের পোশাকি রূপটাই দেখেছিলাম। মুগ্ধ ছিলাম আর সেই দ্রুত হয়ে গেল। শুরু আর শেষ। মেয়েকে ফোন করে ওরা। মিমি তো 'আপনি আপনি' করে কথা বলে ওর বাবার সঙ্গে। আমি একেবারে চুপ করে থাকি। খুব গভীর মনের মেয়ে তো; নিজেই বুঝে নিক। পারিবারিক এসব ঘোলাজলের বিষয়ে মিমির কোনও ইন্টারেস্ট নেই। এই যে যাব ওখানে; গেস্ট হাউসে— দুটো বেড, এক রুমে। ও বইপত্র রাখবে একটা বেডে, শোবে আমার সঙ্গে, সেই ছোটবেলার মতো। গায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে ঘুমোবে।

৮

ঝড়ের বেগেই ক'টা দিন কেটে যায়। সোমবার থেকে গরমের ছুটি শুরু! ওইদিনই শান্তিনিকেতন রওনা হব, বিকেল পাঁচটার মধ্যে পৌঁছে যাব! কাবেরীদির সঙ্গে মাঝে দু'-দিন কথা হ'ল। বললেন স্টেশনে নিতে আসবেন। নইলে সীমান্ত পল্লীতে ওনার বাড়ি আমি নাকি খুঁজেই পাবো না। কিংবা দূরে বলে হয়ত যাবই না। বরাবর যে মেসটায় গিয়ে উঠি হয়ত সেখানেই চলে যাব। সুতরাং উনি বোলপুর স্টেশনে থাকবেনই। আমি বললাম, বেশ এসো, শুধু শুধু কষ্ট হবে তোমার। মৃদু হাসলেন উনি। হাসিতে, কথায় কেমন এক গভীর বিষাদ যেন জড়িয়ে! ছুটির আগেই একটা কাগজে বড় বড় করে 'অমিতাভ চক্রবর্তী' নামটা আর মোবাইল নম্বরটা লিখে রিমাকে দিয়ে দিলাম। ওদের ফ্ল্যাটবাড়ির সেই বিএসএনএল কর্মী দম্পতি শিবব্রতবাবুদেরকে ও দিয়ে যাবে। ছানবিন্ হবে, ছুটির পরে সব জানা যাবে আসলে ব্যাপারটা কী? কোথা থেকে কলগুলো আসছে? সত্যি সত্যি নরজগতের বাইরের অন্য কোনও গ্রহ, নক্ষত্র থেকে? নাকি ইচ্ছে করে কেউ দুষ্টুমি করছে? ভয় পাইয়ে মজা দেখ্‌তে চাইছে? নাম্বার, নাম লিখে দিয়েও সে মুহূর্তেই নাম্বারটা মোবাইল থেকে কেন যেন ডিলিট করতে পারলাম না। মায়া পড়ে গেছে এ নামের ওপর? নাকি ওই নাম্বার থেকে আগত ডাকের ওপর? ঠিক বুঝতে পারি না! ভাবলাম থাক, রাতেই মুছে ফেলব এই নাম্বার আমার বন্ধু লিস্ট থেকে। রহস্যময় ডাক এসে আর আমাকে আতংকিত করতে পারবে না। সত্যি মৃত্যু কী আশ্চর্য এক প্রশ্নচিহ্ন! জীবলোক আর মরলোকের মাঝখানে কী ভয়ংকর কঠিন নির্মম দেওয়াল! যে যতই প্রিয় হোক, আপন হোক একবার দেওয়াল পেরিয়ে গেলে আর তাকে আমরা চাই না। তার ছায়াটুকুও অসহনীয়!

বাসেই রিমা জিজ্ঞেস করে, কী রে নাম্বারটা ডিলিট করেছিস? মিথ্যে কথা বলি, হ্যাঁ! স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ও বলে, যাক্ নিশ্চিন্ত, বাঁচা গেল বাবা। আমি চুপ করেই থাকি। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাই। দিনশেষের গোধূলি বেলার নরম আলোয় কী চমৎকার লাগছে বাইরের পৃথিবী। কী জানি কতদিন আর দেখতে পাব এ জগৎ, এই সংসার! আবার কি জন্ম হবে আমার মানুষ হয়ে? নাকি অন্য প্রাণী, নাকি গাছ-পালা কি হব আবার নতুন করে? আচ্ছা এ জন্মের কোন জিনিসটি বা কাকে আমি চাইব পরজন্মে? হুম শুধু বাবুকেই চাইব, ওর শৈশব থেকে বড় হয়ে ওঠার দিনগুলো, আবার নিজের করে চাইব। মৃত্যুর সীমানা পেরিয়ে গিয়ে আমি কি ছেলেকে ফোন করতে চাইব না? ওর কণ্ঠস্বর শুনতে চাইব না?

তোর স্টপেজ এসেছে তো! নাম, যা গেটের কাছে। চমক্ ভাঙ্গে আমার, গাড়ি কখন শহরে ঢুকল? কখন স্টপেজ এল?

ঘামে গা প্যাচপ্যাচ করছে। স্নান না করলে চলছে না! পাশের বাড়িতে আলো জ্বলছে, তার মানে ওরা এসে গেছে। বাঁচা গেল। স্নান সেরে চা বানিয়ে নিই। টিভিতে খানিক নিউজ শুনি। ভালো খবর কিছু নেই নাকি সারা দেশে? খবর শিকারিরা শুধু অন্ধকারের গল্পই খুঁজে আনে নাকি? ভালো খবর বলতে একটাই। স্কুলের রেজাল্ট গতবারের তুলনায় ভাল মাধ্যমিক আর উচ্চমাধ্যমিকে। এ রাজ্যেই খুব ভাল ফল করেছে উত্তরবাংলা; কাগজে টিভিতে সফল ছেলেমেয়েগুলোর ঝকঝকে চোখ-মুখ দেখে মন ভরে যায়। পরের জন্মেও আমি টিচারই হ'তে চাইব— আর কিচ্ছু না।

অনেকটা রাত হ'ল। অমিতাভদার ফোন নম্বরটা মুছে ফেলার আগে ছবির মতো কয়েকটা দৃশ্য ভেসে উঠল চোখের সামনে। সেও এমনই এক গ্রীষ্ম। সুস্মিতা ফোন করেছিল, পর্ণাদি একটু খোঁজ নাও তো। অমিতাভদার একটা খারাপ খবর শুনলাম!

কী খবর সুস্মিতা? আবার অসুস্থ নাকি? আমাদের শহরে নাকি মালদায়?

এখানেই এখানেই...

তক্ষুণি আর একটা ফোন এলো প্রদীপদার। কবি প্রদীপ বসুর। পর্ণা, অমিতাভ

দা তো চলে গেলেন। কাল রাত থেকেই অবস্থা ক্রিটিকাল ছিল। আজ এই সাড়ে আটটা নাগাদ, বুঝেছ। আমরা সব নার্সিং হোমেই বসে আছি।

সে কি প্রদীপদা, উনি কবে এসেছিলেন এখানে আমি তো জানতাম না।

সপ্তাহ খানেক আগেই এসেছিলেন। হার্টের অবস্থা তো ভাল ছিল না। ডাক্তার মুভ করতেই বারণ করেছিলেন। উনি জেদ্ করেই চলে আসলেন। মালদা থেকে কম দূর তো নয়। আমরা তো উনি এলেই চলে যেতাম ওনার কাছে। গল্প-টল্প হ'ত। তুমি তো বহুদিন আর...

হ্যাঁ প্রদীপদা, খুব খারাপ লাগছে, ভাবতেই পারছি না। বহুদিন ওনার সঙ্গে দেখা করে উঠতে পারিনি। কিন্তু এতটা শরীর খারাপ... চলে গেলেন। নার্সিং হোমে ভর্তি করা হয়েছে জানি না। তাহলে একবার দেখে তো আসতাম।

হ্যাঁ তোমার কথা বারবার বলতেন। তোমার লেখালেখি নিয়েও বলতেন। যাক্ কী আর করা, সবাইকেই চলে যেতে হয়। অভিভাবকের মতো ছিলেন, আমাদের সবারই। এসো, বারোটার দিকে বডি দেবে। আমরা সব সামনেই বসে আছি।

অমিতাভদা বডি হয়ে গেছেন! ইদানিং এলে আর ফোন করতেন না। আমিও নিজে থেকে কথা বলিনি। তাই উনি কখন এখানে কখন মালদায় জানতে পারিনি। আসলে লেখালেখি বিষয়ে ওঁর বলা কথাগুলো মন থেকে মেনে নিতে পারছিলাম না। লেখা আমার প্রফেশন নয় প্যাশন, আমার আশ্রয়। আমার ভালোবাসার জায়গা। বিখ্যাত হওয়ার জন্যে, চমক দেওয়ার জন্যে তো লিখি না। যখন যেমন ভাবে অক্ষরমালা আসবে, তেমন করে তেমনভাবেই লিখব। অজস্র দায় দায়িত্ব নিয়ে চলতে হয় আমাকে। ঘরে-বাইরে অনেক চাপ। বিশ্বাসভঙ্গের যন্ত্রণা থেকে লেখা আমায় মুক্তি দিয়েছে। সেই আমার একান্ত স্বজন, ব্যাস এটুকুই। ওনার মতো সংসারের দায়হীন, রিটায়ার্ড পার্সন তো আমি নই।

উনি আমার লেখালেখির স্বল্পতা নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করতেন। 'লেখা, শৌখিন মজদুরি নয়, মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়। আর স্কুল, খাতা, সংসার, সন্তান এসব বাহানা— এরমধ্যেই নিয়মিত প্রচুর লিখতে হয়। বিষয়বস্তু। আঙ্গিক সব নিয়ে গভীর ভাবনা থাকা চাই। ভালো লিখতে গেলে পড়তেও হবে প্রচুর। প্রচলিত, ক্লিশে হয়ে যাওয়া শব্দ ব্যবহার করলেও চলবে না।'

উনি আমার লেখালেখির স্বল্পতা নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করতেন। 'লেখা, শৌখিন মজদুরি নয়, মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়। আর স্কুল, খাতা, সংসার, সন্তান এসব বাহানা— এরমধ্যেই নিয়মিত প্রচুর লিখতে হয়। বিষয়বস্তু। আঙ্গিক সব নিয়ে গভীর ভাবনা থাকা চাই। ভালো লিখতে গেলে পড়তেও হবে প্রচুর। প্রচলিত, ক্লিশে হয়ে যাওয়া শব্দ ব্যবহার করলেও চলবে না।' ওনার সমালোচনায় মনে মনে গুটিয়ে যেতাম!

ওনার সমালোচনায় মনে মনে গুটিয়ে যেতাম! কথাগুলো সত্যি, কিন্তু আমি আমার কলম কাগজের মধ্যে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতেই ভালোবাসি যে! পাঠকপ্রিয় হওয়ার দায় তো নিইনি! আমার স্বাধীন লেখকসত্ত্বা ক্ষুণ্ন হ'ত ওনার কথায়। সংসার, সন্তান, কর্মক্ষেত্র সব ভুলে সারাদিন শব্দ, বাক্য, ছন্দ, অলংকার, ব্যাকরণ পাঠে মগ্ন হয়ে থাকবার অবকাশ বা ইচ্ছে কোনওটাই আমার ছিল না! তাই ধীরে ধীরে এড়িয়ে গেছি; নিজেকে সরিয়ে নিয়েছি। কিন্তু ওনার পাণ্ডিত্যকে শ্রদ্ধা করেছি। ওনার প্রবল স্নেহটুকু উপলব্ধি করেছি। ভাগ্যবান মনে করেছি নিজেকে ওনার মনযোগ পেয়ে। তাহলে আমার লেখালেখি একেবারে ফেলনা নয়! ওনার চিঠিগুলো পেয়ে একটু একটু আত্মবিশ্বাস জন্মেছে। কিন্তু আজ হঠাৎ ওনার মহাপ্রস্থানের সংবাদটা আমাকে আপাদমস্তক নাড়িয়ে দিল! বড় কষ্ট হ'ল, ইস্ একবার শেষ দেখাটুকু হ'ল না! পরপর সদ্যপ্রকাশিত দুটো কবিতার বই ওনাকে পড়তে দেওয়া হ'ল না! রিমাকে ফোন করে জানিয়ে দিই খবরটা; বলি, আজ আর স্কুলে যাব না রে, 'আরোগ্য' নার্সিংহোমে যাচ্ছি। খুব খারাপ লাগছে আমার।

ওহ্ তাই, আচ্ছা তুই যা, স্কুলে ফোন করে জানিয়ে দিচ্ছি। আমি একটু ফুল কিনে নিয়ে আসছি; ঠিক আছে। স্কুলে যাচ্ছি না।

হ্যাঁ রিমা এমনই। পরমাত্মীয়র মতোই, কে জানে গতজন্মে আমার মা ছিল নাকি! বেরোনোর সময় সুতপনকে বলে গেলাম, দার্শনিক ভঙ্গি করে বলল, "ওহ্! কী আর করবে! সবাইকেই একদিন চলে যেতে হয়! অনেকদিন দেখিনি তো! আমি তো ভাবছিলাম ... যাক্ গে। ঠিক আছে।"

নার্সিংহোমের সামনের চায়ের দোকানের আশপাশে প্রায় সব কবি লেখকরাই দেখলাম উপস্থিত। মৃদুস্বরে ওনাকে নিয়েই আলোচনা। চুপ করে বসে থাকি। এমন দারুণ গ্রীষ্মদিনে উনি চলে গেলেন! আর দেখা হবে না! কথা হবে না!

বেলা বাড়ল, কাচ ঢাকা গাড়ি এল। ওনাকে নামিয়ে এনে শোয়ানো হ'ল। টানটান শুয়ে আছেন। শীতকালে যে ঘিয়ে রঙের শালটা গায়ে দিতেন; দেখলাম ওনার মেয়ে সে শালটা দিয়েই ঢেকে দিতে বলল। তার ওপর অজস্র ফুল। ভারি কাচের চশমাটা বন্ধ চোখের ওপর। রিমার আনা রজনীগন্ধা আর সাদা গোলাপ রাখলাম ওনার পায়ে কাছে। প্রণাম করলাম চাদরে ঢাকা পা ছুঁয়ে। মনে মনে উচ্চারণ করলাম, ক্ষমা করবেন অমিদাভ দা। আমি তত উৎকৃষ্ট লেখক নই। মাপ করবেন আমায়। যদি কোনও আচরণে কষ্ট দিয়ে থাকি মাপ করে দিন। ওনার পাতলা ঠোঁটে কেমন অনাবিল হাসি ফুটে আছে! আরও সবাই ফুল দিয়ে প্রণাম করছে। লোকাল চ্যানেলের ক্যামেরা, সংবাদমাধ্যমের লোকজনের ভিড়। খানিক পরে ধীরে ধীরে সে গাড়ি ওনার মেয়ের কোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হ'ল। আমরাও হাঁটতে লাগলাম সে গাড়ির পেছনে। দোলনচাঁপা মৃদু সুরে গাইতে শুরু করল "আগুনের পরশমনি ছোঁয়াও প্রাণে..." আমরা গলা মেলালাম। কোয়ার্টার সংলগ্ন ছোট্ট ঘাসজমির ওপর ওনাকে নামিয়ে শোয়ানো হ'ল। সবুজ ঘাসের বিছানায় সাদা চাদরে ঢাকা ওই ঘুমিয়ে থাকা অমিতাভদা, অবিশ্বাস্য লাগছিল! কেমন মনে হ'ল, এখুনি উঠে বসে বুঝি বলবেন— বেঁচে থাকার মধ্যেই আনন্দ, মানুষের মধ্যেই আনন্দ, সুন্দর করে বেঁচে থাকার মন্ত্র নিজেকে আয়ত্ত করতে হয়।

বৌদি মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে কাঁদছিলেন। শাড়ির আঁচল দিয়ে বারবার অমিতাভদার মুখ মুছিয়ে দিচ্ছেন, স্বামীর কাঁচা-পাকা চুলে ঢাকা মাথাটায় বারবার খুব যত্ন করে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। আত্মীয়-স্বজনরাও কাঁদছেন। আমরা বেরিয়ে আসি রাস্তায়। কেউ কোনও কথা বলি না। সবাই যে যার মতো চলে যায়, কেউ অফিসে, কেউ বাড়িতে। স্টেশন রোডের দিকে আমি আর রিমা হেঁটে যাই।

এ সময় ফোনটা আসে। ব্যাগ থেকে বের করে মোবাইলটা চোখের সামনে ধরতেই হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ তরঙ্গ এসে ধাক্কা মারে আমার মস্তিষ্কে! ক্ষণিকের জন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো স্তব্ধ হয়ে যায়! নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না তো! ফোনটার দিকে চেয়ে দুটো পা-ই অচল হয়ে যায়। হঠাৎ ব্রেক কষা গাড়ির মতো দাঁড়িয়ে পড়ি রাস্তার মাঝে! নম্বর শুধু নয়, নামটাও তো জ্বল জ্বল করছে স্ক্রিনে; কিন্তু কীভাবে তা সম্ভব? হ্যালো শব্দটি উচ্চারণ করতে পারি না। পাশ থেকে ঝুঁকে পড়ে রিমা জিজ্ঞেস করে, কে রে? কার ফোন? কী হ'ল তোর? শরীর খারাপ লাগছে? কি হয়েছে বল্ না। আমার রক্তমূল্য ফ্যাকাশে মুখের দিকে ক'সেকেন্ড দেখেই হাত ধরে টেনে রাস্তার ধারে নিয়ে যায়। এতক্ষণে খানিক হুঁশ ফেরে আমার। তখনও রিং হচ্ছে, ফোনটা ওর চোখের সামনে তুলে ধরি। রিমার মুখটাও মুহূর্তে ফ্যাকাশে হয়ে যায়। ও স্ক্রিনে ফুটে ওঠা নামটা দেখতে পেয়েছে! একটা থমকে গিয়েই বলে, আশ্চর্য! আচ্ছা ধর না, রিসিভ কর কলটা। কথা বল্, হ্যালো তো বল্। কাঁপা হাতে সবুজ বাটনে চাপ দিয়ে কানে চেপে ধরি নীলচে রঙের যন্ত্রটা। ওপাশে কেমন একটা গুঞ্জন ধ্বনি! কোনও ব্যক্তিবিশেষ নয়; বিরাট এক হল ঘরে যেন বহুমানুষ কথা বলছে একসঙ্গে! তারই সমবেত বিচিত্রধ্বনি উঠে আসছে কোনও এক গভীর গহন দূরান্ত থেকে আর বিচিত্র সেই প্রতিধ্বনিত কলরব, তরঙ্গমালার মতো অশ্রুতপূর্ব শব্দজাল সৃষ্টি করে ছুটে এসে বিছিয়ে যাচ্ছে আমার সমগ্র চেতনা ও মস্তিষ্কের পরতে পরতে। রিমা ইশারায় ফোনটা চায়। আমি ফোনটা ওর কানে চেপে ধরি। খানিক পরে ও বলে, স্ট্রেঞ্জ, এটা কী হ'ল? কেটে দে।

৯

সেই প্রথম এসেছিল ফোনটা। অমিতাভদার নাম্বার থেকেই। প্রাণহীন যে শরীর তখনও ওনার মেয়ের কোয়ার্টার সংলগ্ন জমিতে শোয়ানো। শ্মশানযাত্রা শুরু হয়নি কয়েক মিনিট আগেই তাকে দেখে এসেছি, সেই অমিতাভদার নাম্বার থেকেই সেদিন প্রথম এই রহস্যময় ফোনটা এসেছিল! তারপর আরও দুইবার। এ কী রহস্য... !

ওনার চলে যাবার দিন বাড়ি ফিরে স্নান-টান সব সেরে ওনার লেখা কবিতা, গল্প, উপন্যাসগুলো বের করেছিলাম আর ওনার চিঠিগুলোও। আবার পড়লাম—এক এক করে। ওনার প্রথম চিঠি, আমার কবিতার বই পেয়ে, প্রথম পরিচয় আর তিস্তার ধারে হাঁটতে যাওয়ার সময়টা নিয়ে।

সুপর্ণা,

আমার মনে হয় বইয়ের সঙ্গে একটা চিঠিও দেওয়া উচিত। না হলে সম্পূর্ণ ব্যাপারটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সুস্মিতার বাড়িতে তোমার কবিতা শুনে মনে হয়েছিল তোমার সঙ্গে আমার কথা হতে পারে। কিন্তু এক সন্ধেতেই তা যে নিটোল হয়ে উঠবে তা

তো ভাবিনি। মনে হল তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় অনেকদিনের। শুধু নামটা ভুলে গিয়েছিলাম। আমরা কি কবিতার ফর্ম নিয়ে বা তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছিলাম? তবে এতটা সময় কেটে গেল কী করে?

জীবনের অন্যপ্রান্তে এসে পৌঁছে গেছি তাই অনেক কথা বলার আছে। তুমি নবীনতমা না হয়েও নবীনতর, তোমার উপলব্ধি এবং অভিজ্ঞতা আরও গভীর। শব্দ নিয়ে খেলা তোমার স্বভাব নয়, চমকে দেবার ইচ্ছেও তোমার নেই, কিন্তু নিজের মত করে বলার মত কথা জমা আছে। তুমি একটি পরিশীলিত মনের অধিকারি, রুচির ছাপ তোমার আচরণে এবং উচ্চারণে। মনে হল এমন ঘটনা কদাচিৎ ঘটে। সুপর্ণার সঙ্গে আগে আমার দেখা হল না কেন? হলে ভাল হত কি মন্দ হত?

তোমার শহরের একজন শিল্পী, ছড়াকার, গায়কের সঙ্গে আলাপচারিতায় বলেছিলাম। আমি পথ পেলে হাঁটি, লোক পেলে আড্ডা দিই, মন চাইলে চিঠি লিখি। এ আমার আকৈশোর আযৌবনের অভ্যাস। হাঁটি বলেই সমস্ত উত্তরবঙ্গ বারবার ঘুরতে পেরেছি। আড্ডা দিই বলেই অসংখ্য সাহিত্য সভা থেকে কবি লেখক সম্পাদকের বাড়ি পর্যন্ত হাজির হতে পারি।

সেই সঙ্গেই স্বভাব অনুযায়ী (ইদানিং কালের) আত্মকাহিনী বলতে শুরু করেছিলাম কিন্তু কিছুক্ষণ পরে বুঝতে পেরেছিলাম জীবনের আসল যুদ্ধ কাকে বলে আমি জানি না, আমি যেন এক সৌখিন সাঁতারু। রুক্ষ পথে রক্তাক্ত পায়ে হাঁটার কোন অভিজ্ঞতাই নেই। আমার অনুরোধে তোমার কয়েকটা কবিতার খোসা ছাড়িয়ে বীজের যে স্বরূপ তুমি অনায়াসে উচ্চারণ করলে—এ রকম গরল পানের সত্য ঘটনা আমার জানা নেই। অবাক হয়ে শোনা আর তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করার ছিল না আমার।

ইচ্ছে হ'ল আর একটু দেখি, তাই পথ হাঁটার প্রস্তাব। হেঁটে হেঁটে তিস্তা পর্যন্ত যাওয়া যাক। যেতে যেতে কথা। এই যে প্রথমদিনের তিনঘণ্টার সাহিত্য সভার পরের দিন ঘণ্টা দেড়েকের কথা তারপরেও দেখা গেল আমাদের কথা শেষ হয়নি, সে শুধু সাহিত্যের নয়, অংশদারিত্বের।

তোমার শহরের আশ্চর্য অভিজ্ঞতা আমার ভাণ্ডারে জমা হয়ে গেল। এরকম প্রাপ্তি জীবনে সহজে ঘটে না।

শুভকামনা সহ
অমিতাভ দা

আবার এর দিন পনের পরেই আর একটি অসামান্য চিঠি। হলদে খামে। তক্ষুনি খুলে দেখার সময় হয়নি। টেবিলের বই আর খাতার নিচে চাপা পড়েছিল। ক'দিন পরে কী একটা খুঁজতে গিয়ে হাতে পেলাম। সেই সব দিনের আমার উদভ্রান্ত মন, বিপন্ন বেঁচে থাকার মধ্যে হঠাৎ করে বৃষ্টির শীতল আমেজ নিয়ে আসত ওনার লেখা চিঠিগুলো। সুতপন, যে শুধু বিশ্বাসের মাটি কেড়ে নিয়ে যে বালুময় ধূসর মাঠের ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল আমাকে, শূন্যতার বোধ ছাড়া আর কোনও অস্তিবাচক ইচ্ছে বোধহয় মনের কোনও কোণেই জমা ছিল না— কিন্তু এসব চিঠিতে যেন একটু একটু করে ফিরে পাচ্ছিলাম আত্মবিশ্বাস! তাহলে আমি লিখতে পারি? লিখতে পারব?

সুপর্ণা,
হঠাৎই বিদ্যুতের মতো ঝলক দিয়ে একটি কবিতা বেরিয়ে আসতে পারে; কিংবা অপেক্ষা করতে হয় আকাশে মেঘ সঞ্চারের, মেঘের পরে মেঘ জমে ওঠে, তারপর বারিধারা।

আমাকে দু'দিন অপেক্ষা করতে হল এই সময়ের জন্য। দূরভাষে একটি কণ্ঠ ভেসে এসে মিলিয়ে গেল ঠিক কবিতার মতো। জীবনের কারুকার্যময় বিভিন্ন অলক্ষে ঘুরে-বেড়িয়ে তবু ভরিল না চিত্ত— বারবার মনে হতে থাকে আরও অনেক দূরে যেতে হবে। সামনে অনেক পথ বাকি! সময় শরীরকে জীর্ণ করতে পারে কিন্তু আমার মন থাকবে চির নবীন, চির গ্রহিষ্ণু।

মানুষ তো দিতে ভালবাসে, কিন্তু নিতে পারে ক'জন? চিঠি তো দর্পণই, আত্মোপলব্ধির দর্পণ, নিজেকে বারবার নতুন করে চিনে নেবার ইচ্ছাময় বাসনা। আমার জীবনে অনেক মানুষের পদচারণ, মানুষের সংসর্গের জন্য চিরতৃষিত আমি। তুচ্ছাতিতুচ্ছ জীবনে আনন্দের সন্ধান পাওয়াটাই আসল কথা। তুমি তো কম করে আমার দুই দশক পাঁচ বছরের ছোট, কিন্তু মনে হচ্ছে সমান সমান। ভাব বিনিময়ের জন্যে দুজনেই প্রস্তুত! জীবনের পথে চলতে চলতেই কুড়িয়ে নিতে হবে শস্যকণা, তাতেই প্রাণধারণ। খুঁজতে খুঁজতে আমি পেয়ে গেলাম তেমনই একটি মুখ; তেমনই এক মানবী নেহাতই চেনা ছকে তার কাছে এসে পড়া, মনে হল এমন কিছু পেলাম যা আগে পাইনি!

আমি জানি মানুষের ভালো লাগার ক্ষমতা জীবনে এক আশীর্বাদ। না হলে যে নৈরাশ্যে, অবদমনে, নিরাশ্রয়ে ভেসে যেতে হয়! ভালো লাগাটাই খুঁটি, তাকে ধরে বেঁচে থাকার ইচ্ছা সঞ্জীবিত হয় আশ্চর্য কোমলতায়। একজন কবিকে আমি কী-ই বা বলতে পারি— কবিতার সত্য অনুভবের কথা লিখবে— নিজের ভাষায় লিখবে!

সুপর্ণার কবিতা হবে স্বতন্ত্র, মহিমান্বিত। শুধু অপরের জন্য নয়, নিজের জন্যেও লিখতে হয়। আনন্দ তো ভেতর থেকে জেগে ওঠে, এমন কি গরল পান করেও অমৃতরসে পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। বাইরের উপাদানকে শোধন করে নিতে হয়, তারপর তার প্রকাশ।

সৃষ্টির আনন্দের মধ্যে আছে বন্ধনমুক্তির আনন্দ। কবির কাছে এটাই সারকথা। কর্মক্ষুব্ধ জীবনের বিপন্নতার মধ্যে যদি পাওয়া যায় কয়েক মুহূর্তের নিভৃত আরাম। কবিতা এসে হাত ধরতে পারে। কবির মুক্তি এইখানেই। ভালো থেকো

শুভকামনা সহ
অমিতাভ দা

চিঠিটা পড়ে সেদিন অস্ফুটে উচ্চারণ করেছিলাম, সত্যি সাহিত্য সেবা আপনাদের সৌখিন মজদুরিই বটে। গরল পান করে তাকে অমৃতে পরিণত করার কৌশল, আকাঙ্খা, সাধনা কিন্তু আমার নেই। আমি চাই না এসব কিছুই। গরল সে গরলই, বিশ্বাসের সবুজ পাহাড়ে আগুন ধরিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নামতে থাকে— আপদমস্তক খাক্ হয়ে পুড়ে যায় সব! মনে মনে বিরক্ত হয়েও। কবিতার বই সঙ্গে ছোট্ট চিঠি পাঠিয়েছিলাম ওনার ঠিকানায়। মাঝে একবার এসে ঘুরে গেছেন আমাদের শহর থেকে। আমাদের বাড়িতেও এসেছিলেন তখন। আড্ডাও হয়েছিল। ওনার চিঠি এল, লিখেছেন—

সুপর্ণা,
আগে তোমার চিঠির উত্তর দিই। তারপর কবিতার কথা। চিঠির উত্তর এই জন্যে যে আমরাও কিছু বলার আছে। মন সুন্দর না হলে এমন স্বচ্ছ চিঠি লেখা যায় না। একেবারে ভারহীন। একবার পড়েই মনে হচ্ছে যথেষ্ট, এ'তো খুবই কেতাবী চিঠি। পরিচয়ে উষ্ণতা কোথায়?

সে কি দেখাবার জিনিস। আমি সংকীর্ণ বলেই বেশি দাবী করি। চিঠি যদি হয় সে তো হবে কমপক্ষে চার পৃষ্ঠার। দশ পৃষ্ঠার হলেও ক্ষতি কি? ভাবি, আমার এত উৎসাহ কোথা থেকে আসে? এই পড়ন্ত বিকেলেও। মনে হয় শেষ নয়, আবার শুরু করছি। বারবার শুরু করি। আমার পিজি-তে ক্লাস থাকে, সেমিনারে ভাষণ দিতে হয়, দূরে যেতে হয়, লিখতে হয়, সংসার করতে হয়, ছোট-বড় নানা ধাক্কা সামলাতে হয়— তবুও মনে হয় আর একটু হেঁটে আসি! হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ আমাকে গৃহবন্দী করে রেখেছেন। 'আপার মাইট্রাল ভাল্‌ভ ফুল্‌লি ড্যামেজড্। যখন তখন প্রচণ্ড প্যালপিটিশান হতে পারে, শ্বাসকষ্ট শুরু হতে পারে বিনা নোটিশেই। দূরে যাবেন না। বাসে চড়বেন না। সিঁড়ি ভাঙ্গবেন না, দু'কেজির বেশি ওজন নেবেন না। একা ঘরে থাকবেন না। বাইরে গেলে সঙ্গে যেন লোক থাকে।' জীবন ঘিরে এত বাধা নিষেধ। আমি মানতে রাজি নই। আমার দোতলায় ওঠার সিঁড়িতে তেইশটি ধাপ। সেখানে আমার পড়ার টেবিল, নিজস্ব লাইব্রেরি। ওঠা নামা করি দিনে অন্তত বিশবার। শরীর যতদিন আছে, মৃত্যুভয়ও ততদিন থাকবে। নিজেকে প্রশ্ন করি, আমি কি পৃথিবীতে অনেকদিন বেঁচে নেই? কেন বারবার প্রিয় মানুষের কাছে যেতে ইচ্ছে করে? কেন প্রিয় মানুষদের খুঁজে বেড়াই?

এক একবার এক একজন মানুষের দেখা পাই, মনে হয় এর জন্যেই এতদিন বসেছিলাম! এই মূল্যবান মুহূর্তগুলির জন্যে। এই নতুনের আনন্দ যে পায়নি, তাকে তা বোঝানো যাবে না! সে তো টাকা পয়সা, ঘর-বাড়ি, প্রভাব-প্রতিপত্তি, মান-সম্মান নিয়ে অতিমাত্রায় ব্যতিব্যস্ত। তাকে ডেকে লাভ কী? সে তো প্রশ্ন করবে— এতে তোমার কী লাভ? এতে তুমি কী পাও?

তুমি যে তোমার কবিতার বইয়ের প্রথম পাতায় লিখেছ— 'আমার শ্রদ্ধেয় মানুষ অমিতাভ দাকে' —আমার গর্ব হ'ল। —হ্যাঁ মানুষ। নারী পুরুষ আলাদা নয়। মানুষের সান্নিধ্য চাই— প্রিয় মানুষ। সম্পর্ক স্থাপনের এই অতিবর্ষণের সিক্ততা কী স্বাভাবিক? আমার কি আর একটু বাস্তববাদী হওয়া উচিত নয়? আমি কি প্রসারিত হতে পারি না?

অবশ্যই, অবশ্যই! ভুল করার অধিকার তো আমার আছেই। শুধু নিয়মে বাঁধা জীবনে তো আমি জড়বস্তুই হতাম! হব কেন?

আজ সকালে যখন ঘুম ভেঙে উঠি, কিছুই দেখা যায় না। গাঢ় কুয়াশায় চরাচর লুপ্ত হয়ে গেছে। ছাদে উঠে গেলাম। দেখি চেনা পৃথিবীর অচেনা রূপ। সাজগোজ করে তৈরি। গৃহিনী বললেন, 'এত তাড়াতাড়ি? বাজারে?' বললাম, 'আজকের সকালটি দ্যাখো! আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সে তো কবিতা বোঝে না, আমাকে বোঝে। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় বুঝেছে, আমাকে রোখা যায় না; ছেড়ে দিলেই ফিরে আসবে!'

যেতে পারতাম যে কোনও দিকেই। বাজারে, বন্ধুর বাড়ি। আর কোথাও। চললাম মহানন্দার দিকে। দুধ-চা বারণ, কিন্তু এই সকাল তো নিয়ম ভাঙ্গার জন্যই!

আমার প্রেসক্রিপসন অনুযায়ী চার পৃষ্ঠা তো হয়ে গেল! এবার আমাকে থামতে হয়। তাকাতে হয় সুপর্ণা দত্তের প্রকাশিত দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'জীবনের চৌকাঠে'র দিকে। আমি যে কথাবদ্ধ ।

অমিতাভ দা।

ওনার এ চিঠিও খুব অবাক করেছিল আমায়। ওনার মানসিক অস্থিরতার স্বরূপ চিঠির ছত্রে ছত্রে, ভাবতাম প্রতিভাবান সৃষ্টিশীল মানুষেরা হয়ত এমনই হয়! এরপর আমার 'জীবনের চৌকাঠে' কবিতার বইটির কী অসাধারণ আলোচনা লিখে পাঠিয়েছিলেন। প্রতিটি কবিতা নিয়ে স্পষ্ট ভাষায় পুঙ্খানুপুঙ্খ মতামত দিয়েছেন। লিখেছেন— 'কোনও আলোচনা বা সমালোচনা নয়, বলা যেতে পারে পাঠের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া। কবিতার সিঁড়ি ভেঙ্গে ভেঙ্গে পৌঁছে যেতে চাই কবির কাছে। সে তো সহজ নয়। কবি যেতে দেবে কেন অনায়াসে? সাজিয়ে রাখে নানা প্রহেলিকা। কথা দিয়ে কথা ঢাকা কথা ভেঙ্গে ভেঙ্গে খুঁজি— কী আছে লুকনো? কী তার অভিলাষ, কী তার আক্রমণ, কী তার জীবন বীক্ষণ? তোমার কাব্যগ্রন্থটি এই সময়ের প্রচলিত ধারায় হাঁটেনি— তাই পাঠের প্রস্তুতি চাই... এই সময়ে যা দুর্লভ। এবার তাহলে শুরু করি?' এক, দুই, তিন, চার এমন সংখ্যা নির্দেশ করে প্রায় গোটা দশেক কবিতার আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ। ওনার মতো বিদগ্ধ মানুষের সে ব্যাখ্যা আমার বলছে মহামূল্যবান রত্নের মতো মনে হ'ল। যেন এক জহুরি তার অভিজ্ঞ চোখে হীরে আর কাচের ভিন্নতা আবিষ্কারে রত। লিখেছেন— 'তোমার কবিতা স্বভাব স্বতন্ত্র। মূলতঃ মৃত্তিকা আশ্রয়ী, জীবন সম্পৃক্ত, অভিজ্ঞতার রৌদ্রস্থানে সহনশীল, প্রাজ্ঞ, দৃঢ়, নির্মোহ। চিত্রকল্প, শব্দচয়ন সর্বত্র পরিমিতি বোধের প্রমাণ। মননে সজাগ। কবি তার চিন্তায় দর্শনে, প্রকাশভঙ্গীতে স্বতন্ত্র। জীবনের অন্তঃস্থল থেকে রক্তমাখা মণিমুক্তো আহরণ যেন তার অন্তরাত্মার নির্দেশ। নিজস্ব বাক্ প্রতিমা নির্মাণে ক্ষমতার প্রমাণ মেলে'। আবার লিখেছেন— 'জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া সুপর্ণার কবিতাগুচ্ছে প্রহার বড় বেশি। জমাট বাঁধা রক্তের মতো ভীতিপ্রদ হয়ে ওঠে কোনও কোনও মুহূর্ত। স্বপ্ন দেখার অবকাশ কম। হঠাৎ প্রকট হয়ে ওঠে নিঃশব্দ ঘাতকের অশালীন পদসঞ্চারে।'

অমিতাভদার এমন ধারা আলোচনায় নিজের লেখাকে পাঠকের চোখ দিয়ে নতুন করে আবিষ্কার করছিলাম। বিস্মিত হচ্ছিলাম ভেবে। শরীরে এত রোগ, এতরকম ব্যস্ততা, নিজের লেখালেখি। কখন তিনি আমার মতো সামান্য এক কলমচির লেখা এত মনযোগে পাঠ করলেন, ভাবলেন আর এত বড় বড় চিঠি লিখলেন? যত দিন গেছে ওনার সমালোচনার ভাষা কঠোর হয়েছে। আলসেমির কারণেই নাকি আমার লেখা কম! অনেক বেশি পঠনে আমার মন দেওয়া উচিত— এমন সব অনুযোগ, অভিযোগে ব্যতিব্যস্ত আমি নিজেকে ধীরে ধীরে সরিয়ে নিয়েছি। শরীরও ওনার খুব একটা ভাল থাকত না। নানা কারণে কেমন অস্পষ্ট দূরত্ব তৈরি হ'ল। বিশেষ করে একটা চিঠির ভাষায় খানিক আহতই হয়েছি। ওনার বিভিন্ন বয়সী বন্ধুদের প্রসঙ্গে সে চিঠি। বয়সে অনেক ছোট, হাসপাতালের এক ডাক্তারবাবুর সঙ্গে ওনার বন্ধুত্ব হয়, আড্ডাও চলত দেদার। তো সে ডাক্তার প্রসঙ্গে শেষে লিখেছেন '...ডাঃ রায় এখন পয়সা কামাবার যন্ত্র'। সিনিয়র এক কবি বন্ধু প্রসঙ্গে লিখেছেন '...কেদার দা পরপারে আমি মাঝখানে পুরনো সেতু হয়ে দোল খাচ্ছি...'। এ চিঠিতেই লিখেছেন, 'গত বছর তিস্তা পাড়ে এক জুনিয়র ফ্রেন্ড যোগাড় করেছি। খুব হিসেবি, কিন্তু দারুণ আন্তরিক। কবিতা লেখে এবং কবিতা সম্পর্কে আলোচনা পছন্দ করে; তবে প্রশ্ন উঠবে, কে তিনি? তা'হলে বোঝাতে তো আমার সময় লাগবে। তাও সবাই বুঝবে কি না, সন্দেহ।'

এ চিঠিরই শেষ অংশে লিখেছেন, '...কোনও কোনও ভাল লাগা বন্টন করা যায় না, যদিও বন্টনেই অধিক সুখ, কিন্তু অপাত্রে কিছু দান করতে নেই।'

এই অপাত্রটি কে? তাকে তিনি কি দান করে আপশোষ করছেন? সেই অপাত্র তার কোনও দান চেয়েছিল কি? এসব নিয়ে একটা চিঠির খসড়া করেছিলাম মনে মনে। ঘরে-বাইরের শত ব্যস্ততায় সে চিঠি না লিখেছি, না পাঠিয়েছি। তবে ভেবে রেখেছিলাম, দেখা হলে তো অবশ্যই জানতে চাইব— কোন অপাত্রকে কী তিনি দান করেছেন? আদৌ সে অপাত্র তাঁর কাছে প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছিল কিনা?

নাহ্ সেসব সুযোগ আর হয়নি। সত্যি বলতে লেখার জন্য একটু সময় বের করার জন্যে, বালক পুত্রের জন্যে যে উদ্বেগ যে ব্যাকুলতা ছিল জীবনের সে পর্বে, সারা বিশ্বের আর কারও জন্যে, আর কিছুর জন্যেই তেমন ছিল না। হয়ত মেয়ে মানুষের মন বলেই— এলোমেলো সংসারটাকেই গুছিয়ে রাখতে ইচ্ছে করত। কোন্ সে প্রাজ্ঞ অধ্যাপক কবি— দূরত্বের পরিখার ওপারে থাকলেই সুন্দর। এমন সৌন্দর্যই ভালো লেগেছে আমার, ওনার প্রত্যাশা যদি বেশি কিছু থেকেও থাকে, আমার সেখানে কিছুই করার ছিল না, নিজস্ব গন্ডির মধ্যে স্বস্তি খুঁজেছি, ওই নিঃস্ব সময়েও।

১০

স্বস্তি পাই ভেবে, কাল সুতপন এসে পড়বে। মানুষের দরকার মানুষকেই! সোমবার আমি রওনা হয়ে যাব শান্তিনিকেতনে। রিমা চলে যাবে বাপের বাড়ি বালুরঘাট হয়ে কলকাতা হয়ে ব্যাঙ্গালোর। মাঝে প্রায় মাসখানেক আমাদের দেখা হবে না। আচ্ছা, আর যদি কোনদিনও দেখা না হয়, আর যদি আমার ফেরাই না হয় এ শহরে, এ বাড়িতে, আমার স্কুলে— ছাত্রছাত্রীদের কাছে? হঠাৎ করে ফুরিয়ে যাওয়া একটা শাখানদীর মতো যদি ফুরিয়ে যাই? ধুর যত্তসব বেকার, ফালতু চিন্তা! শান্তিনিকেতন থেকে একদিনের জন্যে হলেও কলকাতায় যাব, ছেলের সঙ্গে দেখা করে আসব। একা একা বড্ড ভয় করে কলকাতায়। হারিয়ে যাওয়ার ভয়। চিরটাকাল এই মফস্বলী শহরে জন্মে, বসবাস করে একটু ঢিলেঢালা স্বভাবই তো আমার। কলকাতা শহরের ভিড় আর তার শত শত রাস্তা ও গলি আমার কাছে প্রহেলিকাই। বন্ধু তিতাসকে ফোন করি। বলি, তোর বাড়ি তো শেয়ালদার কাছেই, আমাকে দু'দিন থাকতে দিবি?

কেন, তোর বরের ফ্ল্যাট আছে না গড়িয়ার দিকে। সেখানে কি হ'ল?

বুঝলাম খুব একটা ইচ্ছে নেই, ওর ওখানে উঠি, চায় না। ছবি আঁকে, ফিল্ম বানায়। মুডি মহিলা! মনটা ভাল তিতাসের। মরিয়া হয়ে আমি বলি, 'বরের ফ্ল্যাট তো সে গড়িয়ায় অনেক দূরে। আমি পথ-ঘাট চিনি না রে। একা চিনে-টিনে যেতে পারবো না। ট্যাক্সিওয়ালাদেরও ভয় করে আমার।

হ্যাঁ, যত ভয় তোর। ঠিক আছে চলে আয়। কখন কবে আসবি জানাস। নতুন লেখা আনিস। শুনব। রাখছি রে নেকুমামণি।

থ্যাঙ্কয়ু ম্যাডাম, বিয়ে তো করলে না। বাচ্চার টান তো বুঝলে না। নেকুমামণি পুষুমণি যা খুশি বল গে। আমি তো যাচ্ছি।

ও বাবু সেন্টু। আচ্ছা কবি সুপর্ণাদেবী আপনি আগমন করুন। যথাসময়ে আমাকে আগমনের সময় নির্ঘন্ট জানাইয়া বাধিত করিবেন। ধন্যবাদ।

স্বস্তির নিশ্বাস পড়ে আমার। সমস্যার সমাধান হয়ে গেল অনায়াসে।

আজও বেশ গরম। আজও আলো জ্বালিয়ে রাখি সব ঘরে। স্নান সেরে, বিছানা পরিপাটি গুছিয়ে, জলের বোতল মাথার কাছে রেখেছি। মোবাইলটা নিয়ে খানিক নাড়াচাড়া করি। অমিতাভদার নামের কাছে পৌঁছে যাই স্ক্রল করে করে। খানিকক্ষণ তাকিয়েই থাকি নামটার দিকে। ডিলিট বাটনে আঙুল ছোঁয়াই... সরিয়ে নিই... থাক, কাল সকালেই মুছে দেব। ধীরে ধীরে স্মৃতি থেকে হারিয়ে যাবে এই নাম এই সংখ্যাগুলো! আজ রাতটুকু থাক সে এই ছোট্ট যন্ত্রটির মেমোরিতে! কাল সব মুছে দেব, মুক্তি পাব অপার্থিব আহ্বানের আতংক থেকে। ভারি নিশ্চিত মনে একটা জনপ্রিয় দৈনিকের রোববারের গল্পটি পড়ি। ঘুম আসে।

হঠাৎ মনে হ'ল ঘরে কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেমন দমবন্ধ করা সে ধূপের গন্ধ। কেউ যেন জড়িয়ে ধরেছে। হাত আর পা তুলে দিয়েছে গায়ের ওপর। ঘুমের ঘোরেই ঝট্‌কা মেরে সরিয়ে দিই সে আলিঙ্গন। ঘুম ভেঙ্গে যায়। লাইট জ্বালিয়ে ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি— রাত দু'টো। এখন হাল্কা গন্ধ পাচ্ছি সে ধূপের। কোথা থেকে আসে এ গন্ধ! অমিতাভদার মৃত্যুর দিন থেকে এ গন্ধ আমি সহ্য করতে পারি না। এই ব্রান্ডের ধূপকাঠিও কিনি না। এ গন্ধের সঙ্গে মৃত্যুর অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আছে; মনে মনে বিশ্বাস করি। সেই কাচঢাকা গাড়িটায় এ গন্ধ লেগে ছিল।

হঠাৎ মনে হ'ল ঘরে কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেমন দমবন্ধ করা সে ধূপের গন্ধ। কেউ যেন জড়িয়ে ধরেছে। হাত আর পা তুলে দিয়েছে গায়ের ওপর। ঘুমের ঘোরেই ঝট্‌কা মেরে সরিয়ে দিই সে আলিঙ্গন। ঘুম ভেঙ্গে যায়। লাইট জ্বালিয়ে ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি— রাত দু'টো। এখন হাল্কা গন্ধ পাচ্ছি সে ধূপের। কোথা থেকে আসে এ গন্ধ! অমিতাভদার মৃত্যুর দিন থেকে এ গন্ধ আমি সহ্য করতে পারি না। এই ব্রান্ডের ধূপকাঠিও কিনি না। এ গন্ধের সঙ্গে মৃত্যুর অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আছে; মনে মনে বিশ্বাস করি। সেই কাচঢাকা গাড়িটায় এ গন্ধ লেগে ছিল।

কিন্তু ক'দিন ধরেই যখন তখন কখনও গাঢ় কখনও হাল্কা ভেসে আসছে সেই গন্ধ আর কেমন ইঙ্গিতবাহী হয়ে উঠ্‌ছে! কেন? হাত মুখে জল দিই, অনেকটা জল

খাই, ফুলস্পিডে ফ্যান চালিয়ে আবার শুয়ে পড়ি। স্বপ্নের ঘোরেই মনে হয় কে যেন সারা ছাদ হেঁটে বেড়াচ্ছে। খুব ভারি কোনও লোহার ট্রাঙ্ক বা তেমন কিছু টেনে টেনে ছাদের একধার থেকে অন্যধারে হেঁটে যাচ্ছে। ঘুমের টানে আমি চোখ খুলতে পারি না, উঠতেও পারি না। চারদিকে পোড়া পোড়া গন্ধ, আমি ছুটে পালাতে চাইছি একটা বাড়ি থেকে। আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলছে বাড়িটা। কেমন ফাঁকা মাঠের মধ্যে বাড়িটা পুড়ে কালো হয়ে যাচ্ছে। গলগল করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। দূরে দূরে ইতঃস্তত অল্প কিছু নির্মীয়মান বাড়ি! ছুটতে ছুটতে একটা জলকাদা ভর্তি ড্রেনের মধ্যে পড়ে গেলাম। চারদিকের মাটি কেমন লাল; ড্রেনের কাদামাটিও লাল। আমি ড্রেনটা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছি একটা ভিড়ের বৃত্ত আমার চারধারে। কেউ হাত বাড়াচ্ছে না। আমার কান্না শুনতে পাচ্ছে না। আঙুল দিয়ে সবাই আমাকে নিয়ে কিছু বলছে, নির্দেশ করছে। উফ্ ধড়মড়িয়ে উঠি। পরপর ক'দিন ধরে এই একই স্বপ্ন! কেন! প্রাণের আনন্দ শুষে নিচ্ছে প্রতিদিন একটু একটু করে এই বীভৎস স্বপ্নটা!

১১

ঠিক ন'টায় ছাড়ল হলদিবাড়ি সুপার। শান্তিদিকে সব বুঝিয়ে দিলাম। সুতপন ব্যাগ হাতে একই টোটোতে স্টেশনে এল। বললাম, কলকাতায় হয়ত এক-দুদিনের জন্য যাব। বাবুকে অনেকদিন দেখি না। দেখা করে আসব।

ও বলল, তো চাবিটা নিতে পারতে। সবই আছে, চাল-টালও কিনে রেখে এসেছি। ফ্ল্যাটটা বেকার কেনা হ'ল। এতদূর। টিউশন, ক্লাস অসুবিধে— পিজিতেই সুবিধে বলে ছেলেও ফ্ল্যাটে থাকছে না— ডাবল খরচা।

আমি বলি, দূর তো বটেই। রাস্তাঘাটও চিনি না।

হুম সে তো বটেই— বন্ধু-বান্ধবী, নন্দন, হৈ হৈ হুই হুই সেসব তো হবে না দূরে থাকলে। বন্ধুর ফ্লাটেই ভাল সবদিক থেকে। হে হে হে। আর শান্তিনিকেতনে গেলেই যদি রবীন্দ্রনাথ হওয়া যেত...

উফ্, অদ্ভুত একটা মানুষ! উত্তর দিইনি, ওর কথার। যে যেমন ভাবে জীবনকে দেখে দেখুক।

ট্রেন বেশ লেট করে। কাবেরীদি দু'বার ফোন করেন। বলি, লেট যাচ্ছে গো। উনি বলেন, ঠিক আছে, আমি স্টেশনে থাকব। চিন্তা কোরো না।

সুটকেস আর ব্যাগটা নিয়ে বাইরে আসতেই দেখি একদম সামনে কাবেরীদি। চোখে গগল্‌স, হাত ঢাকা কামিজ, গলায় জড়ানো ওড়না। বলেন 'এসো'। একটা টোটোয় চড়ে বসি আমরা। হঠাৎ কেমন সেই ধূপের গন্ধ পাই। মনে হয় কাবেরীদির গায়ের থেকেই আসছে। আমার কেমন অস্বস্তি হয়। অন্যবার দেখা হলে যতটা কলকল করে গল্প শুরু করেন, আজ তেমনটা নয়! ওনার বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য কেন এবারে এত আগ্রহ, সে কথাও মনের কোণে উঁকি মারে। শেষ পর্যন্ত বলেই বসি, কিগো, এই গরমে তুমি এত ফুলহাতা জামাকাপড় ওড়না-টোড়না পরে আছ, গরম লাগে না তোমার? কালো কাচে ঢাকা চোখ তার আমি দেখতে পাই না। আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে একটু হাসলেন।

খুব লিখছ নাকি? কোনও দুঃখের ট্র্যাজিক উপন্যাস? তোমার সে খুশি খুশি ভাব নেই। গলার আওয়াজে এত বিষাদ। কী ব্যাপার বল।

অদ্ভুত একটা কণ্ঠস্বরে উনি বললেন, হুম ঠিকই ধরেছ— একটা ট্র্যাজিক উপন্যাসই লিখছি। খুব দুঃখের সারাজীবন আমি আনন্দই চেয়েছি। এখানে বসে লিখব বলে, একটু একটু করে টাকা পয়সা জমিয়ে জায়গা কিনেছি। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বাড়ি করেছি। তোমাদের দাদাও দিয়েছেন টাকা-পয়সা; যখন যেটুকু পেরেছেন। কিন্তু কী জান তো। সবকিছুই তো তোমার ইচ্ছে মতো হবে না। কখন কী হয়, কীভাবে হয়— তা আমরা আঁচও করতে পারি না। তবে আমার বাড়িটা তোমার পছন্দ হবেই। অল্প জায়গা হলে কী হবে— অনেক গাছ লাগিয়েছি। ডাব হয়, আম হয়। বাড়িঘর এখনও বেশি নেই। চারদিকে জমি বিক্রি হয়ে গেছে। বাড়ি তৈরি করেনি এখনও; অল্প কয়েকটাই।

হু হু করে টো টো দৌড়চ্ছে! কতদূর?

বাব্বা কতদূর তোমার সীমান্ত পল্লী, স্টেশন থেকে। এ দেখছি যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। বোলপুরের বাইরে নাকি?

হুম একটু দূর তো বটেই।

অন্ধকার হয়ে যাবে নাকি যেতে যেতে?

সারারাত ধরেই হয়ত যেতে হবে, তারপর গন্তব্য।

বাবা, দারুণ বললে তো। থ্রিলার লিখছ?

সত্যি অন্ধকার নেমে এসেছে, পাকা রাস্তা থেকে নেমে কেমন মেঠো গলি দিয়ে সমান বেগে টোটোটা দৌড়ায়। ঝোপজঙ্গল আর জোনাকির উড়ে বেড়ানো দেখি। হঠাৎ দুটো-একটা বাড়ি। অনেকটা যাওয়ার পর আবছা অন্ধকারে জায়গাটা কেমন চেনা চেনা লাগে আমার। কারেন্ট নেই নাকি? আমার মনের কথা বুঝি পড়ে ফেলেন কাবেরীদি— বলেন, হ্যাঁ ট্রান্সফর্মার পুড়ে গেছে, গত ক'দিন ধরে কারেন্টের খুব অসুবিধে।

একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায় টোটো। আশেপাশে ঘরবাড়ি নেই। ব্যাগ-ট্যাগ নামাতেই দ্রুত বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় গাড়িটা।

ধূপের গন্ধ নাকি একটা পোড়া গন্ধ এসে ধাক্কা মারে আমার মস্তিষ্কে। একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি ছড়িয়ে যায় সারা শরীরে, মনে।

নীচতলায় ভাড়াটে, আমি ওপরে থাকি। অনায়াসে আমার ব্যাগটা নিয়ে সরু সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠেন কাবেরীদি। আমি তাকে অনুসরণ করি।

মোম আর টেবিল ল্যাম্পের আলোয় সবই রহস্যময়।

তুমি হাত মুখ ধুয়ে এসো, চেঞ্জ করে নাও। আমি চা করে আনি। উনি সানগ্লাসটা চোখ থেকে খোলেন না। চা, চিড়েভাজা, মিষ্টি দিয়ে টেবিল সাজিয়ে দেন। খেতে খেতেই বলি, চোখে কি অসুবিধে কিছু হচ্ছে? খুলবে না সানগ্লাসটা?

হ্যাঁ রে, খুব অসুবিধে। আলোই সহ্য হচ্ছে না একেবারে। ডাক্তার দেখাচ্ছি। ড্রপ দিচ্ছি চোখে। মেয়ের কাছে মুম্বই যাওয়ার কথা পরের মাসে। তখন চোখ দেখিয়ে নেব।

হ্যাঁ, চোখ ছাড়া লেখকের আর আছে কী?'

রাতেও অনেক রকম পদের রান্না। কখন যে এত রাঁধলেন! কত গরম পড়েছে আজকে, তার মধ্যেও এত রেঁধেছেন।

আমি অত খাইয়ে নই কাবেরীদি।

না বাপু তোমায় খেতেই হবে। রাঁধতে আমি খুব ভালোবাসি।

আরও নানা গল্প হয়। লেখালেখি নিয়ে কথা হয়। ছেলেমেয়েদের নিয়েও অনেক গল্প হয়। ওনার স্বামী সফল ব্যবসায়ী এবং খুব ভালো মনের মানুষ শুনেছিলাম। নিজেরা পছন্দ করে বিয়ে করেছিলেন; সে গল্প, নানা জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিলেন সেসব গল্পে গল্পে রাত গড়ায়।

আমি খাটে শুয়ে উনি খানিক দূরের সোফায় বসে গল্প করেন। সারাদিনের ক্লান্তিতে আমার দুচোখ ঘুমে জড়িয়ে আসে। আবছা চোখে দেখতে পাই কাবেরীদি সানগ্লাসটা খুলে রাখলেন। আমার দিকেই তাকিয়ে আছেন। কিন্তু সেখানে গভীর দু'-টুকরো অন্ধকার। আমারও দুচোখ বুঁজে আসে। হঠাৎ একটা শব্দে জেগে উঠে দেখি অন্ধকার সারা ঘরে কারা সব ঘুরে বেড়ায়। নিষিদ্ধ সেই ধূপের গন্ধে আমার দম আটকে আসে। ভয়ংকর তপ্ত হয়ে ওঠে ঘর। জল একটু জল, চিৎকার করি পিপাসায়। গরম বাতাসের হল্কা সারা ঘরে দাপিয়ে বেড়ায়। প্রাণভয়ে সিঁড়ি দিয়ে ছুটতে ছুটতে নামি— আমার পেছনে পেছন কারা যেন দুদ্দাড়িয়ে ছুটে আসে। অন্ধকার ঝোপ জঙ্গলের পথে বারবার হোঁচট খাই। উফ্ মেইন রোডটা কতদূরে? স্টেশনটা? হুড়মুড়িয়ে রাস্তার ধারে একটা ছোট্ট ডোবার মধ্যে গড়িয়ে পড়ি। সারা শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা। মাথায় অসম্ভব যন্ত্রণা— আর কী ভারি হয়ে আছে। চোখ দিয়ে জল গড়ায়। এখন কী সম্বল?

হঠাৎ দেখি সাদা পায়জামা পাঞ্জাবী, কাঁধে ঝোলা, মোটা কাচের চশমা, হ্যাঁ অমিতাভ দা, পাশে কাবেরীদিও। দুজনেই হাত বাড়িয়ে দেন, 'উঠে এসো পর্ণা! এসো!'

উঠে দাঁড়াই। ওমা, তেমন ব্যথা নেই কোথাও। শরীর একেবারে হাল্কা। মনটাও বেশ ফুরফুরে। তিনজনেই একসঙ্গে হেসে উঠি।

কী মনে করে পেছন ফিরে একবার তাকালাম। দেখি সকালের আলোয় সব স্পষ্ট। চারদিকের দু-চারটি বাড়ির লোকেরা, নির্মীয়মান বাড়িগুলোর মজুরেরা ছোট্ট ডোবাটা ঘিরে দাঁড়িয়ে আঙুল দিয়ে কি দেখাচ্ছে! এগিয়ে দেখি আমার সাদা নাইটিটা লালচে মাটি-কাদায় মাখামাখি। পড়ে আছি আমি এখনও? আমি? ওই ডোবায়? লোকেরা বলাবলি করছে, 'দ্যাখো গত সপ্তাহে— গোটা বাড়ি, শর্ট সার্কিট হয়ে আগুন লেগে পুড়ে গেল। এতগুলো লোক মারা গেল। কিন্তু ইনি কে? এখানে এলেন কীভাবে?'

অমিতাভদা বলে ওঠেন, 'এসো পর্ণা, চলে এসো। অনেকটা পথ যেতে হবে।'

আমি ওদের অনুসরণ করি নীরবে।

অলংকরণ দেবাশিস সাহা

ডুয়ার্সের ইকো রিসর্টে এই প্রথম অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস

DHUPJHORA SOUTH PARK

Murti, Gorumara NP
Jalpaiguri, West Bengal

Accommodation: Super Delux Room (DBR) 4 nos, Delux Ethnic Rooms (DBR) 4 nos, Standard Family Rooms (4-6 BR) 5 nos.

Facilities: Tea Maker, Cold/Hot running water, attached toilet in every room;
Common Dine-in place for breakfast-lunch- evening snacks-dinner, Conference Hall;
Cycling, Angling, Adventure sports like Burma Bridge, Cylinder Walk, Bosun Chair, Commando Walk and Zip Line.

Marketing & Booking Contact:
Kolkata 9903832123, 9830410808
Siliguri 9434442866, 9002772928

মোহিনী মূর্তির পাড়ে আয়েশের সঙ্গে মেশে রোমাঞ্চ

একলব্য

উৎপীড়িত এক বীর প্রতিনায়ক

মহাকাব্যে কখনও কখনও এমন কোনও চরিত্রের উপস্থিতি থাকে যা অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় চরিত্রের উজ্জ্বলতাও ম্লান করে দেয়। মহাভারতের একলব্য এমনই একটি চরিত্র যা চাঁদের কলঙ্কের মতই কোথাও যেন কিছুটা ম্লান করে দেন তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের বীরত্বের মহাকাব্যিক বিশালতাকে। আর ভাস্বর হয়ে ওঠেন বীরত্ব ও নির্লিপ্ত ত্যাগসর্বস্বতার অনন্য উদাহরণে। আজ আমরা আলোচনা করব মহাভারতের সেই অনার্য প্রতিনায়কের ত্যাগ, গুরুভক্তি ও বীরত্বের বিশালতা নিয়ে।

মহাভারতে একলব্যের প্রথম দেখা মেলে দ্রোণাচার্য্যের শিক্ষার আসরে। তিনি তখন কুরু-পাণ্ডবদের অস্ত্রগুরু নির্বাচিত হয়েছেন। নানা দেশের রাজপুত্ররা এসেছেন তাঁর কাছে অস্ত্রশিক্ষা নিতে। অস্ত্রশিক্ষা লাভের আশায় নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্যও এলেন দ্রোণের কাছে।

কিন্তু একলব্য অনার্য, নিষাদগোষ্ঠীর ছেলে। সে কিভাবে আর্য রাজকুমারদের সঙ্গে অস্ত্রশিক্ষা লাভ করতে পারে? দ্রোণাচার্য একলব্য কে শিষ্যত্বে গ্রহণ করলেন না।

একলব্যও দ্বিতীয়বার অনুরোধ করলেন না দ্রোণকে। দ্রোণকে প্রণতি জানিয়ে তিনি ফিরে গেলেন নিজস্ব অরণ্যভূমিতে। দ্রোণ একলব্য কে শিষ্যত্বে গ্রহণ না করলেও একলব্য কিন্তু দ্রোণকে আপন অন্তরে স্থাপন করলেন নিজ গুরুরূপে; নির্মাণ করলেন তাঁর এক মৃন্ময় মূর্তি। আর সেই মৃন্ময় মূর্তিকে সামনে রেখে একাগ্র চিত্তে শুরু করলেন ধনুর্বিদ্যা চর্চার নিরন্তর সাধনা।

এরপর বেশ কিছুদিন অতিক্রান্ত হয়েছে। একদিন কুরুপাণ্ডব রাজকুমাররা মৃগয়ায় বেরিয়ে উপস্থিত হয়েছেন অরণ্যভূমিতে। সঙ্গে ছিল পশু-অন্বেষণকারী একটি কুকুর। ইতস্তত ঘুরতে ঘুরতে সেই কুকুরটি সহসা একলব্যের কাছে এসে উপস্থিত হল। অনার্য কৃষ্ণাঙ্গ, জটাধারী, মলিনদেহ একলব্যকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল কুকুরটি। আর শব্দ শোনামাত্রই নির্জনে নিজ ধনুর্বিদ্যা সাধনার বিঘ্ন ঘটায় একলব্য পরপর সাতটা শর নিক্ষেপ করলেন কুকুরটির মুখ লক্ষ্য করে।

সারা মুখ অস্ত্র নিয়ে কুকুরটি ফিরে এল পাণ্ডবদের সমীপে। সে তখন বাকশক্তি রহিত। বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে পড়লেন পঞ্চপাণ্ডব। বুঝতে পারলেন, ধনুর্বিদ্যায় চরম উৎকর্ষতা ভিন্ন এমন অসাধ্যসাধন সম্ভব নয়। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন শঙ্কিত হয়ে উঠলেন অসূয়ায়।

কৌতুহল লাঘব করবার উদ্দেশ্যে পাণ্ডবরা উপস্থিত হলেন সেই নির্জন স্থানে যেখানে নিরবচ্ছিন্ন অস্ত্রাভ্যাস করে চলেছেন একলব্য। একলব্যকে জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর পরিচয়। স্বল্প সময়ের জন্য অস্ত্রাভ্যাস বন্ধ রেখে একলব্য বললেন, নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র, দ্রোণশিষ্য আমি একলব্য। ধনুর্বিদ্যার রহস্য জানতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছি আমি।

পাণ্ডবরা একলব্যের পরিচয় জেনে অবাক হলেন। সে দ্রোণের শিষ্য অথচ পাণ্ডবরা তাঁকে চেনেন না। দ্রোণাচার্য্যের কাছে ফিরে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করলেন তাঁরা। সবাই চলে যাবার পর একাকী দ্রোণকে অনুযোগ করলেন অর্জুন। বললেন, আপনি কথা দিয়েছিলেন আমায়, আমার থেকে অধিক ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা অন্য কোনো শিষ্যকে আপনি দেবেন না। অথচ গুরুদেব আজ স্বচক্ষে দেখে এলাম আপনার শিষ্য নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য আমার থেকে তো অবশ্যই, পৃথিবীর অন্য অনেক শ্রেষ্ঠ অস্ত্রবিদের থেকেও অনেক বড়।

দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন দ্রোণাচার্য্য। তিনি বুঝতে পারলেন না যে নৈষাদী একলব্যকে তিনি শিষ্যত্বে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন, সেই একলব্য কিভাবে তাঁর শিষ্য হল আর কিভাবেই এমন অতুলনীয় ধনুর্বিদ্যার কৌশল আয়ত্ত করল?

দ্রোণাচার্য্য উপস্থিত হলেন একলব্যের কাছে। আপ্লুত হয়ে পড়লেন একলব্য। যে দ্রোণ তাঁকে একদিন অস্বীকৃত হয়েছিলেন শিষ্যরূপে গ্রহণ করতে, সেই দ্রোণ আজ এসেছেন তাঁর সমীপে। দ্রোণ তাঁকে শিষ্যত্বে গ্রহণ না করলেও, একলব্য তো দ্রোণকেই তাঁর গুরুরূপে পূজা করেন। চরণ স্পর্শ করে প্রণিপাত জানালেন দ্রোণকে। উপযুক্ত শিষ্যের মত আত্মনিবেদন করলেন গুরুর প্রতি। কিন্তু দ্রোণাচার্য্য মন স্থির করে এসেছিলেন। দ্রোণ একলব্যকে বললেন, তুমি যদি আমার শিষ্যই হও, তবে তো গুরুদক্ষিণা দিতে হবে। আমাদের মনে এখানে প্রশ্ন জাগে, যে অনার্য হীনবর্ণ একলব্যকে তিনি শিষ্যত্বে গ্রহণই করেন নি তাঁর কাছ থেকে কিভাবে গুরুদক্ষিণা নির্লজ্জের মত প্রার্থনা করেন দ্রোণ? একলব্য কিন্তু মুহূর্ত চিন্তা না করে উত্তর দিলেন, বলুন আচার্য, আপনি কি চান? নিজ মুখে বলুন। আপনাকে অদেয় আমার কিছুই নেই। দ্রোণ এই সময়েরই অপেক্ষা করছিলেন। কালবিলম্ব না করে নির্মম কঠিন উচ্চারণে বললেন, তোমার ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আমায় দিতে হবে। সেটাই হবে তোমার গুরুদক্ষিণা।

আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে এ কেমন আচার্য্যের আচরণ? যিনি দক্ষিণাস্বরূপ প্রার্থণা করছেন এমন এক বস্তু, যা সমাপ্ত করে দেবে শিষ্যের ভবিষ্যতের সমস্ত সম্ভাবনা। এ যে পরম নৃশংস ও অধার্মিক আচরণ। একলব্য কিন্তু কোনও প্রশ্ন করলেন না। যে একলব্যকে অনার্য অক্ষত্রিয় হবার কারনে দ্রোণ শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন নি, সেই একলব্য নিজের প্রতিজ্ঞায় সম্পূর্ণ স্থিত হয়ে, আর্য ক্ষত্রিয়োচিত উদারতায় দ্রোণের প্রার্থণা শোনামাত্রই নিজের দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কর্তন করে দ্রোণের কাছে দিলেন। অর্জুনের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর হবার পথ নিষ্কণ্টক হল। পরম প্রীত হলেন অর্জুন।

একলব্যের অস্ত্রচালনার প্রধান সহায় তাঁর দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ছিন্ন হল। চরম অসহায়ভাবে তিনি তাকিয়েছিলেন তাঁর অবশিষ্ট চারটি আঙ্গুলের দিকে। প্রয়াস করছিলেন অবশিষ্ট চার আঙ্গুলেই ধনুকে বাণ যোজনা করার। কিন্তু তিনি দেখলেন চার আঙ্গুলে শরসন্ধান করলে বাণের গতি আর দূরত্ব অতিক্রম করবার ক্ষমতা দুইই পূর্বের থেকে অনেক কম। তথাপি একলব্য নিজ অভীষ্ঠ সাধনে নিরন্তর অস্ত্রসাধনা করে চললেন। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠতা না থাকায় একটা প্রতিবন্ধকতা তাঁর সৃষ্টি হল ঠিকই, কিন্তু অঙ্গবৈকল্য থাকা সত্ত্বেও বহু মানুষ যেমন নিজস্ব কর্ম সম্পাদনের জন্য নিজের মত করে উপায় নিরূপণ করেন, একলব্যও ঠিক একইভাবে চরম অধ্যাবসায়ে তাঁর অবশিষ্ট চার অঙ্গুলিতেই কুশলী

শরনিক্ষেপের উপায় বের করে নিলেন। এই প্রয়াসে তিনি হয়ত অর্জুনকে অতিক্রম করতে পারলেন না, তথাপি তৎকালীন আর্যাবর্তে একজন চরম কুশলী ধনুর্ধারীরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। কিন্তু দ্রোণাচার্য্য ও পাণ্ডবদের একলব্য ক্ষমা করতে পারেন নি। পাণ্ডবপ্রিয় কৃষ্ণকেও তিনি শত্রুপক্ষ হিসেবেই মনে করতেন।

এই সময় কৃষ্ণ আর্যাবর্তে নিজের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারে যথেষ্ট প্রয়াসী ছিলেন। মগধরাজ জরাসন্ধের জামাতা কংসকে কৃষ্ণ হত্যা করার পর জরাসন্ধ ও তাঁর মিত্রগোষ্ঠী চরম কৃষ্ণবিরোধী হয়ে উঠলেন। এই মিত্রগোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন চেদিরাজ শিশুপাল, সৌভপতি শাল্ব, পুণ্ড্রবর্ধনের অধিপতি পৌণ্ড্রক বাসুদেব, প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজা নরকাসুর, আর অবশ্যই মহাবীর একলব্য।

মগধরাজ জরাসন্ধকেও কৌশলে ভীমসেনের মাধ্যমে হত্যা করান কৃষ্ণ। চেদিরাজ শিশুপালকেও শ্রীকৃষ্ণ হত্যা করেন যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞস্থলেই। মহাভারতের সভাপর্বে সৌভপতি শাল্বের সঙ্গে কৃষ্ণের যুদ্ধে প্রাণ হারান শাল্ব। মিত্রগোষ্ঠীর হত্যার প্রতিশোধ নিতে এক রাতের অন্ধকারে দ্বারকা আক্রমণ করলেন পৌণ্ড্রক বাসুদেব। আর তাঁর সহযোদ্ধা হলেন নিষাদ একলব্য।

কালরাত্রির নিকষ অন্ধকারে বৃষ্ণি যাদবদের বিপক্ষে কালান্তক যমের মত পরাক্রম দেখানো শুরু করলেন মহাবীর একলব্য। ভয়ংকর এক ধনুক হাতে নিয়ে শরবর্ষণে বিপর্যস্ত করে দিলেন যাদব সেনাদের। যাদব-বৃষ্ণিদের মধ্যে এমন কোনও মহারথী সেদিন ছিলেন না, যিনি একলব্যের শরাঘাতে আহত হন নি। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠহীন হওয়া সত্ত্বেও একলব্য চরম অধ্যাবসায়ে হয়ে উঠেছিলেন প্রবল পরাক্রমশালী যোদ্ধা। তাঁর বাণনিক্ষেপণের তীব্রতা এতটাই ক্ষিপ্র যে, এক-একজনের ওপর তিনি ক্রমান্বয়ে পঁচিশ ত্রিশ টা করে শরবর্ষণ করে চলেছিলেন। একলব্যের পরাক্রমে ছন্নছাড়া হয়ে যাদববাহিনী।

পরিস্থিতি প্রতিকুল দেখে স্বয়ং হলধর বলরাম এলেন একলব্যের সঙ্গে সম্মুখসমরে। একলব্যর শরবর্ষণে বলরামও বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেন। সুদৃঢ় গুণ

কালরাত্রির নিকষ অন্ধকারে বৃষ্ণি যাদবদের বিপক্ষে কালান্তক যমের মত পরাক্রম দেখানো শুরু করলেন মহাবীর একলব্য। ভয়ংকর এক ধনুক হাতে নিয়ে শরবর্ষণে বিপর্যস্ত করে দিলেন যাদব সেনাদের। যাদব-বৃষ্ণিদের মধ্যে এমন কোনও মহারথী সেদিন ছিলেন না, যিনি একলব্যের শরাঘাতে আহত হন নি। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠহীন হওয়া সত্ত্বেও একলব্য চরম অধ্যাবসায়ে হয়ে উঠেছিলেন প্রবল পরাক্রমশালী যোদ্ধা।

সমন্বিত সাড়ে চারহাত লম্বা বিশাল এক ভারী ধনুক নিয়ে যুদ্ধ করছিলেন একলব্য। বলরাম বুঝতে পারছিলেন ধনুর্বিদ্যায় একলব্য একটাই কুশলী যে , তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে পেরে ওঠা মুশকিল। তাই কৌশলে বলরাম একলব্যের ধনুকটাই কেটে ফেললেন।

শুরু হল গদাযুদ্ধ, যেখানে বলরাম অত্যন্ত নিপুন। নিষাদরাজ একলব্য গদাযুদ্ধেও যথেষ্ট পারদর্শী। তুমুল যুদ্ধ হল দুজনের মধ্যে। কিন্তু শেষপর্যন্ত গদাযুদ্ধে বলরামের কাছে পর্যুদস্ত হলেন একলব্য। ততক্ষণে পৌণ্ড্রকও মারা গেছেন কৃষ্ণের হাতে। পলায়ন ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না একলব্যের। বলরামও ধাওয়া করলেন তাঁকে।

পালিয়ে যেতে যেতে দ্বারকার সমুদ্রপ্রান্তে এসে উপস্থিত হলেন একলব্য। পেছনে আসছেন বলরাম। নিরুপায় একলব্য ঝাঁপ দিলেন সমুদ্রে। ডুব সাঁতারে পাঁচ যোজন পথ অতিক্রম করলেন একলব্য এবং শেষ পর্যন্ত একটি দ্বীপে এসে পৌঁছান এবং সেই দ্বীপেই শেষ পর্যন্ত বসবাস শুরু করেন একলব্য।

একলব্যের অনুপস্থিতিতে নিষাদরাজ্যের রাজা হন তাঁর জেষ্ঠ্যপুত্র। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বরক্ষক ছিলেন অর্জুন। সেই নিষাদরাজ্যে যখন প্রবেশ করেন অর্জুন, একলব্য পুত্রের সঙ্গে যুদ্ধ হয় তাঁর। যদিও পরাজিত হন একলব্যের পুত্র এবং আবারও বিজয়ী হন অর্জুন। রাজকর দিতে বাধ্য হন একলব্যপুত্র।

অর্জুনের মত ক্ষমতাশালী, উচ্চশ্রেণীর অভিজাতরা এভাবেই জিতে যান চিরকাল। আর সেই জিতে যাবার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই থাকে সমাজের কোনো নিম্নবর্গের মানুষকে কৌশলে স্তব্ধ করে দেবার সফল অভিসন্ধি। সেই নিম্নবর্গের অসহায় শোষিত মানুষটি হয়ত নিজ প্রয়াসে , আপন শিক্ষায় হয়ে উঠতে যাচ্ছিলেন সমাজের সবচেয়ে বড় মানুষ। এ দমন প্রক্রিয়া যে সার্বকালিক সামাজিক সত্য। যা অনস্বীকার্য। মহাভারতের যুগে যেমন একলব্য ছিলেন, আজকের ভারতীয় সমাজেও আছেন রোহিত ভেমুলার মত ব্যক্তিত্ব। যাঁরা কোনও দিন বিজয়ীর শিরোপা পাবেন না, তাঁদের ললাটে শুধু লেখা থাকবে প্রবঞ্চণা, শোষণ আর সমাজের উচ্চশ্রেণীর নিপীড়নের কথা।

শুভ্রজিৎ রায়

ছন্দবীথি স্মৃতি

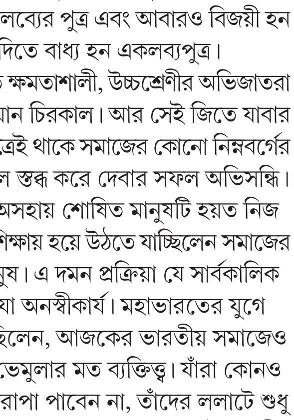

ছন্দবীথি কুন্ডা। একাধারে উকিল, কবি ও সাহিত্যিক।

বৈবাহিক সূত্রে রায়গঞ্জ থেকে জলপাইগুড়ি আসেন স্বামীর হাত ধরে, এরপর স্বামীর চাকুরিসূত্রে অসমের গৌহাটিতে থাকতে শুরু করেন। স্বামী মিহির কুন্ডা পান্ডু কলেজে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপনা করতেন, অকস্মাৎ এক দুর্গাপুজোর সপ্তমীর দিন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে চলে গেলেন। দু-দুটি শিশু সন্তানকে নিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েন ছন্দবীথি। কিন্তু সময়ের কাছে মাথা নোয়ান নি, ওকালতি পড়া শুরু করলেন। সন্তানদের সমাজে মাথা তুলে দাঁড়াবার সুপরামর্শ দিয়ে 'ভাল মানুষ' তৈরি করার জন্য লড়াই করেছেন। কিন্তু ঠিক তাঁর মনের মত করে যে সন্তানদের মানুষ করা হয়নি সে আক্ষেপ শুনেছি তাঁর মুখে শুনেছি অনেকবার। পরবর্তীতে নাতনিদের মধ্যে সে সাধ পূরণ করার সুপ্ত বাসনা ছিল তাঁর। সেপ্টেম্বর ২০১৭-তে ছোটছেলে সুনন্দ কুন্ডা দীর্ঘদিন রোগভোগের পর ইহলোকের মায়া ত্যাগ করলেন। সন্তানের মৃত্যু অসহ্য যন্ত্রণা বুকে নিয়ে তিনি উঠে এলেন একটি ছোট ফ্ল্যাটে। লেখালেখির পাশাপাশি 'নিজলয়' হোমে একটি কাজে যোগদান করলেন।

তিরানব্বই সালে ছন্দবীথি বৌদির সঙ্গে আমার পরিচয়, আমার সহকর্মী দেবার্চ্চনা সরকারের সূত্র ধরে, সাহিত্যের পথ ধরে চলতে গিয়ে বৌদিকে দেখে অনেক কিছু শেখবার আছে তা বুঝেছিলাম। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, পার্বণী সাহিত্য ও সংস্কৃতি পত্রিকার সঙ্গে ওঁর পাশে ছিলাম। এ সময়টায় বৌদি খুব তাড়াতাড়ি অধৈর্য হয়ে পড়তেন অনুভব করতাম। তবে সাজগোজ করতে বড় ভালবাসতেন, যখন যে রাজ্যে বেড়াতে গেছেন সেখানকার স্থানীয় পোষাক কেনাও বৌদির সখের মধ্যে ছিল। এইভাবেই একবার মণিপুরে বেড়াতে গিয়ে সেখানকার পোষাক কিনে এনে আর পরতেই পারেননি; হেসে কুটোপাটি হয়ে বলেছিলেন 'বুঝতেই পারিনি নীচে লুঙ্গি আর ওপরে দোপাট্টা, পরি কি করে বলো'?

'পার্বণী সাহিত্য ও সংস্কৃতি' পত্রিকার প্রতি বছর রথের দিন জন্মদিন পালন করা হত এবং মহালয়ার দিন বাৎসরিকভাবে 'শব্দ উশিরা' নামে পত্রিকা বের করা হত। লেখালেখির মধ্যে আশ্রয় খুঁজে পেতেন বৌদি। জীবনে যত কষ্ট তিনি করেছেন ছোট ছেলের মৃত্যুর পর ততোধিক কষ্ট বুকে নিয়ে পরপর তিনটি বই বের করেছিলেন; চতুর্থ বইটিও বের হওয়ার পথেই ছিল। তাঁর লেখা ও প্রকাশিত বই— টুকরো টুকরো স্বপ্ন, কচুরীপানা, অগ্নিরূপা ও রবি-প্রণাম। ওকালতিও জীবনভর ছিল তাঁর লড়াইয়ের হাতিয়ার, অনেক জায়গায় আলোচনাচক্রে যোগ দিয়ে তিনি 'মেয়েদের অধিকার' নিয়ে সুপরামর্শ দিয়েছেন। তিয়াত্তরে পৌঁছেও চেতনায় তিনি ছিলেন টানটান।

২৪ মে ছন্দবীথি কুন্ডার জন্মদিন ছিল। বেশ কয়েক বছর আগে আমরা পার্বণীর সদস্যরা বৌদির জন্মদিন পালন করেছিলাম কেক কেটে, বৌদি বলেছিলেন— 'আজকের মতো সুখ আর খুশির দিন তোমরা পাশে আছো বলেই পেলাম'।

নিজের কষ্ট কখনও বুঝতে দেন নি কাউকে। ২৫ মে ২০১৮ সকাল ৬.৪৫ মিনিটে বৌদি চলে গেলেন কাউকে না জানিয়েই। বোধহয় এক বুক অভিমান নিয়েই।

বিউটি আইচ (মিত্র)

খেলাধুলায় ডুয়ার্স

রাজবংশীদের হারিয়ে যাওয়া সব পুরনো আউটডোর গেম

(গত সংখ্যার পর)

ঢোপ

বইপত্র প্রাচীন লোকেদের বিবরণ অনুযায়ী বলা যায়, ঢোপ খেলাটি উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে প্রচলিত শতাব্দী প্রাচীন খেলা। এককালে এই খেলাটি রাজবংশী কিশোর যুবকদের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। ক্রিকেট খেলার সঙ্গে ঢোপ খেলার বিশেষ মিল রয়েছে, যেন মনে হয় আজকের ক্রিকেটের আদিরূপ হল 'ঢোপ'। পাটের দড়ি দিয়ে তৈরি ছোট বলকে 'ঢোপ' বলা হয়। আকারে অনেকটা ক্রিকেট বলের মতোই দেখতে, তবে ঢোপ এর ভিতরে কাঠ বা বাঁশের একটা শক্ত অংশ দেওয়া হত। ক্রিকেট খেলার ব্যাটের মতোই বাঁশের তৈরি প্রায় দুই হাত দীর্ঘ একটি লাঠি প্রয়োজন হয় এই খেলায়। মাঠে পাঁচ ছয় হাত দৈর্ঘ্য-প্রস্থ বিশিষ্ট বর্গাকার ঘর কাটা হয়। খেলাটি দুই দলের মধ্যে হয় এবং দুই দলের খেলোয়াড় সমসংখ্যক থাকে। প্রথম খেলোয়াড় (ব্যাটসম্যান) ঢোপ্টিকে লাঠির আঘাতে দূরে পাঠিয়ে দেয়। তখন প্রতিপক্ষের কোনো খেলোয়াড় যদি ঢোপটি মাটিতে পড়ার আগেই লাঠি দিয়ে স্পর্শ করে বা হাত দিয়ে ধরে, তাহলে ঐ খেলোয়াড় 'মরা' বা 'আউট' হয়। কিন্তু ঢোপটি মাটিতে পড়ে গেলে থেমে যাওয়া ঢোপটিকে প্রতিপক্ষের যে কোন খেলোয়াড় নির্দিষ্ট ঘরের দিকে ছুঁড়ে দেয়। যদি ঢোপটি নির্দিষ্ট ঘরে গিয়ে পড়ে এবং খেলোয়াড় যদি ঢোপটিকে প্রত্যাঘাত করে দূরে পাঠাতে না পারে, তাহলে ঐ প্রথম খেলোয়াড় 'মরা' বা 'আউট' হয়। কিন্তু প্রতিপক্ষের ছোড়া ঢোপটিকে যদি প্রত্যাঘাত করে দূরে পাঠাতে পারে, তাহলে থেমে যাওয়া ঢোপ থেকে নির্দিষ্ট ঘরে পর্যন্ত পদক্ষেপ গুনে আনা হয়। “পান, দশ, পনেরো, বিশ” — অর্থাৎ প্রতি চারটি পদক্ষেপে এক পাটি বা এক পয়েন্ট হত। তবে ২০ টি পদক্ষেপের দৈর্ঘ্যকে এক পাটি ধরা হত। প্রথম দলের সব খেলোয়াড় 'মারা' গেলে বা 'আউট' হলে অপর দল পাটি করতে নামে। দুই দলের অংশগ্রহণের শেষে যাদের পাটি বা পয়েন্ট বেশি হয়, তারাই জয়ী।

রাজবংশী সমাজে প্রচলিত শরীরচর্চামূলক এই মুক্তাঙ্গন খেলাটি আজ লুপ্ত। তবে খেলাটি একসময় শ্রেষ্ঠ মুক্তাঙ্গন খেলা রূপে প্রচলিত ছিল। এখানে উল্লেখ্য যে রাজবংশী লোক সমাজে প্রচলিত ঢোপ খেলার সমগোত্রীয় ক্রিকেট খেলায় কোচবিহার রাজবংশের রাজকুমার হিতেন্দ্র নারায়ণ ছিলেন তদানিন্তন কোচবিহার রাজ্যের তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রথম ক্রিকেটার (রাজবংশী), যিনি ইংল্যান্ডের কাউন্টি ক্রিকেট ১৯১১ ও ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

হা-ডু-গু-ডু

হাডু-ডু বা কাবাডি খেলাটি রাজবংশী লোকসমাজে 'হা-ডু-গু-ডু' নামে পরিচিত। ক্রীড়া বিশেষজ্ঞদের মতে 'হাঁটু' শব্দ থেকে হাডু-ডু শব্দটি এসেছে। তবে পুরাণে উল্লেখ আছে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপ-বালকদের সঙ্গে হা-ডু-ডু খেলতেন। খেলাটি খেলতে দৈহিক শক্তি ও উপস্থিত বুদ্ধির প্রয়োজন। দুটি দলে কম বেশি দশজন করে খেলোয়াড় থাকে। খেলায় ব্যবহৃত ছকটিকে মধ্য দাগ দিয়ে দ্বিখন্ডিত করা হয়। প্রতিপক্ষের কোন খলোয়াড় 'দম' বা 'ডাক' দিয়ে কোনো খেলোয়াড়কে 'মরা' বা 'আউট' করতে আসলে তারা যদি প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়কে আটকাতে পারে, তবে সে 'মরা' বা 'আউট' হয়। আর যদি কোন খেলোয়াড়কে ছুঁয়ে নিজের ঘরে চলে যায় বা মধ্যরেখা স্পর্শ করে তাহলে সেই খেলোয়াড় (যাকে ছুঁয়েছে) 'মরা' বা 'আউট' হয়। তবে কাউকে না ছুঁয়েই খেলোয়াড় যদি নিজের ঘরে চলে যায় তাহলে খেলা অমীমাংসিত থাকে। ডাকগুলো মূলত বীরত্ব ব্যঞ্জক হয়। দম দেওয়ার সময় খেলোয়াড় ছকের বাইরে পা রাখলে জল্লা (আংশিক মরা) হয়। জল্লাকে বাঁচাতে প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়কে মারতে বা আউট করতে হয়। কোন দলের সকল খেলোয়াড় 'মরা' বা 'আউট' হলেই একটি প্রতিযোগিতা শেষ হয় এবং সেই মরা আউট হওয়া দলই পরাজিত দল হিসাবে বিবেচিত হয়।

গুলনড়ি

শুধু উত্তরবঙ্গ বা বাংলা নয়, ভারতবর্ষের অনেক রাজ্যেই খেলাটির প্রচলন ছিল। ২০০৯ সালে, একবার মুম্বাই নগরে যাওয়ার পথে মধ্যপ্রদেশের একটি গ্রামে ছেলেদের 'গুলনাড়ি' খেলতে প্রত্যক্ষ করেছিলাম। তবে বর্তমানে এই খেলাকে আর অতীতের মত খেলতে দেখা যায় না। স্থান ভেদে গুড়নাড়ি খেলার নাম হল — ডাংগুলি, ডাংগুটি, বাট্টা, চেটু ইত্যাদি। চওড়া রাস্তা বা মাঠের মাঝখানে খেলাটি খেলা হয়। বাঁশের মোটা কঞ্চি বা 'ঝিক দিয়ে 'গুল' আর 'নড়ি' তৈরি করা হত। 'গুল' ছয় ইঞ্চি ও নড়িটি দেড় থেকে দুই হাতের মতো লম্বা হত। খেলোয়াড়গণ দুটি দলে বিভক্ত হয়ে খেলত। খেলাটিতে চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও হাতের শক্তি প্রয়োজন। খেলার মাঠে তিন-চার ইঞ্চি লম্বা একটি গর্ত করা হয়, যাতে গুলটি সহজে বসানো যায়।

নামের পাশাপাশি স্থানভেদে খেলাটির ভিন্ন রূপ দেখা যায়। সাধারনত খেলাটি দুটি নিয়মে হয়। একটি নিয়ম অনুযায়ী খেলার নাম হয় ' পান-দশ-পনেরো-বিশ' ও ওপর নিয়ম অনুয়ায়ী খেলার নাম হয় — 'ইরি-দুরি'। তবে উত্তরবঙ্গের বেশির ভাগ স্থানে 'পান-দশ-পনেরো-বিশ' খেলাটি বেশি প্রচলিত ছিল। আর 'ইরি-দুরি' জলপাইগুড়ি জেলার কিছু স্থানে খেলা হত। এই খেলাটিও শক্তি ও দক্ষতার খেলা।

'পান-দশ-পনেরো-বিশ' — এর নিয়ম অনুযায়ী একদল খেলোয়াড় বাঁশের কঞ্চি বা গাছের ডাল নিয়ে খেলার ঘরের (যেখানে গর্তটি থাকে) ৪০ / ৫০ হাত দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। অপর দলের একজন খেলোয়াড় খেলার শুরুতে নড়ি দিয়ে গর্তে রাখা গুলটিকে স্পর্শ করলে খেলোয়াড়টি আউট হয়। আর যদি গুলটিকে আটকাতে না পারে, তাহলে গর্তের সামনে রাখা নড়িটিকে উদ্দেশ্য করে গুলটিকে ছুরে মারে; গুলটি নড়িটিকে স্পর্শ করলে প্রথম খেলোয়াড় 'আউট বা মারা' যায়। প্রথম খেলোয়াড়টি আউট না হলে গুলটিকে গর্তে বসিয়ে নড়ির সাহায্যে উপরে তুলে আঘাত করে দূরে পাঠায়। এবারে প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়গণ গুলটিকে আটকাতে পারবে না, যদি আটকায় বা স্পর্শ করে তাহলে পাটি দ্বিগুন হয়। দূরে পাঠানো গুল থেকে গর্ত পর্যন্ত নড়ির মাধ্যমে 'পান-দশ-পনেরো- বিশ' করে গুনে আসতে হয়, নড়িটির চার মাপ হল পাটি বা এক পয়েন্ট। প্রথম দলের খেলোয়াড় আউট হলেই দ্বিতীয় দল (প্রতিপক্ষ) খেলতে নামে। যে দলের পয়েন্ট বা পাটি বেশি হয়, তারাই চাম্পিয়ন হয়।

গুলনড়ি খেলায় অপেক্ষাকৃত কঠিন নিয়ম 'ইরি-দুরি' খেলায় দেখা যায়। প্রথমে প্রতিপক্ষের খেলোয়াড় গুলটিকে প্রথম খেলোয়াড়ের দিকে ছুরে মারে এবং প্রথম খেলোয়াড় গুলটিকে নড়ির সাহায্যে দূরে পাঠায়। তারপর পা ও হাতের বিভিন্ন অংশে গুলটিকে রেখে আঘাত করে দূরে পাঠিয়ে দেয়। এখানেও গুল থেকে মাপ নিতে নিতে গর্তের দিকে আসতে হয়। মাপ নিলে এক পয়েন্ট বা এক পাটি হয়। খেলোয়াড় মরা বা আউট হওয়ার নিয়ম একই খেলায় হার-জিত প্রাপ্ত পয়েন্ট বা পাটির উপর নির্ভর করে।

গুলনড়ি বা ডাংগুলি খেলা সুপ্রাচীন কাল থেকে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জাতির অত্যন্ত প্রিয় খেলা। অনেক সমাজ বিজ্ঞানীর মতে গুলনড়ি বা ডাংগুলি খেলাই ক্রিকেটে খেলার পূর্বসূরী। অবশ্য সেদিক থেকে বিচার করলে 'ঢোপ' খেলাকেই ক্রিকেট পূর্বসূরী বলা যায়। কারণ গুলনড়ি বা ডাংগুলির তুলনায় 'ঢোপ' খেলার সঙ্গেই ক্রিকেটের অধিক মিল আছে।

দাড়িয়াবান্ধা

উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের মধ্যে বহুল প্রচলিত খেলা দাড়িয়াবান্ধা। মাঠের কোনো স্থানে নির্দিষ্ট ছক-ঘর কেটে এই খেলা হয়। খেলাটি ছেলে মেয়ে উভয়ই খেলে থাকে। স্থানভেদে খেলার নিয়মে পার্থক্য দেখা যায়। কোনো কোনো স্থানে এই খেলাকে 'পাখি' খেলাও বলে। সাম্প্রতিক কালেও গ্রামগঞ্জে খেলাটি খেলতে দেখা যায়।

ছুঁয়াহারি

রাজবংশী শিশুদের মধ্যে প্রচলিত অন্যতম আকর্ষনীয় খেলা হল 'ছুঁয়াহারি'। বাঙালী মূলধারার সংস্কৃতিতেও এই খেলা 'ছোঁয়াছুঁয়ি' খেলা নামে পরিচিত। দেশের অন্যান্য প্রদেশেও খেলাটি প্রচলিত কিন্তু নিয়মের কিছুটা পার্থক্য থাকা অসম্ভব নয়।

সাধারণত দুই বা ততধিক ছেলে-মেয়ে খেলাটি খেলে থাকে। খেলার শুরুতে একটি ছড়ার মাধ্যমে 'ছুয়া' বা চোরকে' নির্ণয় করা হয়। সেরকম একটি ছড়া হল —

একট বেকট টেকট টাল
মাছ মাগুর ব্রহ্মার জাল
থাম থুম শুঙরের ঠুম
খাঁটো নাঙল দিঘল ঈশ
করিয়ো না ঊনিশ-বিশ।

ছড়াটি একজন বলত এবং যে ছেলে বা মেয়ের কাছে গিয়ে ছড়াটি শেষ হয়, সেই 'ছুয়া' বা 'চোর' হয়। এই চর অন্যান্যদের ছোঁয়ার জন্য ধাওয়া করে। যতক্ষন কাউকে ছুঁতে পারে না। ততক্ষন তাদের ছুটাছুটি চলে এবং কাউকে ছুঁলেই খেলা শেষ হয়। যাকে ছোঁয়া হল সেই পরবর্তী 'চোর' বা ছুয়া হয়। এভাবেই খেলাটি চলে।

এই 'ছুয়াহারি খেলা জাতীয় আরো কিছু খেলা রাজবংশী সমাজে প্রচলিত ছিল। সেই খেলা গুলিতেও মূলত ছোঁয়া বা স্পর্শ করার বিষয় থাকে। সেরকম খেলাগুলি হল — গোল্লাছুট, ঘোড়াবইসা, বুড়িবইসা ইত্যাদি। ক্ষেত্রসমীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে রাজবংশী সমাজে প্রচলিত আরেকটি প্রাচীন খেলার খোঁজ পাওয়া যায়। খেলাটির নাম 'চিকা'। এটিও দুই দলের খেলা। সাধারণত যুবকরাই খেলাটি খেলত। তবে এই খেলাটির বিস্তারিত তথ্য অতিবয়স্করাও ঠিকমত বলতে পারেনি — এতটাই প্রাচীন সেই খেলা!

কোকিল চন্দ্র রায়

(কৃতজ্ঞতা স্বীকার। লেখাটি জলপাইগুড়ি আন্তবিদ্যালয় ক্রীড়া দপ্তরের ২০১৭ সালের প্রতিযোগিতার স্মরণিকা 'উত্তরের ক্রীড়া দর্পণ' থেকে পুনর্মুদ্রিত)

আমাদের বইপত্র এখন নিজের ঠিকানাতেই পেতে পারেন

বিষয় ডুয়ার্স

অভিনব ডুয়ার্সে।
প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ২০০ টাকা

ডুয়ার্স থেকে দিল্লি।
দেবপ্রসাদ রায়। ১৫০ টাকা

চায়ের ডুয়ার্স কী চায়?
গৌতম চক্রবর্তী ১১০ টাকা

ডুয়ার্সের চা অবলুপ্তির পথে?
সৌমেন নাগ। ১৫০ টাকা

ডুয়ার্সের সেরা তিন লেখকের গল্প সংকলন

ডুয়ার্সের গপ্পোসপ্পো। সাগরিকা রায়। ১৫০ টাকা

চারপাশের গল্প। শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ১০০ টাকা

লাল ডায়েরি। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা

ক্রাইম থ্রিলার

লাল চন্দন নীল ছবি। অরণ্য মিত্র। ১১০ টাকা

পকেট পেপারব্যাক

অন্ধকারে মৃত্যু-আলিঙ্গন। বিপুল দাস। ৫৫ টাকা

মেঘের পর রোদ। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ৫৫ টাকা

কুহুলিয়াদের দেশে। সুকান্ত গাঙ্গুলী। ৫৫ টাকা

ডুয়ার্সের কাব্য চর্চা

পঞ্চাশ পর্যটন শেষে মাধুকরী ধান। অমিত কুমার দে। ২৫০ টাকা

ডুয়ার্সের হাজার কবিতা। অমিত কুমার দে সম্পাদিত। ৫০০ টাকা

ছোটদের বই

সবুজ মনের গল্পগুলি। রীতা রায়। ১২৫ টাকা

বিষয় পর্যটন

আমাদের পাখি।
তাপস দাশ ও উজ্জ্বল ঘোষ। ৪৯৫ টাকা

সিকিম।
সংকলন। ২০০ টাকা

নর্থ ইস্ট নট আউট।
গৌরীশংকর ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা

রংরুটে হিমালয় দর্শন।
সংকলন। ২০০ টাকা

উত্তরবঙ্গের হিমালয়ে।
প্রদোষ রঞ্জন সাহা। ২০০ টাকা

সব্যসাচীর সঙ্গে জলে জঙ্গলে।
২য় খণ্ড ১৫০ টাকা

মধ্যপ্রদেশের গড় জঙ্গল দেউলে।
সুভদ্রা ঊর্মিলা মজুমদার। ২০০ টাকা

সুন্দরবন অনধিকার চর্চা।
জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী। ১৫০ টাকা

প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন।
তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস। ১১০ টাকা

অরণ্য কথা বলে।
শুভ্রকান্তি সিনহা। ১৫০ টাকা

সে আমাদের বাংলাদেশ।
গৌতম কুমার দাস। ২০০ টাকা

পাসপোর্ট প্রতিবেশিদের পাড়ায়।
দীপিকা ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা

বাড়িতে বসেই অর্ডার দিন আমাদের বই। পেয়েও যাবেন নিজের ঠিকানাতেই।
মেইল করুন dooarsbooks@outlook.com বা হোয়াটসঅ্যাপ করুন ৯৮৩০৪১০৮০৮ নম্বরে।
ন্যূনতম ৩০০ টাকার অর্ডার দিতে হবে। ৫০০ টাকা বা তার বেশি অর্ডার দিলে ডিসকাউন্ট মিলবে ২০%।
পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কোনও ঠিকানায় ক্যুরিয়ার খরচ লাগবে না।

আমাদের বই যে সব দোকানে পাওয়া যাবে (বই না পেলে সরাসরি অর্ডার করুন আমাদের)

শিলিগুড়ি: হলিডে ইয়ার, হরেন মুখার্জি রোড কাস্টমস বিল্ডিং সংলগ্ন। **ইকনমি বুক স্টল,** কলেজ রোড। **বিশ্বাস বুক এজেন্সি,** হিলকার্ট রোড বাটা গলি। **জলপাইগুড়ি: আড্ডাঘর,** মার্চেন্ট রোড। **গ্রন্থ ভারতী,** ডিবিসি রোড। **আলিপুরদুয়ার: শ্যামলী বুক ডিপো,** নিউটাউন। **কোচবিহার: এস বি বুক ডিস্ট্রিবিউটর্স,** রূপনারায়ণ রোড। **ফালাকাটা:** পাঞ্চজন্য। **মালবাজার: বইঘর,** আদর্শ বিদ্যাপীঠের উল্টোদিকে। **বিন্নাগুড়ি:** সিটি বুক স্টল। **বানারহাট:** গ্রন্থ ভারতী। **বীরপাড়া:** পোকিসা। **মালদা:** পুনশ্চ। **রায়গঞ্জ:** গ্রন্থভারতী। ধানসিঁড়ি। ওয়েস্ট দিনাজপুর বুক সাপ্লাই এজেন্সি। **কলকাতা: দে'জ ও দে বুক স্টোর,** কলেজ স্ট্রিট।

বই আপনার কাছাকাছি কোথায় পাওয়া যাবে জানতে ফোন করুন
উত্তরবঙ্গে ৯৮৩০৪১০৮০৮, কলকাতায় ০৩৩-৪০৭০ ১৪৪৪

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 3 Rajdanga Gold Park, Kolkata 700107, Editor - Pradosh Ranjan Saha.